প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকশ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে— যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারি, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ভূগোল **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায়
EGR 13 : 1 & 2

পর্যায় : 01

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1 ❑	ড. জ্যোতির্ময় সেন	শ্রীমতী টিঙ্কি কর
একক 2 ❑	ড. জ্যোতির্ময় সেন	শ্রীমতী টিঙ্কি কর
একক 3 ❑	অধ্যাপিকা চন্দ্রিমা সেন	শ্রীমতী টিঙ্কি কর

পর্যায় : 02

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1 ❑	ড. চন্দন সুরভি দাস	শ্রীমতী টিঙ্কি কর
একক 2 ❑	ড. চন্দন সুরভি দাস	শ্রীমতী টিঙ্কি কর
একক 3 ❑	ড. চন্দন সুরভি দাস	শ্রীমতী টিঙ্কি কর

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ
কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EGR - 13

পরিবেশ ভূগোল

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
1

একক 1 ❑ উদ্দেশ্য ও মূল ধারণা **7 – 24**

একক 2 ❑ পরিবেশ **25 – 65**

একক 3 ❑ পরিবেশ অবক্ষয়, বিপর্যয় ও ঝুঁকি **66 – 124**

পর্যায়
2

একক 1 ❑ সাম্প্রতিক পরিবেশ সমস্যা : বিশ্বপ্রকৃতি **125 – 155**

একক 2 ❑ পরিবেশ সংরক্ষণ বনাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন **156 – 175**

একক 3 ❑ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা **176 – 207**

একক 1 ❑ উদ্দেশ্য ও মূল ধারণা

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা

1.2 উদ্দেশ্য

1.3 পরিবেশ ভূগোল

1.4 পরিবেশ ও বসতি (Definition of the term environment and habitat)

1.5 পরিবেশগত বেদন (Environmental Perception)

1.6 পরিবেশের অবক্ষয় : কারণ ও গৃহীত পদক্ষেপ

1.7 সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা

1.1 প্রস্তাবনা

পরিবেশ নিয়ে ইদানীং ভাবনাচিন্তা আমাদের বেড়েছে। বাস্তব্যবিদ্যা, পরিবেশ সংরক্ষণ, জনসংখ্যা, সম্প্রদায়, দীর্ঘমেয়াদী সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন ইত্যাদি শব্দগুলো বেশ পুরনো হয়ে গেছে। এই শব্দগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। শুধু তাই-ই নয়, অনেক সময়ই এদের সাধারণ অর্থে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাজেই এই শব্দগুলি সম্বন্ধে কিছু সার্বজনীন বোধ প্রবর্তনের প্রয়োজন আছে। এদের প্রকৃত অর্থ কি এবং সমাজজীবনে এদের প্রাসঙ্গিকতা কতখানি, তা জানা ও সম্যক উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কেননা এই ধারণা পরিবেশ সচেতনার পূর্বশর্ত হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা পরিবেশের সংজ্ঞা ও তার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করব।

1.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে জানা যাবে পরিবেশ কি? পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি? বসতি বলতে কি বোঝায়? বসতি কয় প্রকারের হয়? পরিবেশের সাথে প্রাকৃতিক বাসভূমির সম্পর্ক কেমন? মানব বাস্তুসংস্থান ও মানব বাস্তুতন্ত্র কি? পরিবেশগত বেদন বলতে কি বোঝায়? ভৌগোলিকরা কি দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবেশকে দেখেন? সামগ্রিক পরিবেশ বলতে কি বোঝায়?

1.3 পরিবেশ ভূগোল

1.3.1 বিবর্তন

পরিবেশের অধ্যয়ন কোন না কোন ভাবে ভূগোলের পুনঃ পুনঃ আলোচনার বিষয় হয়েছে। কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৭০-র মধ্যে স্থানিক বিশ্লেষণের প্রাধান্য এবং ভৌগোলিক বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানের ব্যবহার ভূগোলশাস্ত্রে এই (পরিবেশ) বিষয়টির দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরিণতিতে পরিবেশের ব্যাপারটি জীবনবিজ্ঞানীদের এক্তিয়ারে চলে গেল। ৭০-র দশক থেকে ভূগোলে পরিবেশ অধ্যয়ন বিষয়টি আবার গুরুত্ব পেয়েছে। এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্তরে পরিবেশ পাঠ বিষয়টি Environmental management, Geography of Environmental Management, Ecology and Environmental Management ইত্যাদি বিভিন্ন নামে চালু হয়েছে।

1.3.2 সংজ্ঞা

পরিবেশের ভূগোলের মোদ্দা কথা সেই চিরাচরিত মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক। আরো বিশদভাবে বলতে গেলে বাস্তুসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী জ্ঞানে সমৃদ্ধ মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। Savindra Singh-র ভাষায় Environmental Geography may be defined as the study of spatial attributes of interrelationship between living organisms and natural environment in general and between technologically advanced economic man and his natural environment in peculiar to temporal and spatial fraemwork. পরিবেশ ভূগোলের সংজ্ঞাকে আরো স্বচ্ছ করতে একে আরো বিস্তারিত করা যেতে পারে এবং এই বিষয়ের পরিধি আরো সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারে। এই বিচারে পরিবেশ ভূগোলকে ভূগোলের সেই শাখা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা প্রাকৃতিক পরিবেশের সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য, গঠন ও কার্যাবলী, (মানুষকে জৈব উপাদান—প্রাকৃতিক মানুষ ধরে), বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, বিভিন্ন প্রক্রিয়া যা উপাদানগুলিকে যোগ করে, বিভিন্ন উপাদানের পরস্পরের সাথে এবং নিজেদের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত এবং ভূ-বাস্তুসংস্থানের (geoecosystem) পরিপ্রেক্ষিতে স্থানিক ও কালের গতিতে সাড়া দেওয়া তথা কারিগরী জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষের সাথে প্রাকৃতিক ভূ-বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন উপাদানের ঘাত প্রতিঘাত এবং ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক ভূ-বাস্তুসংস্থানের পরিবর্তন তথা অবক্ষয়, দূষণ প্রতিরোধ কলাকৌশল গ্রহণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা এ সবই অধ্যয়ন করে।

1.3.3 উদ্দেশ্য

পৃথিবীর সমস্ত জীবিত বস্তু ও তাদের সহযোগী সব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্র হল

জীবপরিমণ্ডল (biosphere) এবং এটি হল পরিবেশ ভূগোলের দৈশিক একক। এইভাবে পরিবেশ ভূগোলের প্রধান সম্পর্ক হল প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে এবং একসাথে তাদের প্রাকৃতিক ও জৈব প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে সম্পর্ক এবং পরিবেশে মানুষের সাড়া বনাম মানুষ পরিবেশ সম্পর্ক অধ্যয়ন করা।

পরিবেশ ভূগোলের পরিধি ঃ পরিবেশ বিজ্ঞানের তিনটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। যথা-

(১) পরিবেশের মৌলিক ধারনা এবং মানুষ ও সমাজের সাথে এর সম্পর্ক-পরিবেশ ভূগোলের অর্থ, পরিধি ও মৌলিক ধারনা ; পরিবেশের অর্থ, গঠন ও প্রকারভেদ, বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তু সংস্থান, বাস্তুতন্ত্রের মৌল ধারনা ও নীতি ; বাস্তুতন্ত্র ও ভূগোল ; মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক, পরিবেশ প্রক্রিয়ার মূল নীতি।

(২) বাস্তুসংস্থান ও পরিবেশের অবস্থান, বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ, ভূ-রাসায়নিক চক্র ; বাস্তুতন্ত্রে স্থিতি ও অস্থিতি ; বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা ; বাস্তুসংস্থানের বাস্তুগত পরিবর্তন (বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের বিবর্তন, ছড়িয়ে পড়া এবং বিলুপ্তি) ; উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্থানিক বন্টন, বায়োমের শ্রেণিবিভাগ, পরিবেশের অবনমন ও দূষণ, পরিবেশ দূষণ, সংকটের প্রকৃতি ও আয়তন, পরিবেশ অবনমন ও দূষণের প্রকার ও কারণ এবং পরিবেশ শাসন কার্যক্রম।

(৩) পরিবেশ ব্যবস্থাপনা—পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ধারনা ও ভিত্তি ; বাস্তুতন্ত্রের সম্পদের শ্রেণীবিভাগ, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা এবং প্রধান প্রধান পরিবেশ কর্মসূচী।

1.4 পরিবেশ ও বসতি (Definition of the term environment and habitat)

1.4.1 পরিবেশ

সাধারণ ভাবে পরিবেশ বলতে ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সমষ্টিকে বোঝায়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে 'পরিবেশ' শব্দটির অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে পরিবেশের প্রাকৃতিক উপাদানের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদানও যথেষ্ট সক্রিয়। পরিবেশের প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি আলাদা আলাদা অবস্থান করে না। একদিকে প্রাকৃতিক জড় বা সজীব উপাদানগুলি যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি অন্যদিকে মানুষের চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম, কলা-কৌশল প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। প্রকৃতি ও মানুষের এই সম্পর্ক বহুদিনের। মানুষ সামাজিক জীব। একটি সামাজিক পরিবেশে অন্যান্য মানুষ, প্রাণী ও জীবের সাথে যুক্ত

হয়ে সে বাস্তুতন্ত্র গঠন করে। প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরতা চিরন্তনের। মানব সমাজের শুরু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে হয়নি। বরং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেই সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, বসবাসের ধরন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে আমাদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানগুলি ঋতু পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর মানুষের কর্মের ফলশ্রুতি হিসাবে যে উৎপাদন পদ্ধতি, যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রাম-শহর ইত্যাদি গড়ে ওঠে তার প্রত্যেকটি আমাদের পরিবেশের অংশ বিশেষ। কেননা, স্কুল-কলেজের পরিবেশের সাথে কারখানার পরিবেশের তফাৎ থাকে। অথচ বলতে গেলে এদের প্রত্যেকটি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে পরিবেশ বলতে সেই প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বোঝায় যা সামগ্রিকভাবে কোনও একটি স্থানে বা সময়ে আমাদেরকে ঘিরে থাকে। এই পৃথিবীর যা কিছু আমাদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ বা জীবন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে তারই সমষ্টি হল পরিবেশ। কাজেই পরিবেশ বলতে আমরা "কোন জীবের চতুষ্পার্শে অবস্থানকারী সমস্ত জীবিত ও অজীবিত উপাদানসমূহ, সম্মিলিত সর্বপ্রকারের প্রভাব এবং ঘটনাপ্রবাহের সামগ্রিক সমষ্টিকে বুঝি"—"Environment is the sum total of all living and non-living interacting components, influences and events surrounding an organism." আরো সহজভাবে বললে বলতে হয়—উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরকার হয়, তাকে পরিবেশ বলে। পরিবেশ তৈরী হতে দরকার লাগে জল, বাতাস, মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ।

পরিবেশের সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞানীদের বলার ধরন আলাদা হলেও মূল কথাটির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যেমন

পরিবেশ বিজ্ঞানী বটকিন্ এবং কেলার, ১৯৯৫ সালে তাঁদের "Environmental Science"-এ বলেছেন যে, "জীব, উদ্ভিদ বা প্রাণী তাদের জীবনচক্রের যে কোন সময়ে যে সমস্ত জৈব এবং অজৈব কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, সেই কারণগুলির সমষ্টিকে পরিবেশ বলে।"

আর্মসও (১৯৯৪) তাঁর "Environmental Science"-এ পরিবেশের সংজ্ঞায় বলেছেন যে, "জীব সম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব এবং প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।"

"The concise Oxford Dictionary-র ১৯৯২ সালের সংস্করণে পরিবেশকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "পরিবেশ হল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বহিরঙ্গের অবস্থাগুলির সমষ্টি"।

এ ছাড়া, পরিবেশ কথাটির অন্য মানে আছে। পরিবেশ বলতে সেই সমস্ত প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কথাও বুঝি যা মানুষকে যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়ে প্রভাবিত করে। যেমন, যুদ্ধ-বিগ্রহ-দাঙ্গা হলে লোকের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ে। জিনিসের দাম বাড়লে মানুষের কষ্ট বাড়ে। এটা হল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের উদাহরণ।

পরিবেশের উপাদানসমূহ (Components of Environment) ঃ

গঠনগতভাবে পরিবেশ দুটি মিথস্ক্রিয়াশীল অংশের সমন্বয়ে গঠিত ঃ

(১) অজীব বা অজৈব পরিবেশ

(২) সজীব বা জৈব পরিবেশ

প্রথমটির মধ্যে রয়েছে—

বায়ুমণ্ডল ঃ বায়ুমণ্ডল বা আবহমণ্ডল হল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাসগুলির একটি আচ্ছাদন, যা পৃথিবী-গ্রহকে আবৃত রাখে।

জলবায়ুগত উপাদানসমূহ ঃ সূর্য-কিরণ, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, জলপ্রবাহ প্রভৃতি।

ভৌত উপাদানসমূহ ঃ আলোক, বায়ুচাপ ইত্যাদি।

রাসায়নিক উপাদানসমূহ ঃ অম্লত্ব, ক্ষারত্ব, লবণতা এবং অজৈব পুষ্টিসমূহ।

মৃত্তিকা ঃ

আর দ্বিতীয়টির উপাদানগুলি হল সমস্ত জীবসম্প্রদায় এবং তাদের সৃষ্ট জৈব পদার্থসমূহ। অণুজীবি ব্যাক্টেরিয়া থেকে শুরু করে মহীরুহ আর মানুষ পর্যন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সমন্বয়ে গঠিত এই পরিবেশ।

1.4.2 বসতি (Habitat)

বসতি বা নিবাস বলতে কোনও একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বা অবস্থানকে বোঝায় যেখানে মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলি যেমন জলবায়ু, ভূ-সংস্থান বসতির ধারণার সাথে যুক্ত। যে কোন পরিবেশে মানুষের পক্ষে যেমন বসতি স্থাপন সম্ভবপর নয়, তেমনি কোনও জীব বা উদ্ভিদের বিকাশের জন্যও উপযুক্ত পরিবেশের দরকার হয়। জল, বায়ু, মাটি, পাথর বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রতিটি উদ্ভিদ বা জীবের বেঁচে থাকাকে সুনিশ্চিত করে। যেমন, জল ছাড়া মাছ বাঁচে না, তেমনি বৃষ্টি ছাড়া গাছ বাঁচে না। আবার মানুষ মরুভূমি বা বরফে ঢাকা পাহাড়ে বসবাস করতে পারে না। অর্থাৎ মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের অবস্থানকে যে পরিবেশ বা অঞ্চল সুনিশ্চিত করে তাকেই বলা হয় বসতি।

আমরা জানি কোন সজীব পদার্থই ভূ-পৃষ্ঠের কয়েক কিলোমিটারের বেশী গভীরে অথবা তার কয়েক কিলোমিটারের বেশী উচ্চতায় বাঁচতে পারে না। সুতরাং প্রাণের অবস্থান ভূ-পৃষ্ঠের অতি সংকীর্ণ এক স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ-যাকে আগেই আমরা জীবপরিমণ্ডল নামে অভিহিত করেছি। এই জীবপরিমণ্ডল আবার মূলতঃ চারটি পরিবেশ-বিভাগ (প্রাকৃতিক বাসভূমি) (Habitat) নিয়ে গঠিত। যথা-(১) সামুদ্রিক বাসভূমি, (২) মোহনার বাসভূমি, (৩) স্বাদুজলের বাসস্থান এবং (৪) স্থলজ বাসভূমি। স্থলজ বসতিস্থানকে আবার বিভিন্ন বৃহৎ বাস্তুতন্ত্র বায়োমে বিভক্ত করা যায়। যেমন-অরণ্য, তৃণভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি।

উপরোক্ত চারটি বসতিস্থানই একাধিক উপবিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি উপবিভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বতন্ত্র জৈবিক এবং অজৈবিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাদের সজীব এবং অজীব উপাদানগুলি নিজেদের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মাধ্যমে এক-একটি স্বতন্ত্র মিথস্ক্রিয় তন্ত্র গঠন করে, যাকে বাস্তুতন্ত্র বলে।

পরিবেশের সাথে প্রাকৃতিক বাসভূমির সম্পর্ক ঃ

পরিবেশের সাথে প্রাকৃতিক বাসভূমির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অনুকূল পরিবেশ ব্যতীত কোন উদ্ভিদ, প্রাণী বা কোন গোষ্ঠীর মানুষ পৃথিবীর কোথাও সুস্থ, স্বাভাবিক ভাবে বসবাস করতে পারে না। পরিবেশ অনুকূল না হলে তাদের পক্ষে সেখানে বংশ পরম্পরায় জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। তাই পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বাসভূমি হল অবিচ্ছেদ্য। এর মধ্যে পরিবেশ হল কারণ, আর প্রাকৃতিক বাসভূমি হল পরিণাম। বাড়ি তৈরী করতে গেলে যেমন পরিমাণ মত ভাল মানের ইঁট, কাঠ, বালি লাগে, তেমনি গাছপালা, পশুপাখির যে প্রাকৃতিক বাসভূমি, তার ইঁট, কাঠ, বালি হল জল, মাটি, বাতাস যা পরিবেশ থেকে পাওয়া যায়। আসলে পরিবেশ নিজেই এই সব উপাদানগুলি দিয়ে তৈরী। বলতে গেলে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের বাসভূমি যদি রক্ষা করতে হয়, তা হলে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। পরিবেশকে বিপন্ন করা চলবে না।

এখন পরিবেশ কিভাবে প্রাকৃতিক বাসভূমি গড়ে তোলে তা দেখা যাক—

(ক) ভিজে, ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে প্রাকৃতিক পরিবেশ—শৈবালের বাসভূমি।

(খ) উষ্ণ, স্বল্প বৃষ্টির মরুভূমি পরিবেশ—কাঁটা ঝোপ বা জেরোফাইট (Xerophyte) উদ্ভিদ, ও উট, ঘোড়া প্রকৃতি প্রাণীর বাসভূমি।

(গ) নদীর মোহনায় লবণ ও মিষ্টি জলের মিশ্র পরিবেশ—ইলিশ, স্যামন প্রভৃতি অ্যানাড্রোমাস মাছের বাসভূমি।

(ঘ) স্থলভাগ—মানুষের বাসভূমি।

(ঙ) সমুদ্রের লবণাক্ত পরিবেশ—তিমি মাছের বাসভূমি ইত্যাদি।

1.4.3 মানব বাস্তুসংস্থান এবং মানব বাস্তুতন্ত্র (Human Ecology, and Human Ecosystem)

'ইকোলজি' (Ecology) অর্থাৎ বাস্তুসংস্থান কথাটি দুটি গ্রীক মূল শব্দ 'ইকোস' (oikos) অর্থাৎ গৃহ (আবাস বা বাস্তু) ; এবং 'লজি' (logy) অর্থাৎ বিজ্ঞান বা শাস্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে 'ইকোলজি' বা বাস্তুসংস্থান হল জীবসমূহের বিভিন্ন 'আবাস' বা 'বাস্তু' সম্পর্কে অধ্যয়ন। ওডামের (Eugene P. Odum, 1963) ভাষায় 'Ecology is the study of organisms at home'। ভূ-পৃষ্ঠে মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবসমূহ একই সাথে বসবাস করে। পরস্পরের সাথে প্রত্যেকে এক অদৃশ্য, অচ্ছেদ্য, নিবিড় বন্ধনে বাঁধা। যে কোনও একটির জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে অন্য বিষয়টির কোনও না কোনও সম্বন্ধ থাকে। অর্থাৎ মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদ-কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। জীবনধারণের তাগিদে এরা পরস্পরের উপর নির্ভর করে। পরিবেশ বিজ্ঞানের অভিধানে 'ইকোলজি' শব্দটির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা এরকম ঃ 'The study of the relationships among organisms and the relationship between them and their physical environment' অর্থাৎ জীবসমূহের পারস্পরিক এবং তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের সমীক্ষা হল ইকোলজি বা বাস্তুতন্ত্র। জীববিজ্ঞানের অংশ হিসাবে বাস্তুসংস্থান পাঠ শুদ্ধ শিক্ষামূলক পঠন-পাঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি থেকে উন্নত বিশ্বে বিবিধ কারণে পরিবেশ সঙ্কট দেখা দিল। তখন থেকে পরিবেশ বিদ্যা বা বাস্তুসংস্থানের গুরুত্ব অনুভূত হয়। ফলে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এই শিক্ষা এখন সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে (holistic approach) বিশ্লেষণ করা হচ্ছে যার মধ্যমণি হল মানুষ (পরিবেশ ঃ বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২)।

সাংগঠনিক স্তরে বাস্তুসংস্থানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় তার মধ্যে বাস্তুতন্ত্র (ecosystem), বাস্তুসংস্থানের গঠন ও কাজের একক রয়েছে। যে কোনও সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্রে চারটি প্রধান উপাদান (component) থাকে ঃ যেমন, অজৈব উপাদান, উৎপাদক শ্রেণী, খাদক শ্রেণী ও বিয়োজক শ্রেণী। অসংখ্য জীব পরস্পরের মধ্যে যেমন কাজ করে তেমনি বহু অজৈব উপাদানের সঙ্গে আদান প্রদানের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। মানুষ হচ্ছে অসংখ্য জীবের মধ্যে একটি। তারা যেমন বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, তেমনি বিভিন্নদিকে অনেক কিছু প্রদান করে, আবার গ্রহণও করে অন্যান্য জীবের মত, বিশেষ করে শক্তির প্রবাহে (energy flow) এবং পরিপোষক চক্রে (nutrient cycling)। জীবের মধ্যে মানুষই হচ্ছে সবথেকে শক্তিশালী প্রজাতি যার বৃদ্ধি বাস্তুতন্ত্রে অসংখ্য পারস্পরিক প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং পরিবর্তিত করে। অপরপক্ষে, অন্যান্য জীবের মত মানুষও এই প্রক্রিয়াগুলির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয় এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। সুতরাং মানুষকে

কেন্দ্র করে উপরোক্ত সমুদয় বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা মানব বাস্তুসংস্থান (human ecology)—এর অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে মানব বাস্তুতন্ত্র (human ecosystem)-এ মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াগুলির উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় যদিও এটির সঙ্গে অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রের গঠন ও কাজে কোন গুণগত এবং পরিমাণগত তফাৎ নেই, অথবা কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম নেই যার দ্বারা অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রের ক্রিয়া থেকে একে পৃথক করা যায় এবং মানব বাস্তুতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে এক এবং সদৃশ প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত। পরিবেশের প্রভাব অন্যান্য জীবের মত মানুষের উপরও সমানভাবে প্রতিফলিত। অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষের অধিকতর দায়িত্ব আছে যাতে সার্থকভাবে যে পরিবেশ পরিচালনা করতে পারে এবং তাদের জীনগত উত্তরাধিকার (genetic heritage) এবং বিবর্তনের ভবিষ্যৎ (evolutionary future) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ নানাভাবে সম্পাদন করা যেতে পারে, যেমন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নবীকরণ ও অনবীকরণযোগ্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

1.5 পরিবেশগত বেদন (Environmental Perception)

গত কয়েক দশকে ভৌগোলিকেরা মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে পরিবেশগত বেদনে (Perception) কথাটা বলে এসেছেন। তাঁদের মতে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অপ্রত্যক্ষ এবং মানুষ কিভাবে পরিবেশকে দেখছে তার উপর এই সম্পর্ক নির্ভর করে। ভূগোলবিদরা এজন্য প্রকৃতির প্রতি মানুষের আচরণ কিভাবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির বেদন দ্বারা প্রভাবিত হয় তার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন।

গত কয়েক দশকে তাই ভৌগোলিকেরা প্রশ্ন তুলেছেন মানুষের আচরণ কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়? হুগলী নদীর উভয় তীরে পাটকল গড়ে উঠেছে? কেন লোহা-ইস্পাত শিল্প কয়লা-লোহা আকরিক এলাকায় গড়ে উঠছে? ভৌগোলিকদের মানুষের পরিবেশসংক্রান্ত আচরণ নির্ভর করে সে কিভাবে ওই পরিবেশকে দেখছে তার উপরে।

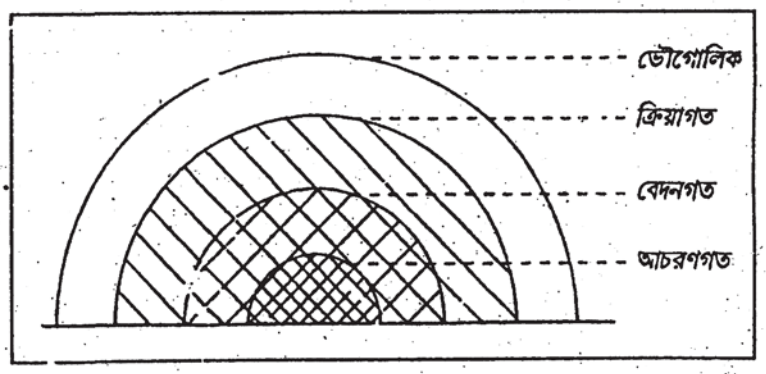

তাঁদের এই ধারণাকে প্রভাবিত করেছে সামাজিক মনোবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা। এরা বহুদিন ধরে মানুষের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীব মৌখিক প্রকাশ নিয়ে অধ্যয়ন করে চলেছেন। প্রথমদিকে মনোবিজ্ঞানীরা 'কথা' ও 'কাজ'-এর মধ্যে কার্যকাবণ সম্বন্ধ আছে বলে মনে করলেও পরবর্তী সময়ে তাঁরা বলতে শুরু করেন যে নানান ব্যক্তিগত ও পরিস্থিতিগত

বিষয়ের দ্বারা মানুষের আচরণগত প্রতিক্রিয়া নির্ধারিত হয়। ভৌগোলিকেরাও ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস মূল্যবোধের ওপর জোর দিতে শুরু করেন। সুতরাং মানুষের মন কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, ভৌগোলিকেরা সে নিয়েও আলোচনা শুরু করলেন। নিজস্ব ভাবনা চিন্তা অনুসারে, প্রতিটি মানুষই তার পরিবেশকে বিচার করে ও ব্যবহার করে। সুতরাং এই দিক থেকে পরিবেশ হল দুরকম ঃ বিষয়গত ও বিষয়ী পরিবেশ। প্রথমটি হল প্রকৃত পৃথিবী (real world) বা বাইরের জগৎ যা ভৌগোলিকরা চিরকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এসেছেন; আর দ্বিতীয়টি হল ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পৃথিবীতে সে যে পরিবেশে আছে বলে চিন্তা করছে। প্রতিটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে এই মনোজগতের পরিবেশ। বিষয়ী বা অধ্যাত্মীয় পরিবেশ মানবীয় ভূগোলের অন্তর্গত। মানবীয় ভূগোলে এখন মানুষের কাজকর্ম ও রাস্তাঘাট, বাসগৃহ, জনবসতি ও কারখানাকে এখন আর মূল পাঠ্য উপাদান মনে করা হয় না। বরং মানুষ নিজে কিভাবে ও কেন সে নানাবিধ ক্রিয়াকর্মে ব্যাপৃত হয়, কোন মূল্যবোধ ও প্রতিমূর্তি (Image) তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়।

সনোফিল্ডের (১৯৬৮) মতে পরিবেশের নানা পর্যায়

সুতরাং পরিবেশগত বেদন বলতে বোঝায় মানুষের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আত্ম-অভিজ্ঞতাপ্রসূত মূল্যায়ন' ('an aent's subjective experiential evaluation of the environment which surrounds him')

1.5.1 পরিবেশগত বেদনের ব্যবহার

পরিবেশগত বেদন (ক) পদ্ধতিরূপে এবং (খ) পরিবেশের মানসিক প্রতিমূর্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(ক) পদ্ধতিরূপে-প্রথমত, এটি একটি পদ্ধতি (process) যাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা থেকে পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। (First, it is the process by which an individual gains knowledge of the world by receiving stirmuli from the environment through his senses knowledge and warning, 1990) অর্থাৎ পরিবেশ থেকে উদ্দীপকগুলি ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তার ইন্দ্রিয়গুলির (চোখে দেখা, কানে শোনা, স্পর্শ, ঘ্রাণ ইত্যাদির) মাধ্যমে। এতে করে আমরা পরিবেশকে জানতে পারি। এই পদ্ধতিকেই পরিবেশগত বেদন বলে।

(খ) পরিবেশের প্রতিমূর্তি হিসাবে দ্বিতীয়ত, পরিবেশগত বেদন শব্দটি ব্যবহৃত হয় প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে তার পরিবেশ সম্পর্কে যে প্রতিমূর্তি রয়েছে সেটাকে বোঝাতে। (Secondly, it is the image

of the environment that each individual carries inside his head)। মানুষের মনোজগতে তার পরিবেশ সম্পর্কে এই যে, মডেল তৈরী হয়ে রয়েছে, তার গুরুত্ব যথেষ্ট বেশী। এই মানসিক প্রতিমূর্তির পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ কিভাবে আচরণ করবে, পরিবেশকে কি চোখে দেখবে, কিভাবে তাকে কাজে লাগাবে তা ঠিক করে (লাহিড়ী দত্ত, ভূগোল চিন্তা বিকাশ)।

বেদন পদ্ধতি ও এর পরিণতি হিসেবে (ক) পরিবেশ সম্পর্কে ব্যক্তির নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ও (খ) ব্যক্তির চিন্তার সংস্কৃতি এই দুটি জিনিসকে প্রভাবিত করে।

প্রথমত একজন মানুষ তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও আবেগ থেকে চোখে না দেখেও এ জগৎ সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলে। বই পড়ে, টেলিভিশন বা সিনেমা দেখে, রেডিও শুনে বা অন্য কোন ব্যক্তির কাছে শুনে দূরবর্তী কোন জায়গা সম্বন্ধে ধারণা তার মানসপটে ফুটে উঠে। আজকের স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর টি. ভি. দেখার ফলে সাগরতলের ভূমিরূপ এবং মহাকাশ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারে। একেই দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্যের উৎস বলা হয়। কিন্তু কোন জায়গায় গবেষণার উদ্দেশ্যে, ভ্রমণ বা অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে নিজে গিয়ে দেখে, শুনে, বুঝে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে প্রথম পর্যায়ের তথ্যের উৎস বলা হয়। এই দুই পর্যায়ের তথ্য মিলিয়ে গড়ে ওঠে কোনো মানুষের ব্যক্তিগত দেশ পরিসর (Personal space)। পক্ষান্তরে, সংস্কৃতি ব্যক্তির মনোজগতের উপর চাপ ফেলে। সংস্কৃতি ভেদে মানুষের জগৎ সম্পর্কে ধারণা কিরূপ পরিবর্তিত হয় তা ভূগোলবিদদের জানতে হয়।

প্রকৃতি মানুষের সামনে অগণিত প্রতিমূর্তি, পছন্দ ও সমস্যা তুলে ধরে যে তা থেকে বেছে নেওয়া কষ্টকর। অথচ সংস্কৃতি এই অগণিতের মধ্যে থেকে বিশেষ কয়েকটি উদ্দীপক বেছে নিতে মানুষকে সাহায্য করে। এ জন্য আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, এটি সংস্কৃতির অঙ্গ। একটি বিশেষ সমাজ-সংস্কৃতিভুক্ত সব মানুষ এককভাবে ও সমষ্টিগত ভাবে পরিবেশের প্রতি সাড়া দেয়।

সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে রয়েছে একটি মানসিক বা আধ্যাত্মিক পরিবেশ। আর এই পরিবেশই মানুষের কর্মকাণ্ড ও আচরণ নির্ধারণ করে। এ সব বিষয় সমীক্ষা করা ছাড়াও ভূগোলবিদরা ব্যক্তির মানসিক পরিবেশের সাথে তাঁর আচরণের সম্পর্ক জানতে আগ্রহী।

1.5.2 পরিবেশগত পছন্দ (Environmental Preference)

মানুষের মানসিক পরিবেশের সাথে তার আচরণের সম্পর্ক বর্তমান থাকায় পরিবেশ থেকে সে পছন্দনীয় বিষয়টি বেছে নেয়। পরিবেশগত পছন্দের অগ্রাধিকার দুই ধরনের ঃ (ক) ভূ-দৃশ্য পছন্দের অগ্রাধিকার এবং (খ) বাসস্থানের অবস্থান নির্বাচনের পছন্দের অগ্রাধিকার।

প্রথমত মানুষের সংস্কৃতির পার্থক্যের জন্য ভূ-দৃশ্য নির্বাচনে পছন্দের পার্থক্য ঘটতে দেখা যায়। ছোটনাগপুরের মালভূমির সাঁওতালরা মহুয়া-শাল ঘেরা নির্জন এলাকা পছন্দ করে। পক্ষান্তরে, মুর্শিদাবাদের কালান্তর অঞ্চলের মানুষেরা পলি সঞ্চিত নদী বিধৌত সমতল জায়গা পছন্দ করে। দ্বিতীয়ত বাসগৃহের অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রের পরিবেশ পছন্দের অগ্রাধিকারের কথা আসে। কোন ব্যক্তিকে কোন নতুন জায়গায় নিয়ে বাসগৃহের অবস্থান নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হলে সে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতির প্রভাব অনুসারে মানসিক মানচিত্র (mental map) ব্যবহার করে জায়গা নির্বাচন করবে। কেউ হয়ত নিজের পরিচিত জায়গায় চেনাজানা পরিবেশে আত্মীয়-স্বজনদের কাছাকাছি এলাকায় উপযুক্ত স্থান বেছে নেবে। আবার কেউ হয়ত অজানাকে জানার আনন্দে আম কাঁঠালের বাগান তৈরী করার উপযোগী উঁচু ভূমি বা দূরের জায়গা বেছে নেবে।

1.5.3 অবস্থান নির্বাচনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

অবস্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মানসপটের মানচিত্র অনুযায়ী স্থান নির্বাচনে হেরফের হলেও

চিত্র : মানসিক মানচিত্র

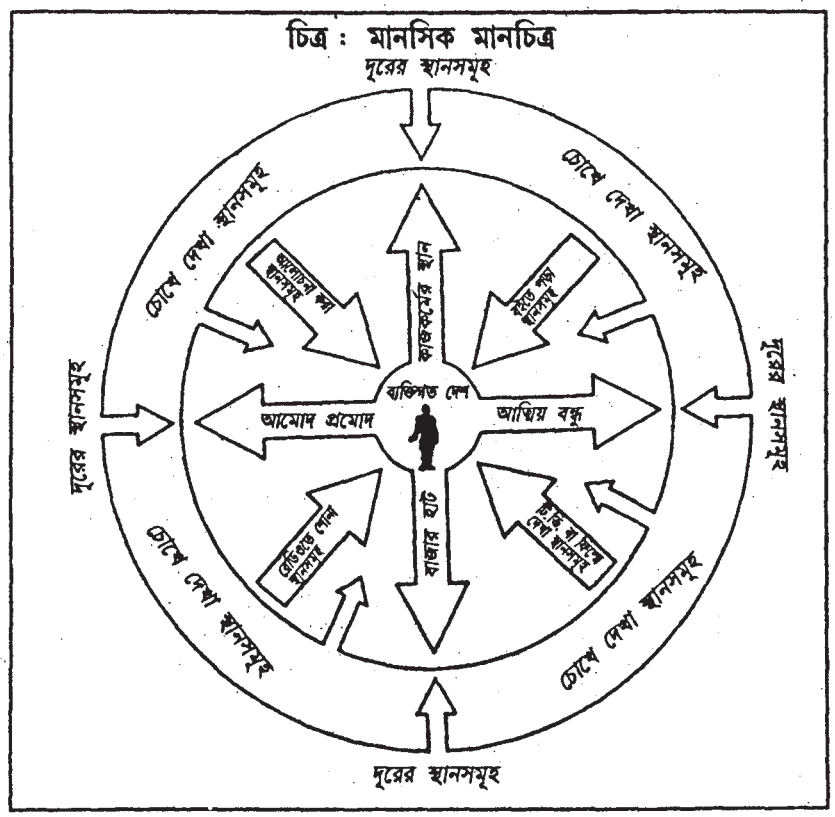

এক্ষেত্রে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (ক) একই সামাজিক শ্রেণীভুক্ত লোকদের পরিবেশ

প্রত্যক্ষণ প্রায় একই রূপ। (খ) শিক্ষা, ভাষা প্রভৃতি মানসপটের মানচিত্র বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত, ধনী মানুষের শহর সম্পর্কে ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট। পক্ষান্তরে, অশিক্ষিত দরিদ্র লোকদের শহর সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকে না। (গ) পারিবারিক অবস্থান পরিবেশ প্রত্যক্ষণে বিশেষ প্রভাব রাখে। কোন একজন ব্যক্তি'কে' এবং 'কোথায় থাকেন' তা তার পৃথিবী সম্পর্কে ধারণাকে প্রভাবিত করে এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের Los Angel শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে পরিবেশগত বেদন নিয়ে যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, তার ফলাফল খুব মনোগ্রাহী। উক্ত সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অপেক্ষাকৃত ধনী শ্বেতকায়দের শহর সম্পর্কে ধারণা ছিল যথেষ্ট বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ; দরিদ্র কৃষ্ণকায়দের এই ধারণা অনেক সীমিত ; এবং স্প্যানিশ ভাষাভাষী সাম্প্রতিক অধিবাসীদের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের বাস এলাকা ছাড়া শহরের বাদবাকি অংশ সম্পর্কে ধারণা নেই বললেই চলে। সুতরাং ব্যক্তির কাছে বৈষয়িক পরিবেশ অপেক্ষা পরিবেশগত বেদন বেশী গুরুত্ব বহন করে।

1.5.4 পরিবেশগত বেদনের ধাপ (Stages of Environmental Perception)

পরিবেশের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া ধাপে ধাপে সংঘটিত হয়। এজন্য পরিবেশ প্রত্যক্ষণের নিম্নলিখিত ৫টি ধাপ সনাক্ত করা যায়।

(১) সক্রিয় প্রতিক্রিয়া (Effective response) ঃ অনুভূতিতে সাড়া দেবার মত প্রতিক্রিয়া পরিবেশের সাথে পরবর্তী সম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারণ করে।

(২) দিক নির্ণয়ী প্রতিক্রিয়া (Orientative response) ঃ পরিবেশের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিকগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করলে ব্যক্তি বিশেষের পরিবেশের সাথে পরিচিতি হতে শুরু হয়।

(৩) শ্রেণী বিভাগের প্রতিক্রিয়া (Categorizing response) ঃ যখন বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশকে বোঝা সহজ হয়।

(৪) বিধিবদ্ধ করণের প্রতিক্রিয়া (Systematizing response) ঃ আপাতভাবে অসংলগ্ন ঘটনাবলী যখন পরস্পর সাজান হয় তখন পরিবেশের মধ্যে কার্যকারণগুলো সম্বন্ধে জানা যায়।

(৫) নিপুণভাবে পরিচালনার প্রতিক্রিয়া (Manipulative resoponse) ঃ এর মাধ্যমে মানুষ নিজের কাজে পরিবেশকে ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ পরিবেশকে এভাবে পরিবর্তন করা, নতুন ভাবে সাজান ও কাজে লাগান।

1.5.5 পরিবেশগত বেদনের প্রয়োগ (Application of Environmental Perception)

ভূগোলবিদদের কাছে পরিবেশ প্রত্যক্ষণের গুরুত্ব প্রচুর। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মনোজগতে পরিবেশের

যে প্রতিকৃতি গড়ে উঠে, তার সাথে ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য। মানুষ কিভাবে আচরণগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিবেশ প্রত্যক্ষণের প্রয়োগ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায়। পরিকল্পনা মানেই বর্তমান পরিস্থিতিকে বদলে উন্নততর, অধিকতর উপযোগী করে তোলার চেষ্টা, তা যে প্রাকৃতিক পরিবেশ হোক বা সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা। সমস্যা হল বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সদস্যরা পরিবেশকে একইভাবে মূল্যায়ন করেন না। এই পার্থক্য ঘটে পরিবেশগত বেদনের জন্যই। আবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বহুধাবিভক্ত (pluralist) সমাজে ঐক্যমত গড়ে ওঠে না। ভারতে বড় বাঁধ গড়ে ওঠা উচিত কিনা এনিয়ে নানা গোষ্ঠীর নানা মত। গাড়োয়াল হিমালয়ের তেহরি কিংবা নর্মদা নদীর উপরে সর্দার সরোবর বাঁধ নিয়ে বিতর্কই এর প্রমাণ। সরকারিভাবে আঞ্চলিক নীতি (regional policy) গ্রহণের সময়েও পরিবেশগত বেদনের বিষয়টির গুরুত্ব দেওয়া উচিত। পুরুলিয়ায় শিল্পস্থাপন করার নীতি গ্রহণ করলেই চলবে না, শিল্পোদ্যোক্তাদের মনে শিল্পে অনুন্নত এই জেলা সম্পর্কে যে নঞর্থক ধারণা আছে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে।

1.5.6 ভৌগোলিকদের পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গী (Geographers' approach to Environment)

ভূগোলে পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গীকে দু'ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে। এক, সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গী, দুই, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী। সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীকে মানুষকে পরিবেশের অঙ্গ হিসাবে দেখা যায়। পরিবেশ এখানে মানুষের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করছে এরূপ ভাবা হয়। যাকে এককথায় পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ বাদ (Environmental Determinism) বলা যায়। বস্তুতপক্ষে, এই দৃষ্টিভঙ্গীকে মানবীয় ভূগোলের অঙ্গ হিসাবে ভাবা হয়। এই ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ।

পৃথিবীর কোন অঞ্চলের মানুষ কেন পশুপালক যাযাবর, কোন অঞ্চলের মানুষ কেন কৃষিজীবী. কোন অঞ্চলের মানুষ কেন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নত তার কারণ অনুসন্ধান করা মানবীয় ভূগোল ও পরিবেশের বিষয়বস্তু। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে কেন ধান/গম বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর কোন কোন দেশ কেন বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ, কোন কোন দেশ কেন শিল্পে উন্নত সে সম্বন্ধে জানা এবং এই জ্ঞান মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা মানবীয় ভূগোল ও পরিবেশের বিষয়সূচীর অন্তর্গত। মানবীয় ভূ গোল ও পরিবেশ পৃথিবীতে বিভিন্ন সম্পদের উৎপত্তি স্থল এবং বিন্যাসের কারণ আলোচনা করে। কেন যুক্তরাষ্ট্র উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন করে, ভগ্ন উপকূলরেখা সম্পন্ন ইউরোপীয় দেশগুলো কেন ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে উন্নত তা জেনে নিয়ে উন্নত স্থল বা সামুদ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে চাহিদাপূর্ণ অঞ্চলে প্রেরণের ব্যবস্থা করা মানবীয় ভূগোল ও পরিবেশের কাজ।

মানবীয় ভূগোল ও পরিবেশ একটি যথেষ্ট আলোচিত বিষয়। বলতে হলে এটি ভূগোলের অর্ধেক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব করে এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও পরিবেশ অন্য অর্ধেকের ওপর অবদান রাখে। প্রকৃতপক্ষে, মানবীয় ভূগোলবিদ ও পরিবেশবিদ এবং প্রাকৃতিক ভূগোলবিদ ও পরিবেশবিদ উভয়েই মানুষ, সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যবর্তী সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশদ আলোচনা করতে আগ্রহী। মানবীয় ভূগোল ও পরিবেশ কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ভূগোলই বিবেচনা করে না বরং একই সাথে জনসংখ্যা ভূগোল, নগর ভূগোল, অর্থনৈতিক ভূগোল, রাজনৈতিক ভূগোলও পাশাপাশি অর্থনীতি, আইন, সংস্কৃতি, পরিবহণ, যোগাযোগ, শক্তি, শিল্প, বাজারজাতকরণ ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা ঐতিহাসিক ভূগোল ও সামাজিক ভূগোল ও বিনোদন ব্যবস্থাগুলোও অন্তর্ভূক্ত করে।

মানুষের ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার, প্রথা, সামাজিক সংগঠন, জাতীয় চরিত্র, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ কৌশল, বসতি ঘনত্ব প্রভৃতি মানবীয় ভূগোল ও পরিবেশের বিষয় সূচীর অন্তর্ভূক্ত। প্রাকৃতিক ভূগোলবিদের মতই মানবীয় ও পরিবেশ ভূগোলবিদ মাটি ক্ষয়ীভবন, জল প্রবাহ, উপকূলরেখা, এমনকি উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে গবেষণা করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মানব সমাজগুলো কতটা বিপর্যস্ত হয়, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ গত বেদন, এমনকি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়গুলোও মানবীয় ভূগোল আধুনিক ছবিতৎসী।

ভূগোলে সর্বপ্রথম বাস্তুসংস্থানের নীতি ও পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করে জীবভূগোল (Biogeography)। ক্রমশ ভৌগোলিকেরা মানুষের কাজকর্মকেও জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার ও ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। 1910 সাল থেকে মানুষ ও পরিবেশের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া বোঝানোর জন্য মানবীয় বাস্তুসংস্থান শব্দটির বহুল ব্যবহার শুরু হয়। প্রকৃতির অন্তর্গত জীবসমূহের মধ্যে মানুষের স্থান ঠিক কোথায় এবং অন্যান্য জীবের মতোই মানুষের সাথে প্রাকৃতিক সম্বন্ধ কিভাবে গড়ে উঠেছে মানবীয় বাস্তুসংস্থান (H. H. Barrows) ভূগোলের নিজস্ব একটি বিশেষ ক্ষেত্র এবং নিয়ন্ত্রক দৃষ্টিবিন্দু থাকার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা সম্ভব যদি ভূগোলকে মানবীয় বাস্তুসংস্থান হিসাবে দেখা হয়। ব্যারোজের ধারনা অনুসারে ভূগোল হল মানবীয় বাস্তুসংস্থানের বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের এক শাখার গবেষণার ফলাফল যেমন অন্য শাখায় কাজে লাগে, বাস্তুসংস্থানিক ধারণাগুলিকে মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে ব্যবহার করাও এক যুক্তিসংগত প্রসার এ কারণে বাস্তুসংস্থানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক নয়, আবার নৃকেন্দ্রিকও নয়। যে কোনও বাস্তুসংস্থানিক সমীক্ষাতেই জীব এবং পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক পারস্পরিক আছে এমন ভাবা হয়। প্রতিটি জীবই তার

পরিবেশকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি নিজেও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাস্তুসংস্থানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাই মানুষের জীবন পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে ভাবা হয় না, বরং মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক নির্ণয়ে উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যারোজ বিশেষ বিশেষ পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা কিভাবে গড়ে উঠে তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন তিনি বলেছেন আঞ্চলিক ভূগোলেও বাস্তুসংস্থানের মূলনীতিগুলি ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে (অর্থাৎ 1920 ও 1930 দশকে) মানবীয় বাস্তুসংস্থানের সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার উন্নতি ঘটে। এ ধরনের সমীক্ষায় নাগরিক পরিবেশ (urban environment) সামাজিক বিষয়গুলির উপরে জোর দেওয়া হত। সামাজিক বাস্তুসংস্থানবিদরা (social ecologists) শহরবৃদ্ধির ধরন, আবাসীয় বন্টন, জীবিকার স্তরবিভাগ এমনকি নগরাঞ্চলে অপরাধ-সংগঠনের ধরন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতাত্ত্বিক পার্ক ও ভৌগোলিক বারজেস (Robert E. Park and Earnest Burgess)-র নাম উল্লেখযোগ্য। এরা দেখিয়েছেন যে, স্বাভাবিক পরিবেশে উদ্ভিদজগতে যেমন পরপর কতকগুলি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক প্রজাতি অন্যের এলাকা দখল করে, ঠিক তেমনই একটি নগরের ভিতরেও বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী একে অন্যের এলাকা দখল করে, বারজেস লক্ষ্য করেছেন যে, শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত আবাসীয় এলাকা এভাবে বাস্তুসংস্থানিক প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়ে যায়। তিনি আরো বলেছেন যে নগরের আভ্যন্তরীণ ভূমি ব্যবহারও নির্ধারিত হয় বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। শিকাগো শহরে বারজেস লক্ষ্য করেছেন যে শহর কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত ভূমির মূল্য সবচেয়ে বেশি কারণ শহরের যে কোনও অঞ্চল থেকে তা সবচেয়ে সুগম্য। এই সুগম্যতার সুবিধার জন্যই নগরের যাবতীয় বাণিজ্যিক কার্যক্রম এখানে কেন্দ্রীভূত হয়। ওই ভূমিকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে কেন্দ্রীয় ভূমির উচ্চ মূল্য বা খাজনা মেটানো সম্ভব। এভাবে বাণিজ্যিক ও আবাসীয়, দুই ব্যবহারের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে নগরের কেন্দ্রকে ঘিরে গড়ে উঠবে বাণিজ্যিক এলাকা এবং আবাসীয় এলাকাগুলি অবস্থিত হবে কেন্দ্র থেকে দূরে। গত তিন দশকে পরিবেশ আন্দোলনের জোয়ার এসেছে, ফলে ভৌগোলিকেরা একরকম নতুনভাবে বাস্তুসংস্থানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। ভূগোলে এই দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব যেন বহুগুণে বেড়ে গেছে। আবার একথাও অনেকে মনে করছেন যে পরিবেশ-আন্দোলনের হাত ধরে নতুন বাস্তুসংস্থানের দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে ভূগোলে ঢুকে পড়েছে নব-নিয়ন্ত্রণবাদ। Holistic Environment বলতে সামগ্রিক পরিবেশকে বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। এতে বলা হচ্ছে সম্পদ

ব্যবহারজনিত যে সব বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তা বিচার করা এবং সমস্ত সমস্যা একসাথে সমাধান করা উচিত, একে একে নয় ("to consider all the ecological problems coming out of resource utilization together and thus all problems should be solved together and not one by one" (Savindra Singh, Environmental Geography)। সামগ্রিক পরিবেশের আলোচনায় এখন আমরা মানুষকে, আরো ভালোভাবে বলতে গেলে মানুষের কার্যাবলী নিয়ে বিচার করব। মানুষের কার্যাবলীর ফলে পরিবেশের অবনমন কেমন করে ঘটে চলেছে এবং কি কি ব্যবস্থা নিলে সামগ্রিকভাবে এই অবক্ষয় ঠেকানো যাবে তা এবার আমরা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব।

1.6 পরিবেশের অবক্ষয় ঃ কারণ ও গৃহীত পদক্ষেপ

(১) বাস্তুসংস্থানের অন্যতম সমস্যা হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এই জনস্ফীতি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই কমেছে, মানুষের গড় আয়ুও বৃদ্ধি পেয়েছে। এইভাবে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা উর্দ্ধমুখী হচ্ছে। এছাড়া জন-প্রচরণের ফলে জনসংখ্যার চাপ উর্দ্ধমুখী হচ্ছে যা বাস্তুসংস্থানে আঘাত করছে। তাছাড়াও অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন, প্রোমোটারের লালসায় গড়ে ওঠা বহুতল বাড়িগুলি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। দূষণ, ঘন জনবসতি, পরিষ্কার পানীয় জলের অভাব, দুর্গন্ধ, দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব পরিবেশ কলুষিত করছে। কলকাতার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বস্তিতে বাস করছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরগুলির একই পরিস্থিতি।

(২) ভারতবর্ষের দারিদ্র্য পরিবেশের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলছে। ১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এরূপ দাবী করেন। দারিদ্র্যের কারণে মানুষ পরিবেশের উপাদান-গুলিকে নানাভাবে নষ্ট করছে। প্রাকৃতিক সম্পদের এই অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পরিবেশকে কলুষিত করছে। বাস্তুসংস্থানও এর দ্বারা ভারসাম্যহীন হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বনাঞ্চল সুরক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকারী মাধ্যমগুলি পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি প্রত্যেককে যত্নশীল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

(৩) পরিবেশের সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এইদিক থেকে বলা যায় পরিবেশ যত দূষিত হবে, ততই জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক্ষেত্রে জল দূষণ, শব্দ এবং বায়ু দূষণ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৭০ সালে সংসদে আইন পাশ করে জল দূষণ প্রতিরোধ ও

নিয়ন্ত্রণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই আইনের ২৪ (১)-এর (ক) ধারায় বলা হয়েছে প্রাকৃতিক জলধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে বিষ প্রয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বায়ু দূষণের ক্ষেত্রেও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে পাশ করা দূষণ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৬ (২) ধারায় কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে উচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ৩৭ (১) ধারায় বায়ু দূষণ হেতু কোন ব্যক্তিকে দেড় থেকে ছয় বছর জেল ও জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শব্দ দূষণের ক্ষেত্রে বলা হয় যে উচ্চ তীব্রতাযুক্ত শব্দ মানুষের স্নায়ুতন্ত্র ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এক্ষেত্রে ৪৫ ডেসিবেল শব্দকে নিরাপদ মাত্রা হিসাবে বেঁধে দিয়েছে। ভারতবর্ষের অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ। এর ফলে মানুষের বধিরতা, মানসিক বিপর্যয়, অনিদ্রা, রক্তচাপ, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটর গাড়ী, বাস, লরি সহ যানবাহনের চাপ, ট্রেনের হুইসেল, বিমানের শব্দ প্রভৃতি থেকে শব্দ দূষণ অতিমাত্রায় ঘটছে। এছাড়া কলকারখানা, লাউড স্পীকার, জেনারেটর ইত্যাদি শব্দ সৃষ্টিকারী যাবতীয় থেকে একত্রিত শব্দ ক্রমশঃ শব্দ দূষণ ঘটিয়ে চলেছে যা বাস্তুসংস্থানে আঘাত করে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯৬ সালে বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় শব্দদূষণ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ে মাইক ব্যবহারের উপর একটি উল্লেখযোগ্য বিধি-নিষেধ জারী করেন।

(৪) বাস্তুতন্ত্র ভারসাম্য হীনতায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারীরা। মহিলারা জীবনধারণের ক্ষেত্রে নিয়োজিত জ্বালানী, জল, খাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করে। পরিবেশের অতি নিকটে থাকার ফলে পরিবেশ দূষণের বলি হয় এই নারীরাই। এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের জন্য মহিলাদেরকে অক্লান্ত পরিশ্রমও করতে হয়। বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলারা এক্ষেত্রে বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

1.7 সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা

বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষাই সুস্থ জনজীবনের অন্যতম দায়িত্ব। প্রাকৃতিক সম্পদগুলি তাই যতদূর সম্ভব সঞ্চিত রাখতে হবে। যত কম সম্ভব এগুলি ব্যয় করতে হবে। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য সুরক্ষায় অন্তরায় সেদিকে সকলকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। বিশেষ করে জনসংখ্যা হ্রাস, নানাবিধ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সকলের সার্বিক প্রয়াস, প্রাকৃতিক সম্পদের বিকল্প প্রযুক্তিগত

উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গঠন, স্বাস্থ্য চেতনা, পরিবেশ সচেতনতা, বনসৃজন, বস্তি উন্নয়ন প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, নারী সচেতনতা, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটালে বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্যহীনতা কখনোই দূরীভূত হবে না। আগামীদিনের নির্মল জীবনধারা গড়ে তুলতে হলে আজ থেকেই সকলকে প্রয়াসবদ্ধ হতেই হবে। এর বিকল্প ব্যবস্থা বলে আর কিছুই এখনো গড়ে উঠতে পারেনি, কোনদিনও তা সম্ভব বলে মনে হয় না।

(উৎস ঃ ভারতীয় সামাজিক সমস্যা ঃ চতুর্থ খণ্ড ঃ কমল ইন্দু, বাণী প্রকাশন, কলকাতা)

একক 2 □ পরিবেশ

গঠন

2.0 প্রস্তাবনা

2.1 পরিবেশ

2.2 আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহ (Components of socio-economic environment)

2.3 স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Health and Nutrition)

2.4 প্রশ্নাবলী

2.0 প্রস্তাবনা

Population, Poverty and Pollution সম্ভবত এই তিনটি উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এক বড় সমস্যা। আরোও লক্ষ্য করার মতো যে এই তিনটি সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। চীনের কথা আলাদা, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই কমবেশি এই সমস্যায় ভুগছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আজ পৃথিবীতে অনুন্নত দেশগুলোতে প্রতি রাতে আশি কোটি মানুষ পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমোতে যায়, যদিও বিগত দুই শতকে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আগের তুলনায় বেড়েছে। পৃথিবীর 100 কোটি লোকের খাদ্যশস্য কেনবার আর্থিক সমার্থ নেই। কিছুদিন আগে উত্তর কোরিয়াতে পাঁচ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। ইন্দোনেশিয়াতে ক্ষুধার জ্বালায় প্রতিদিন 450 জন শিশু মারা যাচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষে অভুক্ত মানুষের সংখ্যা গোটা বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বিশ্বব্যাপী এই অপুষ্টি ও ক্ষুধার জ্বালা ক্রমশ গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি করছে।

জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে চলছে জমি থেকে অতিরিক্ত ফসল ফলানোর প্রচেষ্টা। ফলে চাষের জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বিষাক্ত পদার্থগুলোর কিছুটা অংশ বৃষ্টির জলের সাথে আশেপাশের জলাশয় ও নদীনালায় গিয়ে মেশে। এজন্য জলজ প্ল্যাঙ্কটন ও তার খাদক মাছ বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। মাটিতে মেশা বিষের অবশিষ্টাংশ টেনে নিচ্ছে ক্ষেত্রের ফসল, খড় ও দানাশস্য। ফলে শুধু মানুষ ও গবাদি পশুই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পাখী, পোকা মাকড়, যারা মাঠের ঐ বিষাক্ত দানাশস্য খাচ্ছে। বিষাক্ত দানাশস্যের প্রভাবে পাখীর ডিমের খোলা ক্রমশ পাতলা হতে থাকে এবং এভাবে একদিন প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে তাদের এক একটি প্রজাতির হঠাৎ লুপ্ত হয়ে যাবে। তাই Silent

Spring এ Rachel Carson আক্ষেপ করে বলেছিলেন একদিন সবুজ পাতায়, ফুলে ছাওয়া বসন্ত হয়ত আসবে যেদিন কোন পাখী আর গান গাইবে না।

অভাবী মানুষ তার গ্রাসাচ্ছদন করতে সম্পদকে নিজের খেয়ালখুশি মতো ব্যবহার করে, হয়ত প্রয়োজনের অতিরিক্তই। তাই যে তার প্রথম সুহৃদ, দেবতার আতিথ্য যে তাকে বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নির্বিচারে আক্রমণ করে। শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই নয়, ইঁট কাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য ও অরণ্য নির্মমভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে। ফলে মাটির উর্বরতাই শুধু নষ্ট হচ্ছে তা নয়, বন্যা, অনাবৃষ্টি, খরা, কাঠের সঙ্কুচিত যোগান এবং সর্বোপরি বায়ুদূষণ হচ্ছে। এতো গেল তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা।

উন্নত দেশের পরিবেশ সমস্যাটা একটু ভিন্ন ধরনের। সেখানে যথেচ্ছ ভোগ থেকে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ধনী দেশগুলোতে গাড়ীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে বিপুল পরিমাণে জীবাশ্ম জ্বালানী খরচ হচ্ছে। গাড়ীর ধোঁয়া বাতাসের জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে ধোঁয়াশা (smoke) সৃষ্টি করছে। তাছাড়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ইত্যাদি নির্গত গ্যাস বায়ুমণ্ডলের মৌলিক উপাদানের চিরাচরিত ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এতে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা যেমন বাড়ছে, তেমনি মহাকাশের অতিবেগুনী রশ্মিকে ঠেকিয়ে দেয় যে ওজোন স্তরের বর্মতার আবরণও ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। পরিবেশের ওপর আধিপত্য বাড়লে হয়ত একদিন ওজন স্তরের ফুটোর পরিমাণ আরো বাড়বে ও পৃথিবীতে নানা রোগ ব্যাধির প্রকোপ বাড়বে।

2.1 পরিবেশ

এখন প্রশ্ন হল পরিবেশ কি? সোজা কথায় জলবায়ু, আলো, উষ্ণতা, মাটি, চারপাশের গাছপালা, পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, ও বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয় এবং এমন একটি পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা আমাদের শরীর মনকে প্রভাবিত করে। ইংরেজী শব্দ Ecology থেকে এসেছে পরিবেশ তত্ত্বের ধারণা। এই শব্দটির উৎপত্তি Oikos নামক গ্রীক শব্দ থেকে যার মানে হল বাড়ি। প্রতিটি জীবের নির্দিষ্ট বসতি আছে। বসতিকে ঘিরেই জীবের পরিবেশ গড়ে ওঠে। বিভিন্ন জীব বিভিন্ন ধরনের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে বাস করে। জীব ও তার পরিবেশের মধ্যে রয়েছে এক অবিচ্ছেদ্য আন্তঃসম্পর্ক। সমষ্টিগতভাবে বসতির ওপর ভৌত-রাসায়ানিক উপাদান বা অ্যাবায়োটিক ফ্যাক্টর (abiotic factor) এবং সজীব উপাদান বা বায়োটিক ফ্যাক্টর (biotic factor) ক্রিয়া করে চলে। এজন্য বলা হয় পরিবেশ হল "Sum total of living and non-living components influences and events surrounding an organism. Living components are called biotic components while non-living are called abiotic components". পরিবেশকে

আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি : (a) প্রাকৃতিক ও ভৌত পরিবেশ (Physical environment) এবং (b) সামাজিক পরিবেশ (Social environment).

● **প্রাকৃতিক পরিবেশ :**

প্রকৃতিতে সমস্ত জীবগোষ্ঠী জড় উপাদান (non living abiotic components) নিয়ে প্রকৃতির নিজস্ব উপায়ে সৃষ্ট পরিবেশ-ই হল প্রাকৃতিক পরিবেশ। পৃথিবী গঠিত হয়েছে চারটি অংশ নিয়ে। এগুলো হল : (i) অশ্ম মন্ডল (Lithosphere), (2) বারি মন্ডল (Hydrosphere), (3) বায়ুমন্ডল (Atmosphere) এবং (4) জীবমন্ডল (Biosphere)। শেষোক্ত অংশটিকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় : (a) সামুদ্রিক পরিবেশ (Marine environment) (b) স্থলবিষয়ক পরিবেশ (Terrestrial environment), (c) পরিষ্কার জলের পরিবেশ (Fresh water environment), (d) মোহনার পরিবেশ (Estuarine environment)। গাছপালা ও প্রাণীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে জৈব পরিবেশ যার ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। সাধারণ ধ্যান-ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি যে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল আর সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। প্রাকৃতিক পরিবেশকে অনেক সময় আঞ্চলিক স্তরেও ভাগ করতে পারি। যথা— পার্বত্য পরিবেশ, উপকূলীয় পরিবেশ, মরু এবং মেরুদেশীয় পরিবেশ।

2.1.1 প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান :

পৃথিবীর উপরিভাগে যে কঠিন আবরণ রয়েছে তা হল ভূ-ত্বক, যার ওপর আমরা বাস করছি। মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ভূ-ত্বকেই হয়। ভূ-ত্বকের ওপর প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। পৃথিবীর বহুবিধ ভূমিরূপ ও মৃত্তিকার সৃষ্টি ভূ-ত্বকেই হয়। ভূ-ত্বক কতকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। Clark and Washington-এর মতে এইসব উপাদানগুলো হল—

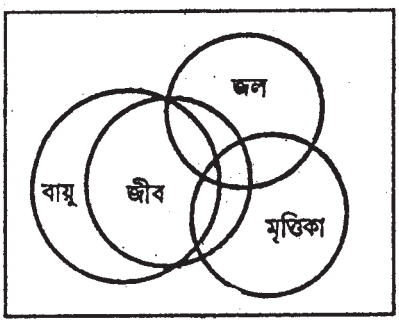

চিত্র ▸ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক।

অক্সিজেন	(46.7%)
সিলিকন	(27.7%),
অ্যালুমিনিয়াম	(8.1%),
লোহা	(5.1%),
ক্যালসিয়াম	(3.7%),
সোডিয়া	(2.8%)

পটাসিয়াম (2.6%),

ম্যাগনেসিয়াম (2.1%),

অন্যান্য (1.2%)।

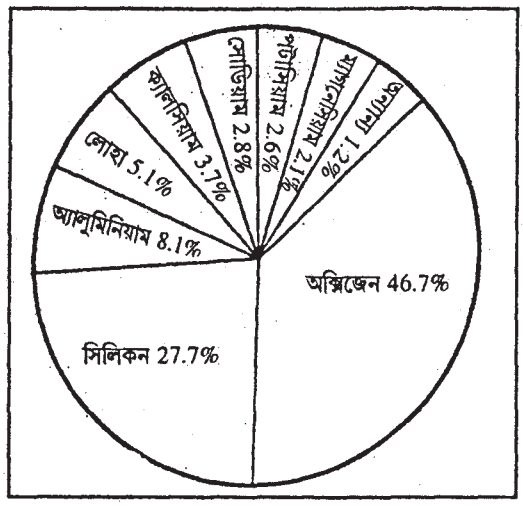

চিত্র ♦ ভূ-ত্বকের উপাদান।

ভূ-ত্বক শিলামন্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত। কঠিন আবরণে গঠিত শিলামন্ডল মোটামুটি দু'টি অংশে বিভক্ত ঃ (ক) ভূ-ত্বক ও (খ) ভূ-ত্বকের নিম্নাংশ বা অন্তস্তর (ক্ষুব্ধমন্ডল)।

ভূ-ত্বক অসমসত্ত্ব বা বিভিন্ন প্রকার শিলা দিয়ে গঠিত। ভূ-ত্বকের উপরিভাগ পাতলা মাটির স্তর বা আলগা ছোট ছোট পাথরখন্ড বা বালি দিয়ে ঢাকা। ভূ-ত্বকের নিচের অংশ বা অন্তস্তর কিন্তু প্রায় একই প্রকার অর্থাৎ সমসত্ত্ব শিলায় গঠিত। এর নিচে রয়েছে কেন্দ্রমন্ডল (Centrosphere)। ভূ-ত্বক মহাদেশের অভ্যন্তরে 30-40 কি.মি. পর্যন্ত এবং পার্বত্য অঞ্চলে আরও বহু গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। আবার সমুদ্রের তলদেশে ভূ-ত্বকের গভীরতা কিন্তু খুব কম, কোন স্থানে 3 কি.মি., আবার কোথাও 10 কি.মি.।

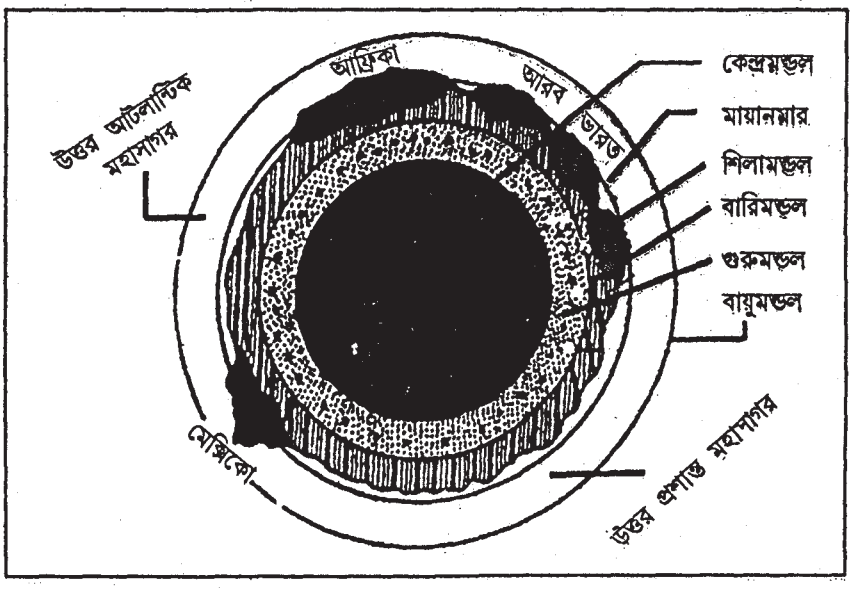

চিত্র ♦ পৃথিবীর স্তরবিন্যাস ও দেশসমূহ

ভূ-বিজ্ঞানীরা ভূ-কম্পীয় তরঙ্গের গতিবেগ লক্ষ্য করে ভূ-ত্বকের শিলাস্তরকে প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (1) অপেক্ষাকৃত লঘু শিলাস্তর ও (2) গাঢ় রঙের গুরু শিলাস্তর।

(1) অপেক্ষাকৃত লঘু শিলাস্তর ঃ ভূ-ত্বকের ওপরের অংশ গ্রানাইট জাতীয় অপেক্ষাকৃত লঘু শিলাস্তর দিয়ে গঠিত। এই শিলায় সিলিকা (Si) ও অ্যালুমিনিয়ামের (Al) পরিমাণ বেশি থাকে। সিলিকার ও অ্যালুমিনিয়ামকে একসাথে বলা হয় সায়াল (SIAL) বা সিয়াল। প্রধানত মহাদেশগুলো এই জাতীয় শিলায় গঠিত।

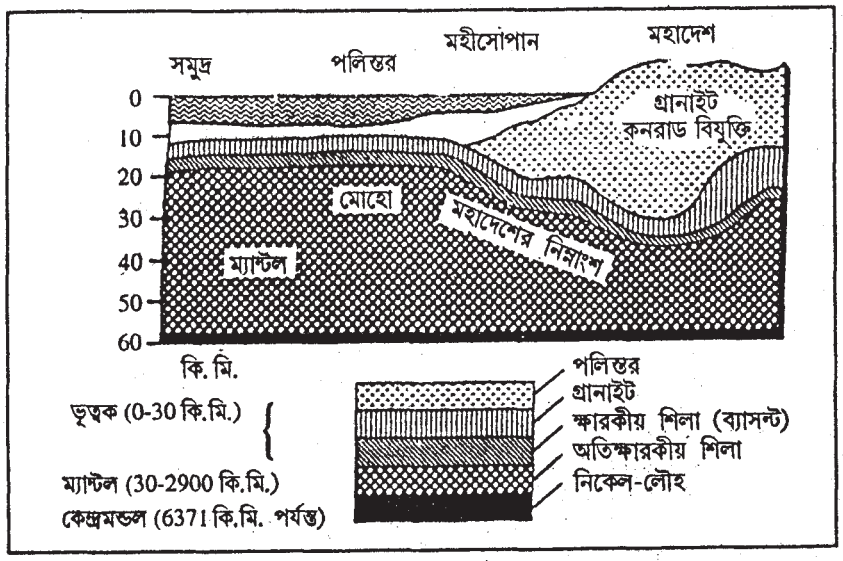

চিত্র ▸ ভূ-ত্বক, ম্যান্টল ও বিভিন্ন বিযুক্তি

(2) গাঢ় রঙের গুরু শিলাস্তর ঃ ভূ-ত্বকের নিচের অংশ ব্যাসল্ট জাতীয় ক্ষারকীয় শিলায় সৃষ্ট। প্রধানত মহাসাগরের তলদেশে এই জাতীয় শিলা দেখা যায়। এই শিলায় সিলিকার (Si) পরিমাণ 45 শতাংশ থেকে 55 শতাংশ এবং ম্যাগনেসিয়ামের (Mg) পরিমাণ 45 শতাংশ থেকে 55 শতাংশ থাকে। সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়ামকে একসাথে বলে সাইমা বা সিমা (SIMA)। আম্লিক শিলাস্তরের ঠিক নিচেই থাকে ক্ষারকীয় শিলা। এই দুই শিলাস্তর যে তলে মিলিত হয়েছে তাকে কনরাড বিযুক্তি (Conrad Discontinuity) বলে।

ভূ-ত্বক থেকে যতই পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে যাওয়া যায়, ততই তাপ ও চাপের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভূ-ত্বক ও পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের মাঝে আরও একটি স্তর রয়েছে। তা হল ম্যান্টল (Mantle)। অতএব আমরা তিনটি স্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করলাম ভূ-ত্বক, ম্যান্টল ও কেন্দ্রমন্ডল। ভূ-ত্বক ও ম্যান্টলের সংযোগস্থলকে যুগোশ্লাভিয়ার বৈজ্ঞানিক মোহোরোভিসিকের নামানুসারে মোহে বা M-discontinuity বলে।

জল অপেক্ষা পাঁচগুণ ভারী ম্যান্টল বা গুরুমন্ডল সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, কার্বন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ।

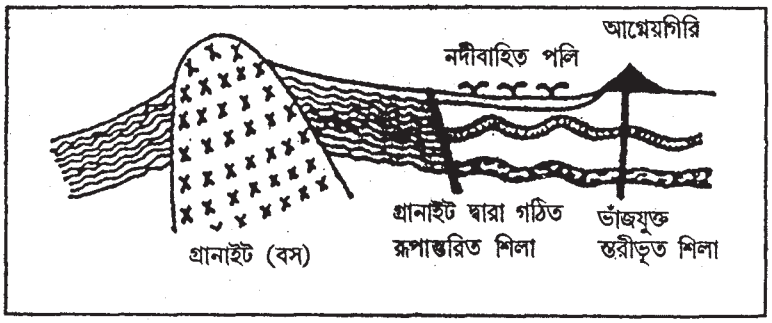

চিত্র ▸ বিভিন্ন প্রকার শিলা

আর কেন্দ্রমন্ডল নিকেল (Ni) ও লোহা (Fe) দিয়ে গঠিত (সংক্ষেপে Nife)। প্রচন্ড চাপ ও তাপে এখানকার সব উপাদান তরল অবস্থায় রয়েছে। ম্যান্টল ও কেন্দ্রমন্ডলের সংযোস্থলকে গুটেনবার্গ বিযুক্তি বলা হয়। ভূ-ত্বক গঠনকারী শিলাসমূহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। A. N. Strahler-র ভাষায় "Although a few kinds of rocks consist almost wholly of a single mineral variety, most rock types are aggregates or physical mixtures of two or more minerals. নিচের চিত্র থেকে তা পরিষ্কার হবে। তিন ধরনের শিলায় ভূ-ত্বক গঠিত হয়েছে ঃ আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত। ভূগর্ভে ম্যাগমা এবং ভূ-পৃষ্ঠের লাভা ঠান্ডা হয়ে দানা বাঁধে ও কঠিন হয়ে আগ্নেয় শিলায় পরিণত হয়। ভূ-গর্ভে সৃষ্টি হলে তাকে বলে উদ্‌বেধী শিলা, যেমন গ্রানাইট। ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্ট আগ্নেয় শিলাকে বলে নিঃসারী শিলা, যেমন ব্যাসল্ট।

চিত্র ▸ উদ্‌বেধী ও নিঃসারী শিলার উৎপত্তি

পাললিক শিলার সৃষ্টি হয় সমুদ্রের তলায়। সেখানে সঞ্জিত পলিস্তর ও জীবদেহ বিশাল জলরাশির চাপে ও ভূ-গর্ভের তাপে ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে শিলায় পরিণত হয়। পাললিক শিলা তিন ধরনের হয় ঃ (ক) সাধারণভাবে গঠিত (গ্রিট, কংগ্লোমারেট, শেল প্রভৃতি), (খ) জৈব পদার্থের দ্বারা গঠিত (চুনাপাথর, কয়লা, পিট প্রভৃতি) এবং (গ) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠিত (ডলোমাইট, ক্যালসাইট, সৈন্ধব লবণ প্রভৃতি)।

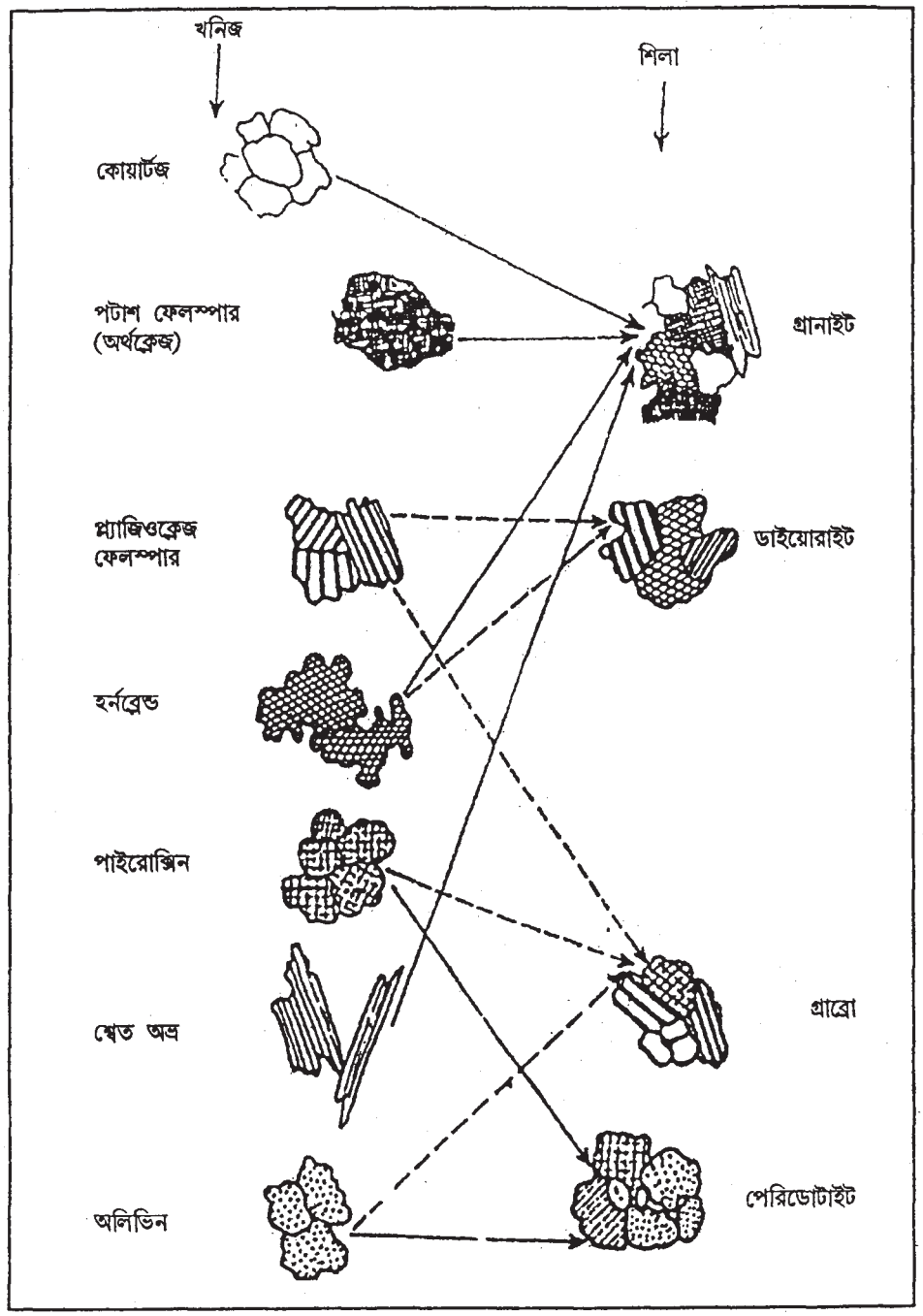

চিত্রে ◗ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণ হল শিলা। চিত্রে কয়েকটি শিলার খনিজ গঠন দেখানো হয়েছে।

আগ্নেয় ও পাললিক শিলা অনেক সময় অত্যাধিক চাপে ও প্রচন্ড তাপে পরিবর্তিত হয়ে অন্যরূপ ধারণ করে। এই ধরনের শিলাকে বলে রূপান্তরিত শিলা। গ্রানাইট থেকে হয় নিস্ (gneiss), চুনাপাথর মার্বেলে, বেলেপাথর কোয়ার্টজাইটে (Quartzite) এবং শেল স্লেটে রূপান্তরিত হয়।

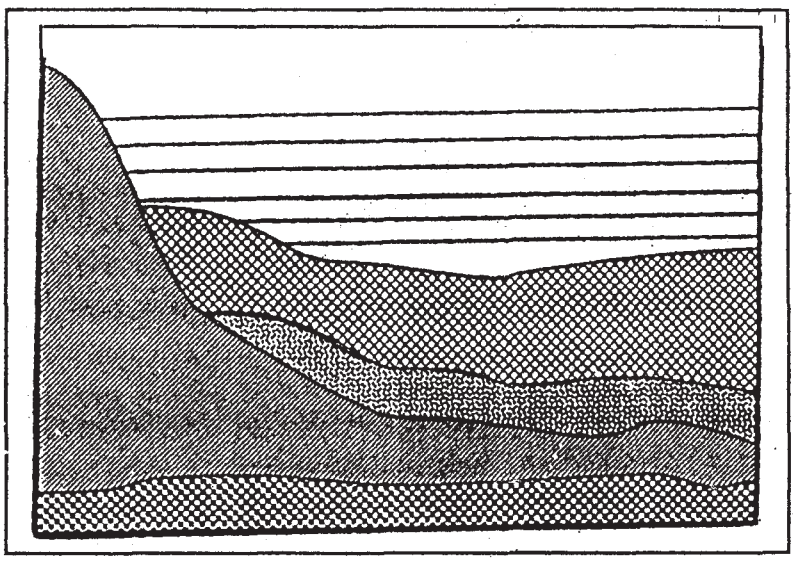

চিত্র ▸ সমুদ্রবক্ষে পলল জমা হয়ে পাললিক শিলা গঠিত হচ্ছে

2.1.2 ভূমিরূপের ওপর শিলার প্রভাব

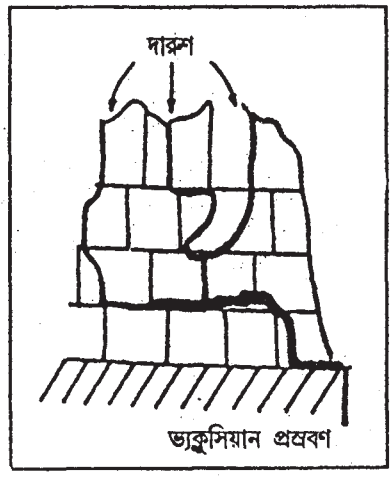

চিত্র ▸ ভ্যাক্লুসিয়ান প্রস্রবণ

শিলার সচ্ছিদ্রতার প্রভাব বেলেপাথর ও চুনাপাথরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বর্ষার পর বেলেপাথরে গঠিত কোন মালভূমিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সেটি আর্দ্র অবস্থায় রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জলপ্রবাহজনিত ক্ষয়ের দরুন বেলেপাথর অঞ্চলে গুহারও সৃষ্টি হয়। মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে মহাদেও পাহাড়ে এই রকম গুহা দেখা যায়।

তবে সচ্ছিদ্রতার প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে। এখানে বৃষ্টির জল রাসায়নিক আবহবিকার দরুন ভূ-পৃষ্ঠ বহু ফাটল ছোট-বড় গর্তের (সিঙ্কহোল, ডোলাইন) সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে কোন নদী এখানে এসে পৌঁছোলে সে তার প্রবাহ হারিয়ে ফেলে অনেকটা বালিময় এলাকায় অন্তঃসলিলা নদীর মতো, যেমন রাজস্থানের সরস্বতী, বিহারের শোন নদী। ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে নদী তার আপন ক্ষয়কার্যের দ্বারা উভালা,

পোলজির মতো বড় বড় অববাহিকার সৃষ্টি করে। এইভাবে ভূ-পৃষ্ঠ চুনাপাথরের স্তরকে উন্মুক্ত করে পুনরায় ঐ নদীটি মাটির ওপরে চলে আসে। অবশ্য চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চল যদি বৃষ্টিহীন হয় তবে পূর্বোক্ত ভূ-দৃশ্য সৃষ্টি হবে না। সেক্ষেত্রে এই সব এলাকায় নদী প্রবাহিত হবার সময় নিম্নক্ষয় করে খাড়া ঢালের সৃষ্টি করবে। অল্প বৃষ্টিপাতের জন্য এইসব অঞ্চলে পার্শ্বক্ষয় না হয়ে নিম্নক্ষয় হয়। ফলে নদী উপত্যকা "I" আকৃতির হয়। উদাহরণ হল যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদী। চুনাপাথরে গঠিত শুষ্ক অ্যারিজোনো প্রদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় ঐ নদী গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের মতো গভীর খাতের (1 মাইল বা 1.6 কি.মি.) সৃষ্টি করেছে।

(1) চুনাপাথর অঞ্চল ও ভ্যাক্লুসিয়ান প্রস্রবণ : এখানে বহু ফাটলের সৃষ্টি হয়। ঐসব ফাটলের মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির জল মাটিতে প্রবেশ করে। এখন চুনাপাথরের নিচে যদি কোন অপ্রবেশ্য শিলা স্তর থাকে, তবে ঐ তল বরাবর কোন ছিদ্র পথের সৃষ্টি হলে তা দিয়ে প্রচন্ড গতিতে জল বেরিয়ে আসে। ফ্রান্সের ফন্টেন দা লা ভ্যাক্লুস নামে প্রস্রবণের নামানুসারে ঐ জাতীয় প্রস্রবণকে ভ্যাক্লুসিয়ান প্রস্রবণ বলে।

(2) সচ্ছিদ্রতা ও ভৌমজলের সঞ্চয় : ভৌমজলের উৎপত্তি ও সঞ্চয়ের কারণ হল শিলার প্রবেশ্যতা বা সচ্ছিদ্রতা। বেলেপাথর, চুনাপাথর প্রভৃতি শিলায় বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। এইসব ছিদ্র দিয়ে জল নিচে নেমে গিয়ে অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের উপরিভাগে সঞ্চিত হয়। অবশ্য শিলাস্তরে ভৌমজলস্তরের

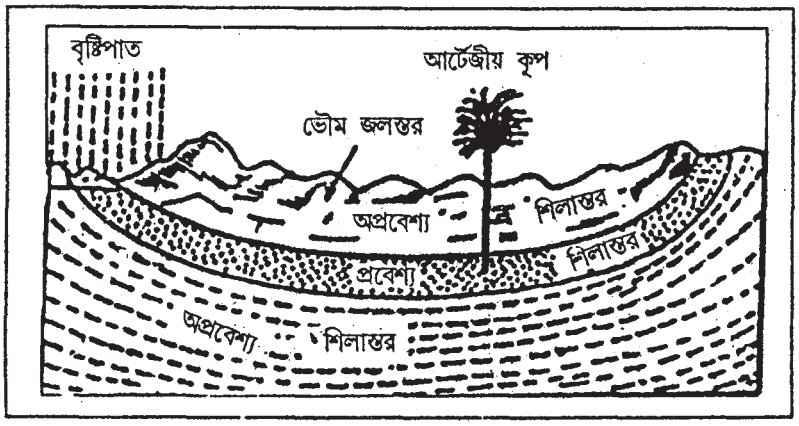

চিত্র ♦ আর্টেজীয় কূপের (প্রস্রবণ) গঠন

একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। ভৌমজলে পূর্ণ এই ধরনের শিলাস্তরকে **সম্পৃক্ত শিলাস্তর** বলে। এখন ভৌমজল যদি সম্পৃক্ত শিলাস্তরের মধ্যে দিয়ে ঢাল বরাবর গড়িয়ে গিয়ে কোন উন্মুক্ত স্থানে বেরিয়ে আসে, তখন সেখানে প্রস্রবণের সৃষ্টি হবে।

গ্রানাইট শিলায় গঠিত অঞ্চলের ভূমিরূপ গোলাকার হয়। দূর থেকে পাহাড়ের চূড়াগুলোকে গোলাকার

দেখায়। এর কারণ হল গ্রানাইট শিলার সংযোগগুলো (joint) অনুভূমিক (horizontal) অবস্থায় থাকে। শুষ্ক এবং শীতল অঞ্চলে উষ্ণতার প্রসার বেশি হওয়ায় যান্ত্রিক আবহবিকার (mechanical weathering)

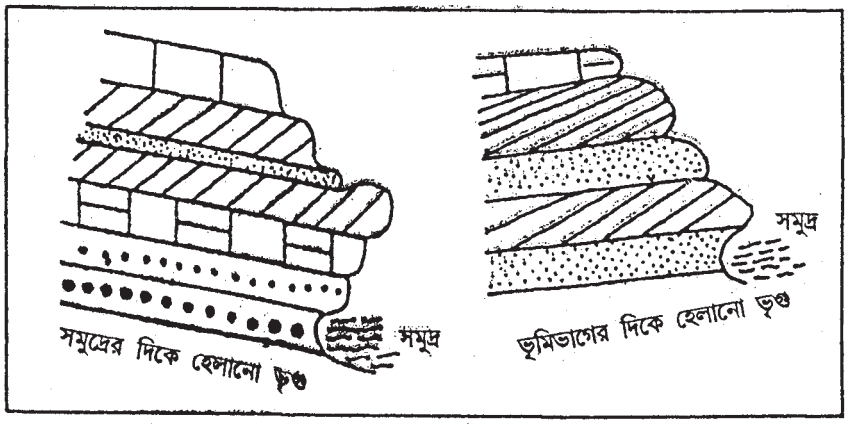

চিত্র ♦ ভূমিরূপের ওপর ঢালের প্রভাব

ঘটে থাকে। আবার আর্দ্র অঞ্চলে (humid region) জলের উপস্থিতিতে শিলার রাসায়নিক (chemical) আবহবিকার ঘটে। জৈব (biological) আবহবিকারের ফলেও শিলারাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আবহবিকারের শেষ পরিণতি হল মাটির সৃষ্টি (স্থানু মাটি insitu soil)।

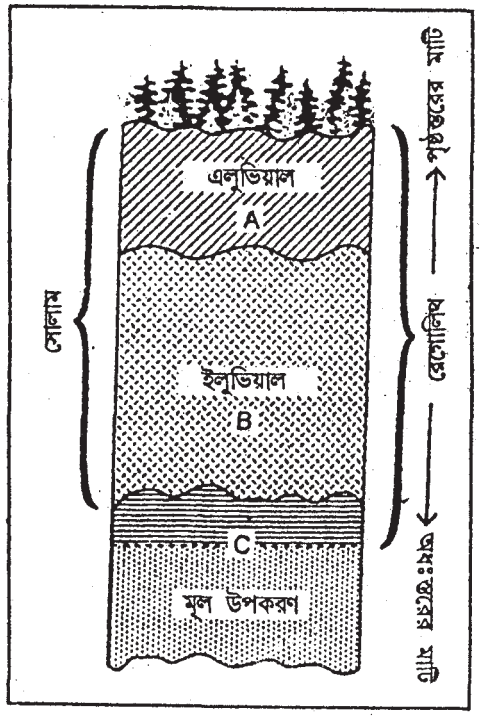

চিত্র ♦ মাটির প্রোফাইল

হিমাংশু সরকার ঃ মৃত্তিকা ভূবিদ্যা)

ভূমির সমান্তরালে অবস্থিত সুস্পষ্ট স্তরযুক্ত মাটির লম্বচ্ছেদকে মাটির প্রোফাইল (profile) বলা হয়। মাটির প্রতিটি স্তরকে হরাইজন (horizon) বলা হয়। প্রোফাইলে পর্যায়ক্রমে অবস্থিত স্তরগুলোর চরিত্র ভিন্ন হলেও তাদের জন্মসূত্র এক হওয়ার ফলে তারা পরস্পরের এবং মূল উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রোফাইল A, B, ও C এই তিনটি প্রধান হরাইজনে বিভক্ত।

প্রোফাইলের পৃষ্ঠস্তরে সাধারণত জৈব পদার্থ পরিমাণে বেশি থাকায় নিচের স্তরগুলোর চেয়ে বেশি কালো হয়। মাটির পৃষ্ঠস্তর অ্যালুভিয়েশন প্রক্রিয়ায় গঠিত হওয়ায় একে অ্যালুভিয়াল স্তর বা A হরাইজন বলা হয়। (নিখিলকৃষ্ণ দে ও

পৃষ্ঠস্তরের A-হরাইজন ও অধঃস্তরের C-হরাইজনের অন্তবর্তী স্তরে পৃষ্ঠস্তর থেকে অপেক্ষাকৃত কম জৈব পদার্থ ও বেশি কাদাকণা থাকে। এই অন্তঃস্তর অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হয়। ইলুভিয়েশন প্রক্রিয়ায় গঠিত এই অন্তঃস্তরকে ইলুভিয়াল স্তর বা B-হরাইজন বলা হয়।

অধঃস্তর অন্তর্গত B-হরাইজনের নিচের স্তরকে মূল উপকরণ বা বিশ্লিষ্ট শিলাস্তর বলা হয়। ইহাকে C-হরাইজন হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

গ্রথন (texture) অনুযায়ী মাটিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় ঃ বেলে, দোআঁশ ও এঁটেল। এই তিনটি প্রধান ভাগের মধ্যে আরও কতকগুলো উপভাগ আছে।

1. বেলেমাটি (মোটা গ্রথনের মাটি)—বেলেমাটি ও দোআঁশ বেলেমাটি এই গ্রুপের অন্তর্গত।

2. দোআঁশ মাটি (মাঝারি গ্রথনের মাটি)—বেলে দোআঁশ মাটি, দোআঁশ মাটি, পলি দোআঁশ মাটি, পলিমাটি, বেলে এঁটেল দোআঁশ মাটি, পলি এঁটেল দোআঁশ মাটি ও এঁটেল দোআঁশ মাটি এই গ্রুপের অন্তর্গত।

3. এঁটেল মাটি (সূক্ষ্ম গ্রথনের মাটি)—বেলে এঁটেল মাটি, পলি এঁটেল মাটি এবং এঁটেল মাটি এই গ্রুপের অন্তর্ভূক্ত।

উৎপত্তি অনুসারে মাটিকে দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ পরিবাহিত (drifted) ও স্থানু (insitu)।

অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু অনুসারে মাটিকে আবার তিনভাগে ভাগ করার যায় —জোনাল, ইন্ট্রাজোনাল ও আজোনাল।

● জোনাল মাটি (Zonal Soil)

জোনাল মাটির চরিত্র মাটি গঠনের দুটি কার্যকরী বিষয় যেমন বায়ু ও উদ্ভিদ দিয়ে নির্ধারিত হয়। এই মাটির প্রোফাইল অপর দুটি বর্গের মাটির প্রোফাইলের চেয়ে বেশি বিকশিত ও বিস্তৃতিতর।

● ইন্ট্রাজোনাল মাটি (Intrazonal Soil)

ইন্ট্রাজোনাল মাটির প্রোফাইল সুস্পষ্ট যাতে ভূ-সংস্থান অথবা বিরল মূল উপকরণের প্রবল প্রভাবের প্রতিফলন দেখা যায়। প্রায় সমতলভূমি অথবা কনকেভ (concave) আকারের ভূ-সংস্থানে এই মাটি দেখা যায়। এসব মাটিতে জলনিকাশ পদ্ধতি দুর্বল। এই মাটি আর্দ্রত, লবণত্ব ও ক্ষারত্বের সঙ্গে যুক্ত।

● আজোনাল মাটি (Azonal Soil)

আজোনাল মাটি অপরিণত এবং এই মাটির প্রোফাইলের চরিত্র অপরিণত হওয়ার ফলে সুস্পষ্ট নয়।

শৈশব অবস্থা, অধিক মাত্রায় মাটির অবক্ষয় অথবা মূল উপকরণের অত্যধিক বাধাদান ইত্যাদি অবস্থাগুলো এই মাটির অপরিণত হওয়ার কারণ হতে পারে।

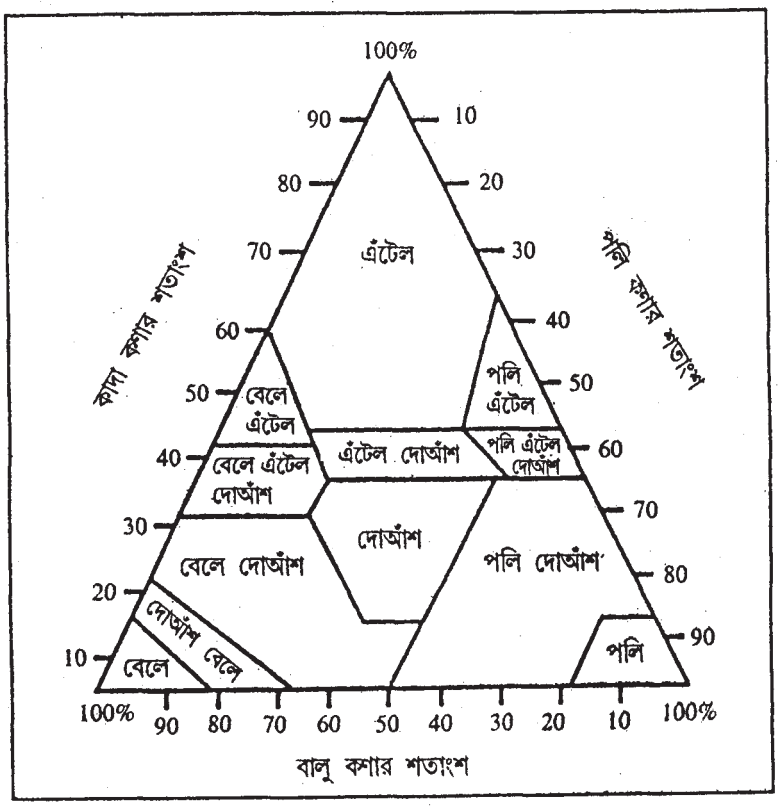

চিত্র ▶ মাটির গ্রথন নির্ণয়ের ত্রিভুজ

2.1.3 বারিমণ্ডল (Hydrosphere)

ধরাপৃষ্ঠকে তার প্রকৃতি অনুসারে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—জলভাগ ও স্থলভাগ। সমুদ্রবিজ্ঞানী Sir John Murray-র মতে পৃথিবীর মোট আয়তনের (প্রায় 51 কোটি 54 লক্ষ বর্গ কি.মি.) 71.4 শতাংশ (36.5 কোটি বর্গ কিমি) স্থান জুড়ে আছে জলভাগ, বাকি 28.6 শতাংশ হল স্থলভাগ।

অবস্থান	জলের পরিমাণ (km)	মোট জলের শতাংশ
1. সমুদ্র	1,230,000,000	97.2000
2. বায়ুমন্ডল	12,700	0.0010

অবস্থান	জলের পরিমাণ (km)	মোট জলের শতাংশ
3. নদনদী	1,200	0.0001
4. ভৌমজল (800 m পর্যন্ত)	4,000,000	0.3100
5. হ্রদ (মিষ্টি জল)	123,000	0.0090
6. তুষার ও হিমবাহ	28,600,00	2.1500
পৃথিবী পৃষ্ঠে জলবন্টনের পরিমাণ		

বিস্তৃতির বিচারে ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগ ও জলভাগের অনুপাত হল 1 : 2.431। বস্তুতপক্ষে, জলভাগের এত বিপুল ব্যাপ্তির জন্য মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখলে মনে হয় এক জলপূর্ণ গ্রহ। এই কারণে পৃথিবীকে জলগ্রহ বা watery planet বলে। এই বিশাল জলসম্পদের বণ্টনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 97 শতাংশই হল সাগর ও মহাসাগরের জল, বাকি 3 শতাংশ ভৌমজল, হিমবাহের জল। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে আরও লক্ষ্য করলে নজরে আসে যে উপসাগর, সাগর, মহাসাগর-এরা প্রত্যেকেই এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে অবস্থান করছে অর্থাৎ এরা একে অপরের সাথে যুক্ত। আরও লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার হল এই যে উত্তর গোলার্ধের চেয়ে দক্ষিণ গোলার্ধে এবং পূর্ব গোলার্ধ অপেক্ষা পশ্চিম গোলার্ধের জলভাগ বেশি। যা হোক পৃথিবীপৃষ্ঠে যাবতীয় জলভাগের সম্মিলিত ভৌগোলিক নাম হল বারিমন্ডল বা hydrosphere। এর মধ্যে পুকুর, দিঘি, খাল, বিল, নদী, হ্রদ, উপসাগর, সাগর ও মহাসাগরের জলকে ধরা হয়। বারিমন্ডলের অন্তর্গত বিশাল জলভাগকে মহাসাগর ও অপেক্ষাকৃত ছোট অংশকে সাগর বলে।

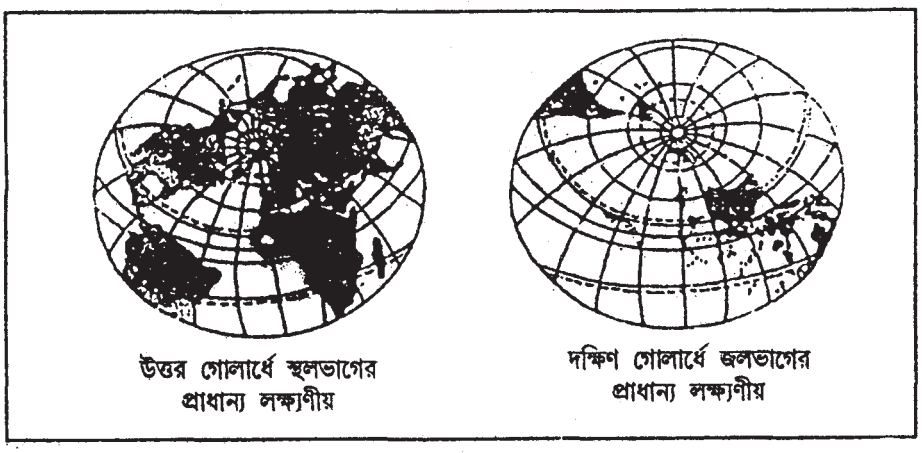

চিত্র ▸ পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগ

পৃথিবীতে অবস্থানরত মোট 5টি মহাসাগরকে তাদের আয়তন ও গভীরতার ভিত্তিতে সাজানো হল ঃ

মহাসাগর	আয়তন (কোটি বর্গ কি.মি.)	গভীরতা (মিটার)
প্রশান্ত	16.54	3,940
আটলান্টিক	8.22	3,336
ভারত	7.35	3,872
সুমেরু	1.48	1,330
কুমেরু	1.42	1,290

এক নজরে প্রধান প্রধান সাগর সমূহ

সাগর	আয়তন (বর্গ কিমি.)	গড় গভীরতা (মিটার)	সর্বোচ্চ গভীরতা (মিটারে)
দক্ষিণ চীন	29,74,600	1,464	5,514
ক্যারিবীয়	25,15,900	2,575	7,492
ভূমধ্যসাগর	25,10,000	1,501	4,846
বেরিং	22,61,100	1,491	5,121
মেক্সিকো উঃসাঃ	15,07,600	1,615	4,377
ওখটস্ক সাগর	13,92,100	973	3,475
জাপান সাগর	10,12,900	1,667	3,743
হাডসন উঃসাঃ	7,30,100	93	259
পূর্ব চীন সাগর	6,64,600	189	2,999
আন্দামান সাগর	5,64,900	1,118	

স্থানভেদে সমুদ্রের জলের তাপমাত্রার হেরফের ঘটে। তবে সমুদ্রপৃষ্ঠের জলে সাধারণত 1°C মতো দৈনিক উষ্ণতার প্রসার দেখা যায়। অক্ষাংশ, সমুদ্রস্রোতের উষ্ণতা ও শীতলতা, জলের গভীরতা, মগ্ন

হিমশৈলের অস্তিত্ব সমুদ্রের জলে উষ্ণতার তারতম্য ঘটায়। সমুদ্র জলের উষ্ণতা দক্ষিণ গোলার্ধের তুলনায় উত্তর গোলার্ধে বেশি। সর্বোচ্চ উষ্ণতা দেখা যায় ক্রান্তীয় অঞ্চলে লোহিত সাগরে। সেখানে সাগরের উপরিভাগে জলের গড় উষ্ণতা প্রায় 60°C তবে সামগ্রিকভাবে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে উষ্ণতা কমে।

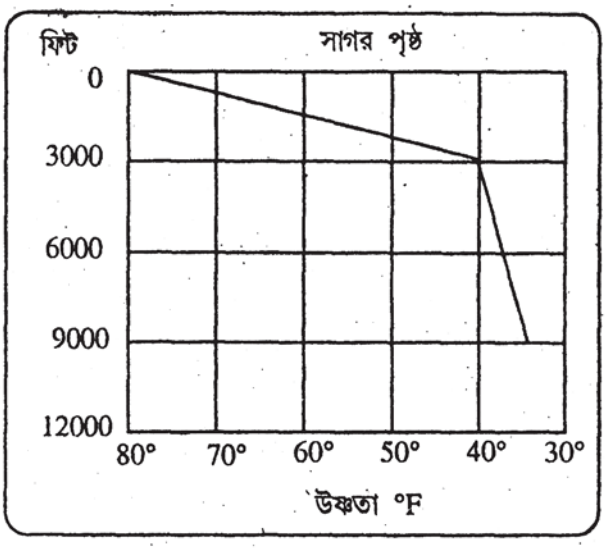

চিত্র ➧ গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে উষ্ণতা হ্রাস (°F)

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয় এবং বড় বড় নদী এসে সমুদ্রে মেশে। বায়ুর আর্দ্রতার জন্য বাষ্পীভবন নিয়ন্ত্রিত থাকে। তাই এই অঞ্চলের সমুদ্রজল বেশি লবণাক্ত হয় না ($35\%_0$)। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বাষ্পীভবন বেশি হয়। বিস্তীর্ণ মরুভূমি থাকার জন্য অনেক ক্ষেত্রে নদীবাহিত জলও পাওয়া যায় না। তাই এই অঞ্চলের সমুদ্রের জলে লবণতা বেশি হয় ($37\%_0$) আবার মেরুদেশীয় অঞ্চলে কম বাষ্পীভবন ও বরফগলা জল পাওয়ার জন্য লবণতা কম হয় ($34\%_0$)।

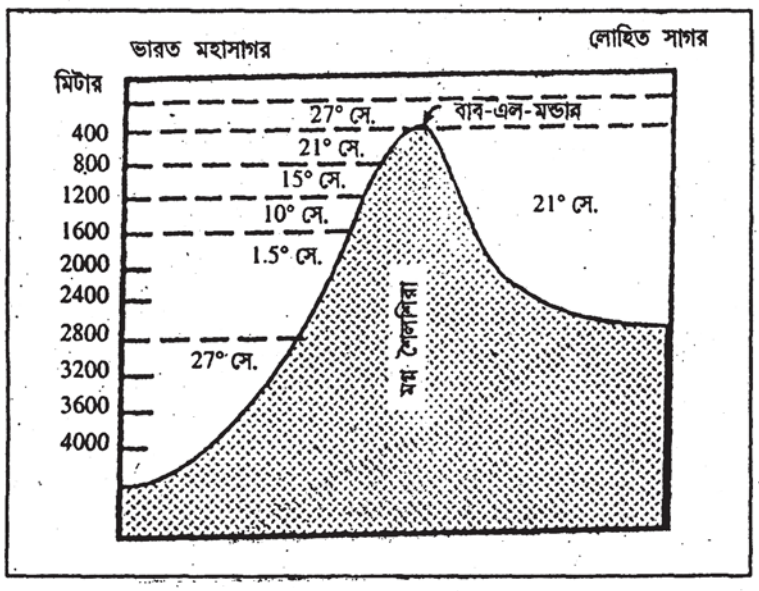

চিত্র ➧ ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের উষ্ণতার পার্থক্য

সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণের প্রভাবে সমুদ্রের জল ওঠা-নামা করে। উপকূলবর্তী মানুষের জীবনে এই জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব অপরিসীম। জোয়ারের জলকে শক্তির উৎস হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

মানুষ ভবিষ্যতে কত কী প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করতে পারবে আজকাল তার হিসেব চলছে। মহাসমুদ্রের বক্ষ থেকে খনিজ তেল আহরণের চেষ্টা অনেক জায়গায় ইতিমধ্যেই ফলপ্রসূ হয়েছে। ভারতবর্ষের বম্বে হাই খনিজ তেল উৎপাদনে ইতিমধ্যেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। তেমনি মনে করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে মহীসোপান অঞ্চলে দেশের শতকরা 20 ভাগ খনিজ তেল সঞ্চিত আছে। সমুদ্রবক্ষের কাদায় যে পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম আর তামা জমে তাতে মানুষের ব্যবহারের বর্তমান হার ধরলে প্রায় 10 লক্ষ বছর কাজ চলে যাবে। রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ফসফরাস সমস্ত সাগরের অগভীর জলে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

এ তো গেল খনিজ পদার্থের হিসেব। মানুষের খাদ্য সরবরাহের দিক থেকেও সমুদ্র ক্রমশ বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। আজকাল ভূ-তাত্ত্বিকরা মনে করেন, সমুদ্রবক্ষের প্রতি বর্গ কিলোমিটার, ভূ-ভাগের প্রতি বর্গ কিলোমিটার থেকে বেশি উৎপাদিকা শক্তি বহন করে। তবু বর্তমানে মানুষের খাদ্যের মাত্র দুই শতাংশ আসে সমুদ্র থেকে। এখনও মানুষের সঙ্গে সমুদ্রের সম্পর্ক মূলত শিকার আর শিকারীর চেয়ে বেশি কিছু নয়। সমুদ্রের ঝিনুক, মাছ-এ সবই আমরা শিকারীর মতো সংগ্রহ করি। সমুদ্রবক্ষকে উৎপাদনের কাজে লাগানো এখনও স্বপ্ন রয়ে গেছে।

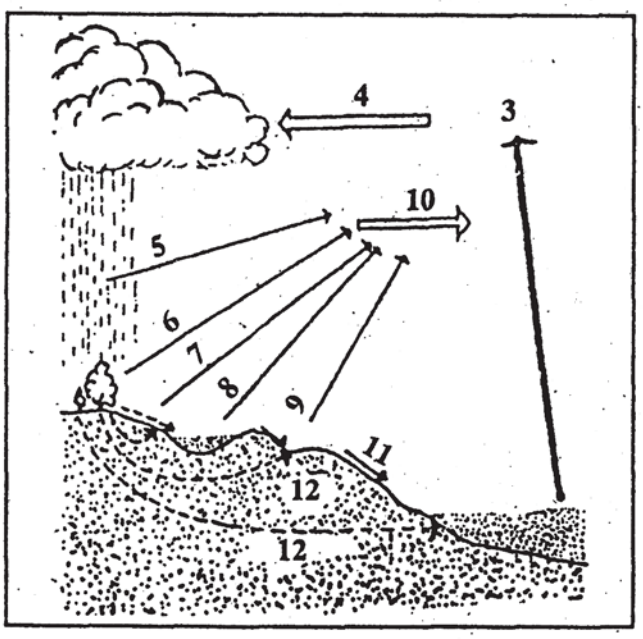

চিত্র ● জলের চক্রবৎ গতিবিধি (hydrological cycle)।

2.1.3.1 জলচক্র

সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট জলের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনি। জল শুধুই চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়। বাষ্পীভবনের ফলে বারিমণ্ডল থেকে জল যায় বায়ুমণ্ডলে।

সমুদ্র থেকে উত্থিত বাষ্প নানা পথ বেয়ে মহাদেশ ভ্রমণ করে আবার সমুদ্রেই ফিরে আসে। ঘনীভবনের ফলে আকাশে মেঘ জমে হিম, বৃষ্টি বা তুষারের আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে। 3. সমুদ্র থেকে বাষ্পীভবন 4. মহাদেশের দিকে ধাবিত আর্দ্র হাওয়া 5. বৃষ্টিপাতের সময়

বাষ্পীভবন 6. উদ্ভিজ্জ থেকে নিঃসরণ ও বাষ্পীভবন 7. মাটি থেকে বাষ্পীভবন 8. জলাশয় থেকে বাষ্পীভবন 9. নদী থেকে বাষ্পীভবন 10. সমুদ্রে প্রত্যাবর্তন 11. প্রবাহিত জল 12. নদী, হ্রদ ও সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত ভৌমজল আবার বৃষ্টি বা তুষার বা শিশির হয়ে নেমে আসে স্থল ও বারিমন্ডলে। পর্বতের শিখরে জমে থাকা তুষার হিমরেখার নিচে নেমে এলে জলে পরিণত হয়। নদীবাহিত সেই জল আবার সমুদ্রে মেশে। জলমন্ডলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে জলের এই পরিক্রমার পথে স্থলমন্ডলে যেখানে যেটুকু জল পাওয়া যায়, তাই হয়ে উঠে উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্বের আশ্বাস।

2.1.4 বায়ুমন্ডল

বায়ুমণ্ডল হল কয়েকটি গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত এক অদৃশ্যমন্ডল যা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে (The layer of gases enveloping the earth is called atmosphere)। সমুদ্রতল থেকে প্রায় 10,000 কি.মি. উঁচু পর্যন্ত গ্যাসীয়মন্ডল বিস্তৃত রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যত উঁচুতে ওঠা যায়, ততই গ্যাসীয়মন্ডল হাল্কা হয়ে যায়। আরও মজার কথা হল এই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে এই গ্যাসীয়মন্ডল পৃথিবীর গায়ে লেগে আছে ও পৃথিবীর সাথে অনবরত আবর্তন করে চলেছে। তাই বায়ুমন্ডলকে পৃথিবীর অংশ হিসেবে ধরা হয় ও বলা হয় যে বায়ুমন্ডলই হল পৃথিবীর সর্বশেষ সীমানা। এর পরেই রয়েছে মহাকাশ।

যদিও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 10,000 কিমি. পর্যন্ত উঁচু আকাশকে বায়ুমন্ডল ধরা হয়, তবুও দেখা যায় যে বায়ুমন্ডলের শতকরা 97 ভাগ পদার্থ সমুদ্রতল থেকে 30 কি.মি. অংশের মধ্যে অবস্থান করে।

2.1.4.1. বায়ুমন্ডলের উপাদান

বিভিন্ন গ্যাস ও বাষ্পের মিলনে বায়ুমন্ডল গঠিত হয়েছে, যাদেরকে আমরা বলি বায়ুর উপাদান। বায়ুমন্ডলের তিনটি উপাদান আছে—গ্যাসীয় উপাদান, জলীয় বাষ্প ও ধুলিকণা।

বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন প্রধান। এরা বায়ুমন্ডলের শতকরা 99 ভাগ স্থান দখল করে রেখেছে। বাকি 1 ভাগের মধ্যে আছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন, ওজোন, আর্গন, হিলিয়াম, জেনন, মিথেনের মতো কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 90 কি.মি. পর্যন্ত বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত প্রায় একই রকম থাকে। বায়ুমন্ডলের এই স্তরকে হোমোস্ফিয়ার (homosphere) বা সমমন্ডল বলে। এর ওপরের অংশে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত একই রকম থাকে না। আবার বায়ুমন্ডলের স্তরগুলোও সমদূরত্বে অবস্থান করে না। এইজন্য এই স্তরকে হেটেরোস্ফিয়ার (heterosphere) বা বিষমমন্ডল বলে।

বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ			
গ্যাস	প্রতীক	আয়তন %	ওজন
নাইট্রোজেন	N_2	78.09	75.54
অক্সিজেন	O_2	20.95	23.14
আর্গন	A	0.93	01.27
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	CO_2	00.03	00.05
মোট		100.00	100.00

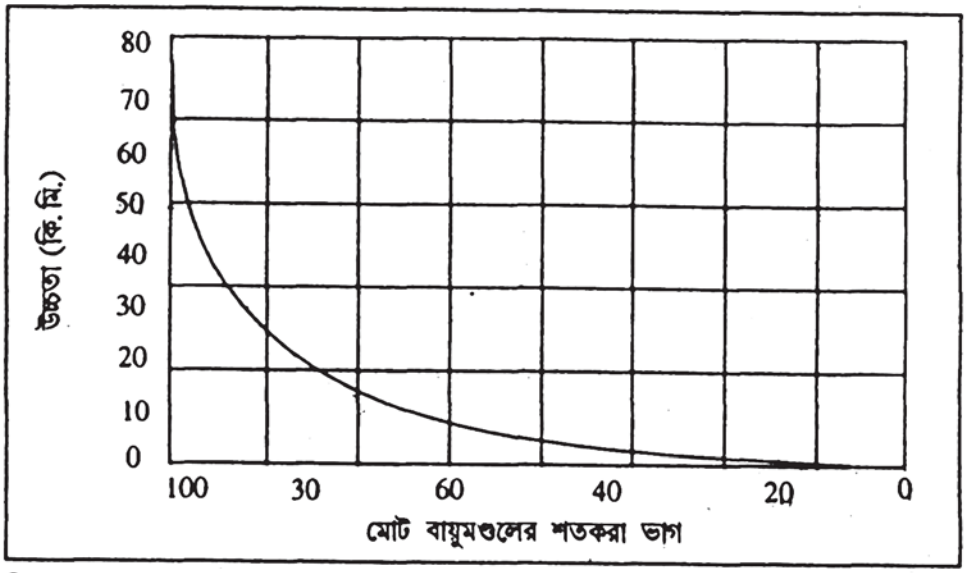

চিত্র ১ বায়ুমন্ডলের উল্লম্ব বন্টন। ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমন্ডলের বেশির ভাগ অংশ বিরাজ করে।

2.1.4.2 বায়ুমন্ডলের স্তরবিন্যাস

নিচের তালিকায় বায়ুমন্ডলের উপাদানগত পার্থক্য ও উষ্ণতার পরিবর্তন অনুসারে ভাগগুলো দেখানো হল :

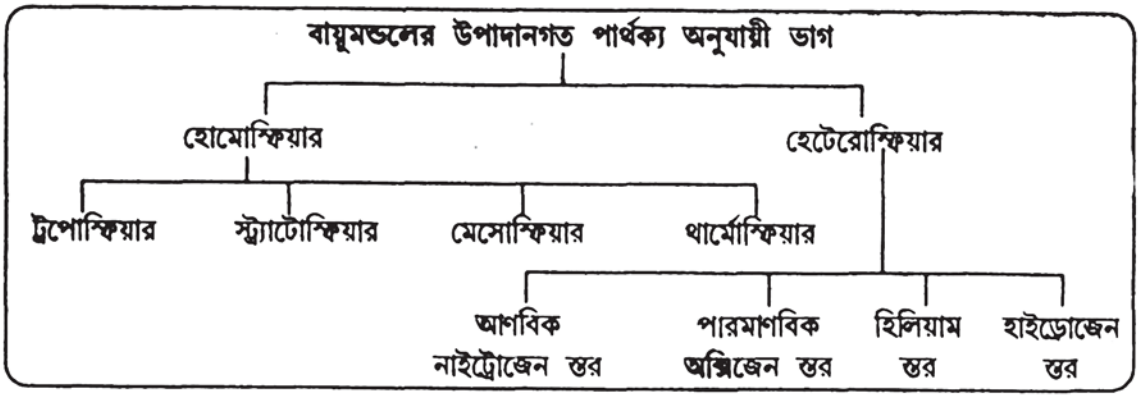

2.1.4.3 উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে ভাগ

বায়ুমন্ডলের কোন স্তরে উষ্ণতা বাড়ে, আবার কোন স্তরে উষ্ণতা কমে। উষ্ণতার এই হ্রাস-বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে আবহবিদ্‌রা বায়ুমন্ডলকে ছ'টি ভাগে ভাগ করেছেন : ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার ও ম্যাগনেটোস্ফিয়ার।

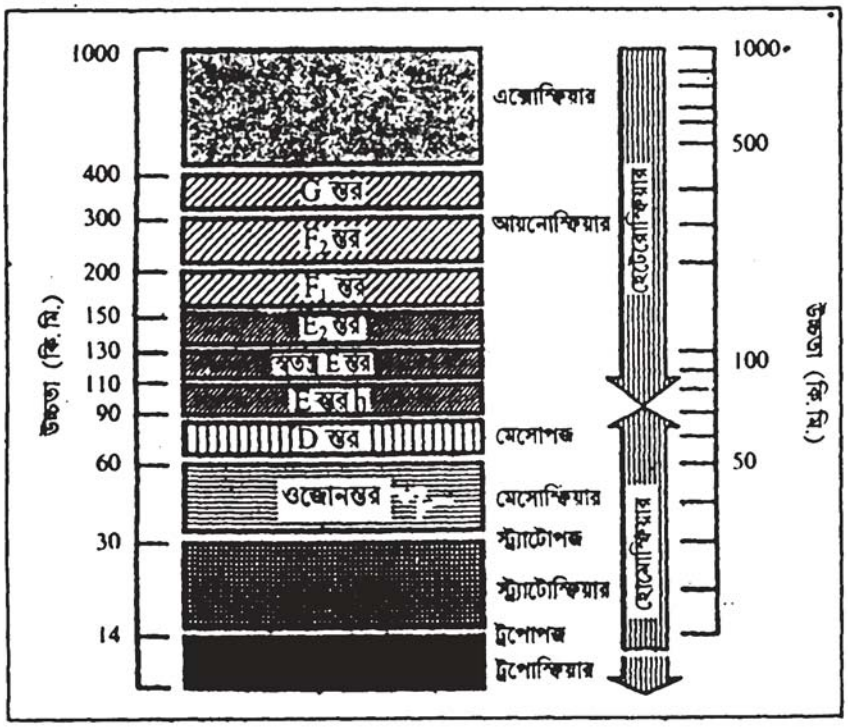

চিত্র ▸ বায়ুমন্ডলের উল্লম্ব স্তরবিন্যাস [উল্লম্ব লগ (log) স্কেল]

ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere) : বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন এই স্তরটির বিস্তৃতি অক্ষাংশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলে এই স্তরটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 17 কি.মি. এবং মেরু অঞ্চলে 8 কি.মি. পর্যন্ত উঁচু অবস্থান করে। এই স্তরে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে নির্দিষ্ট হারে উষ্ণতা ক্রমশ কমতে থাকে (throughout this layer there is a general decrease of temperature with height)। এই হারটি হল প্রতি 1,000 মিটার (1 কি.মি.) উচ্চতায় 6.5 সে. (বা প্রতি 1,000 ফুট উচ্চতায় 3.5 ফা.) করে উত্তাপ কমে যায় যাকে আমরা উষ্ণতা হ্রাসের স্বাভাবিক হার বলি। ট্রপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বসীমাকে

---

* ট্রপোস্ফিয়ার ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যবর্তী এই স্তরটিকে স্তব্ধস্তর বলার হেতু এই যে ট্রাপোপজ স্তরের অবস্থানের দরুন ট্রপোস্ফিয়ার ও স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মধ্যে বায়ু চলাচল করতে পারে না বা তাপীয় মিশ্রণ ঘটে না।

ট্রপোপজ বা স্তব্ধস্তর বলে। গ্রীক শব্দ ট্রপোস্ কথাটির মানে হল পরিবর্তন। আবহাওয়ার সবরকম পরিবর্তন এই স্তরেই দেখা যায় (it is the zone where weather phenomena and atmospheric turbulence are most marked)। যেহেতু এই স্তরে বায়ুমন্ডলের অধিকাংশ জলীয় বাষ্প থাকে তাই মেঘ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, বজ্র-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এই স্তরেই সংঘটিত হয়।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) ঃ ট্রপোস্ফিয়ারের ওপরে অবস্থিত এই বায়ুস্তরটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 17 কি.মি.-এর পর থেকে প্রায় 50 কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বায়ুস্তরে জলীয় বাষ্প নেই, কিন্তু সূক্ষ্ম ধূলিকণা রয়েছে। মেঘ বা ঝড়-বৃষ্টি এখানে দেখা যায় না। নিশ্চল এই বায়ুস্তরকে শান্তমন্ডল বলা হয়ে থাকে। মেঘ ও ঝড়-বৃষ্টি এড়াতে বিমান স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে দিয়ে চলাচল করে।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বায়ুস্তর নিরক্ষীয় অঞ্চলে সবচেয়ে পাতলা, আবার মেরু অঞ্চলে সর্বাধিক পুরু। এই বায়ুস্তরের অন্যতম উপাদান হল ওজোন (ozone)। এটি সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে নিয়ে পৃথিবীর প্রাণীজগতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 20-25 কি.মি. উচ্চতার মধ্যে ওজোন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়। এই কারণে এই স্তরকে ওজোনোস্ফিয়ারও বলে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বায়ুস্তরের ঊর্ধ্বসীমাকে স্ট্র্যাটোপজ (Stratopause) বলে। এখানে বায়ুর উত্তাপ বাড়তে বাড়তে 0° সে. (32° ফা) হয়।

মেসোস্ফিয়ার (Mesosphere) ঃ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওপরে (স্ট্র্যাটোপজের পর) বায়ুস্তরটি হল মেসোস্ফিয়ার। এটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 50-80 কি.মি. উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। ট্রপোস্ফিয়ারের মতো এই বায়ুস্তরেও উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে উষ্ণতা কমতে থাকে ও মেসোপজ (মেসোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বসীমা)-এ এসে প্রায় -100° সে হয়।

থার্মোস্ফিয়ার (Thermosphere) ঃ মেসোস্ফিয়ারের ওপরে রয়েছে থার্মোস্ফিয়ার। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 80-480 কি.মি. উচ্চতায় এই স্তরটি অবস্থিত। বায়ুস্তরের এই অংশে উষ্ণতা খুব দ্রুতহারে বাড়ে। 200 কি.মি. উচ্চতায় 700° সে. এবং 48 কি.মি. উচ্চতায় প্রায় 2,000° সে. হয়। এই কারণে এই স্তরটিকে থার্মোস্ফিয়ার (Thermo = উষ্ণতা, Sphere = মন্ডল) বলে।

থার্মোস্ফিয়ারের নিচের অংশটির নাম **আয়নোস্ফিয়ার (Asthenosphere)**। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 100-300 কি.মি. উচ্চতায় এই স্তরটি অবস্থিত। এখানে আয়নের পজিটিভ (ধনাত্মক) ও নেগেটিভ (ঋণাত্মক) প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি (অতিবেগুনি, রঞ্জন ও মহাজাগতিক) দ্বারা তড়িদাহত হয়ে বায়ুকণা থেকে ইলেকট্রন খসে যায়। সেজন্য বেতার তরঙ্গ এই স্তরে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। আবার তড়িদাহত অণুর চৌম্বক বিক্ষেপে দুই

মেরু অঞ্চলে মৃদু আলোকপ্রভার সৃষ্টি হয়। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে দৃশ্যমান এই মেরুজ্যোতিকে যথাক্রমে সুমেরুপ্রভা (Aurora Borealis) কুমেরুপ্রভা (Aurora Australis) বলে।

এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere) : এটি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের একেবারে বাইরের (Ex) স্তর। এই বায়ুস্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য রয়েছে।

ম্যাগনেটোস্ফিয়ার (Magnetosphere) : এক্সোস্ফিয়ারের বাইরে পৃথিবীর বায়ুস্তরকে বেষ্টন করে আছে এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি। এই স্তরে রয়েছে ইলেকট্রন ও প্রোটন।

পৃথিবীতে সূর্যই তাপ ও আলোর উৎস। এর উত্তাপে ধরাপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। সূর্যপৃষ্ঠের উষ্ণতা 6000° সে। সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত উত্তাপ ও আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 3 লক্ষ কি.মি. বেগে এই উত্তাপ ও আলোকরশ্মি পৃথিবীতে ছুটে আসছে। কিন্তু সৌরকিরণের অতি সামান্য অংশই পৃথিবীতে এসে পৌছোয়। এর পরিমাণ হল 220 কোটি ভাগের 1 ভাগ।

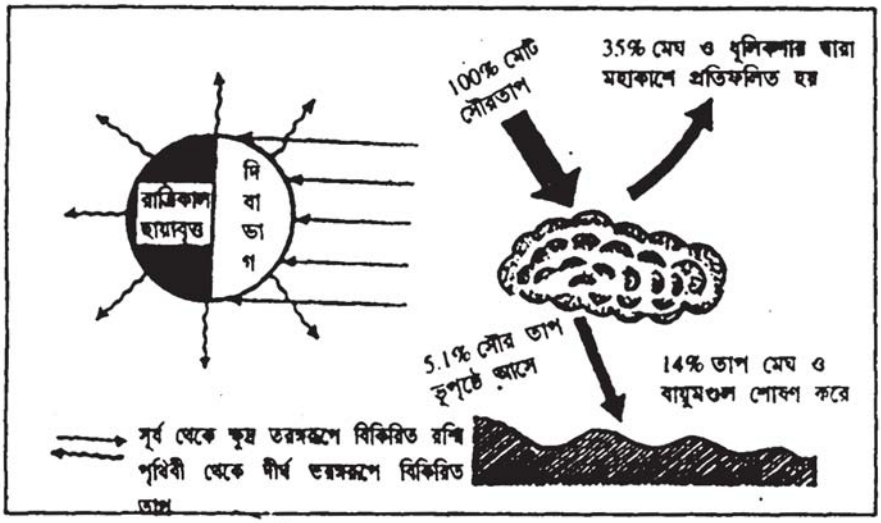

চিত্র ▸ পৃথিবীর তাপসমতা

কবির ভাষায় : জ্যোতিষীরা বলে,

সবিতার আত্মদানযজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দিরমন্ডপে,
অতিতুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের পরে। ('কেন'-রবীন্দ্রনাথ)

হিসেব করে দেখা গেছে যে সূর্যরশ্মির তাপীয় ফলের শতকরা 34 ভাগ বায়ুমন্ডলে অবস্থিত মেঘ, ধূলিকণা, ধোঁয়া ইত্যাদিতে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে প্রকান্ড তরঙ্গরূপে মহাকাশে আবার ফিরে যায়।

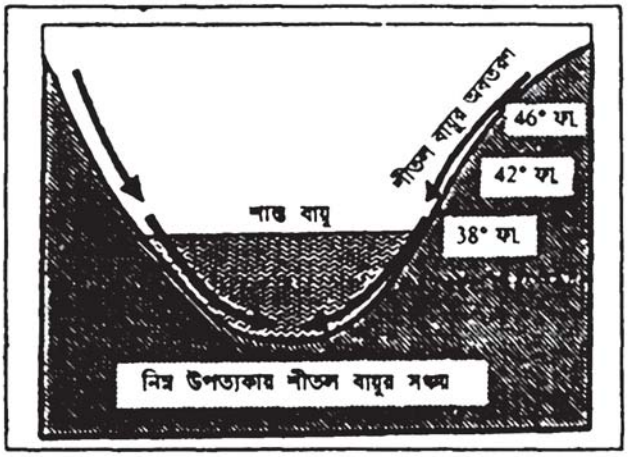

চিত্র ♦ শীতল রাতে নিম্ন উপত্যকায় বিপরীত উত্তাপ
(আল্পসীয় উপত্যকায় বসন্তকাল)

এই 34 ভাগ সূর্যরশ্মির 2 ভাগ ভূ-পৃষ্ঠ, 7 ভাগ বায়ুমন্ডল ও 25 ভাগ মেঘপুঞ্জ থেকে বিচ্ছুরিত ও প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে ফিরে যায়। ফলে এটি ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করতে পারে না। একে পৃথিবীর অ্যালবেডো (Albedo) বলে।

সূর্যরশ্মির তাপীয় ফল ছাড়াও পৃথিবীর অক্ষাংশ, ভূ-পৃষ্ঠে জলভাগ ও স্থলভাগের বিস্তার, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, ভূ-প্রকৃতি, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে বায়ুমন্ডলে তাপের তারতম্য ঘটে। তাই বায়ুমন্ডলে তাপের দু'ধরনের বন্টন লক্ষ্য করা যায় : উল্লম্ব (vertical) ও অনুভূমিক (horizontal)। আমরা জেনেছি যে ট্রপোস্ফিয়ারে প্রতি এক কিলোমিটার উচ্চতায়

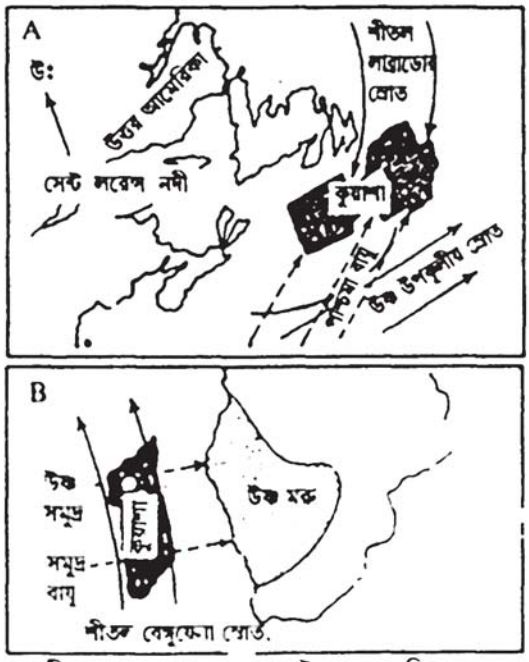

চিত্র ♦ উপকূল অঞ্চলে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের প্রভাব (A) উত্তর আমেরিকা ও (B) দঃ আফ্রিকা। উভয় ক্ষেত্রে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনে কুয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

6.5°C হারে তাপমাত্রা কমে যাকে তাপহ্রাসের স্বাভাবিক হার বলে। আবার অনেক সময় রাতে তাপ বিকিরণের ফলে বাতাস খুব শীতল ও ভারী হয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপত্যকার নিচের দিকে নেমে আসে। ফলে উপত্যকার নিচের দিকের তাপমাত্রা উচ্চতর পাহাড়ের তাপমাত্রার চেয়ে অনেক কম থাকে। একে তাপমাত্রার বৈপরীত্য (inversion of temperature) বলে।

বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রার অনুভূমিক বন্টন লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে উষ্ণতা ক্রমশ হ্রাস পায়। পৃথিবীকে তাই কয়েকটি তাপমন্ডলে বিভক্ত করা হয়। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার (23°30′ উত্তর ও দক্ষিণ) মধ্যবর্তী অঞ্চল সারা বছর কিছু কম-বেশি লম্বভাবে সূর্যকিরণ পায় বলে এই অঞ্চলকে বলে উষ্ণমন্ডল। কর্কট ও মকরক্রান্তি রেখার (23°30′ উত্তর ও দক্ষিণ) থেকে দুই মেরুবৃত্ত (66°30′ উত্তর ও দক্ষিণ) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পৌঁছোয় বলে এই অঞ্চলকে বলে নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল। মেরুবৃত্ত থেকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দু পর্যন্ত প্রসারিত অঞ্চল সূর্যের উত্তাপ সবচেয়ে কম পায়। তাই এই অঞ্চলকে বলা হয় হিমমন্ডল। এই তিনটি তাপবলয়ের দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য ও শীত-গ্রীষ্মের তীব্রতার হেরফের ঘটে।

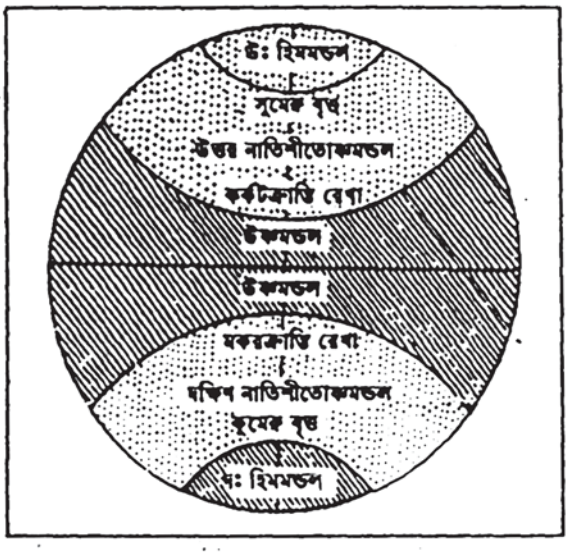

চিত্র ১ তাপবলয়

বায়ুমন্ডলে বাতাসের চাপেরও উল্লম্ব ও অনুভূমিক বন্টনে বিভিন্নতা দেখা যায়। উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বায়ুর চাপ হ্রাস পায়। আবার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও বায়ু চাপ কমে। উষ্ণতা কমলে বায়ুর চাপ আবার বাড়ে। চাপ ও তাপের মধ্যে তাই বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে। দুটি স্থানের মধ্যে বায়ুর চাপের এই পার্থক্যের ফলে বায়ুর চাপের ঢাল (pressure gradient) তৈরি হয় যার প্রভাবে উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপ

অঞ্চলের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। পৃথিবীকে তাই সাতটি বায়ুচাপ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়, ক্রান্তিয় দুটি উচ্চচাপ বলয়, মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় দুটি নিম্নচাপ বলয় এবং দুটি মেরুদেশীয় উচ্চচাপ বলয়। স্বভাবতই উচ্চচাপ বলয় থেকে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে সারা বছর বায়ুর প্রবাহিত হয়।

বাতাসে ভাসমান জলীয় বাষ্প স্থান, কাল ও ঋতুভেদে শিশির, কুয়াশা, তুহিন ইত্যাদি সৃষ্টি করে। আকাশে বিভিন্ন উচ্চতায় নানা ধরনের মেঘপুঞ্জ ভেসে বেড়ায়। তার কোনটিতে বৃষ্টি হয় আবার কোনটিতে হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ওপর স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য, কৃষিজ ফসলের বৈচিত্র্য ও উৎপাদন নির্ভরশীল। সামগ্রিকভাবে তাই সমস্ত জীবজগৎ বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উপাদানের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

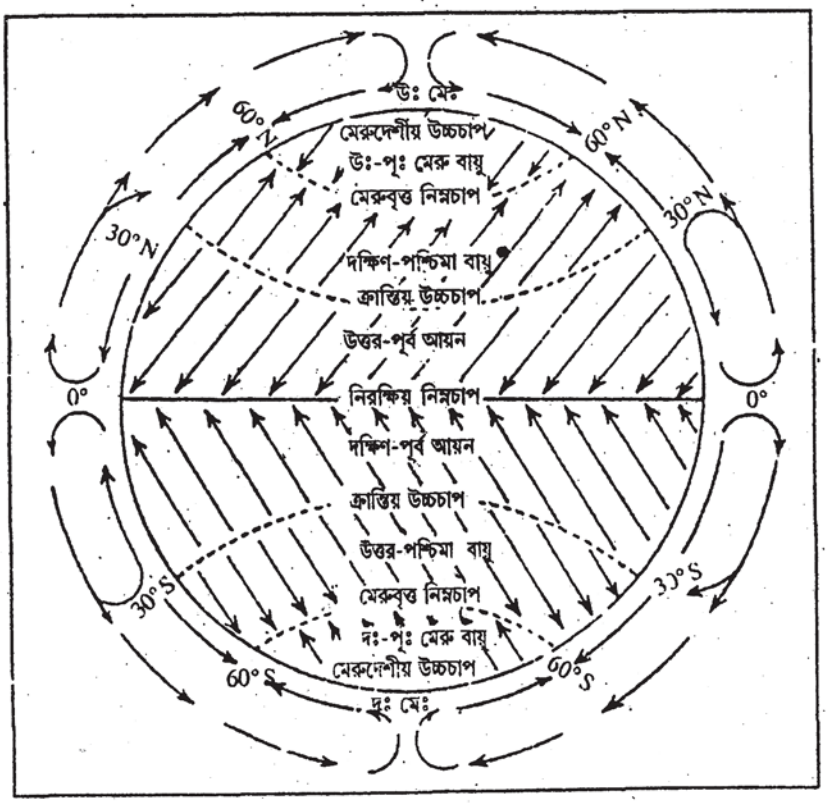

চিত্র ♦ পৃথিবীর বায়ুচাপ বলয় ও বায়ুপ্রবাহ

2.2 আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপাদানসমূহ (Components of Socio-economic environment)

ব্যাপক-অর্থে আর্থ সামাজিক পরিবেশ বলতে সেই ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, নিয়মকানুন বা রীতিনীতিকে বোঝায় যা ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের বিকাশ, বৃদ্ধি ও ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করে। এই অর্থে মানবজীবনের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিষয়গুলিও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। আমরা এখানে আর্থ-সামাজিক পরিবেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিয়ে আলোচনা করব।

2.2.1 আশ্রয় ও নিরাপত্তা (Shelter and Security)

"ধন নয়, মান নয়,
এতটুকু বাসা করেছিনু আশা"

আশ্রয় বা বাসগৃহের আশা শুধু কবির কথা নয়, সব মানুষের সবকালের আকাঙ্খা। আশ্রয়ের সমস্যা তৃতীয় বিশ্বের শেগুলির এক নিদারুণ সমস্যা।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বাসস্থানের সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গ্রামের মানুষকে শহরাভিমুখী করেছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, কখনো জীবিকার সন্ধানে, কখনো শহরের বিলাসবহুল জীবনের লোভে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে চলে আসছে। অমানুষিক পরিশ্রম করে কিংবা যে কোনও জীবিকা আশ্রয় করে এরা শহরে বছরের পর বছর থেকে যায়। যেটুকু রোজগার করে, তা গ্রামাঞ্চলে থাকলে সম্ভব হত না। তাই তারা শহর আঁকড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু শহরে মানুষের ঢল নামলেও বাসগৃহের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়েনি। তাই ছিন্নমূল মানুষ আশ্রয় খোঁজে ঝুপড়িতে, বস্তিতে, রাস্তার ফুটপাতে, রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, গাড়ি বারান্দায়, এমনকি ফেলে রাখা বড় বড় পাইপের মধ্যে। আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরমুখী যে স্রোত চলে আসছে, তার ধাক্কায় জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঝুপড়ি বস্তিতে ভরে যাচ্ছে কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লীর মতো মহানগরী। বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কোরিয়ার কলকাতার উন্নয়ন প্রশ্নে বলেছিলেন যে, এসব মানুষের জীবিকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে না পারলে শহরকে সুন্দর করে তোলা যাবে না। অবশ্য এই সমস্যা বিকাশশীল দেশেরই একচেটিয়া সমস্যা এই রকম মনে করার কারণ নেই। আন্তর্জাতিক আশ্রয় বর্ষের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আধুনিক সভ্যতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু মানুষের মাথার ওপর ছাদ নেই। কানাডাতেও কয়েক হাজার মানুষ ফুটপাতে বাস করে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই সমস্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

নিরাপত্তা প্রশ্নটিকে আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক হবে না (নিরাপত্তা বিষয়টি অবশ্য অনেক

বিস্তৃত। যেমন সামাজিক নিরাপত্তা, মহিলাদের নিরাপত্তা, চাকুরির নিরাপত্তা, অবসরের পর অবসরোত্তর আর্থিক নিরাপত্তা। তবে আমরা এখানে আশ্রয়জনিত নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করব)। সভ্যতার উষা-লগ্ন থেকেই মানুষ নিরাপত্তার প্রশ্নটি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে। বুনো জন্তু জানোয়ার ও হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ বহু প্রাচীনকাল থেকেই দলবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। Hudson *(A Geography of Settlements)*-র ভাষায় "Man is a gregarious animal and to achieve very close contiguity may..... prefer to inhabit a large communal dwelling". অতীতে দেখা গেছে যে যুদ্ধ বিগ্রহের সময় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে কৃষকরা একত্রিত হয়ে গ্রামে বসবাস করতে বাধ্য হত। কিন্তু যখন নিরাপত্তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত, তখন তারা গ্রাম ছেড়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত জমিতে গিয়ে বসবাস করত।

উপযুক্ত আশ্রয় ও নিরাপত্তার অভাবে মনুষ্য জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই মানুষের কাছে নিরাপত্তাবিহীন জীবন কাম্য নয়। এজন্য সমাজবদ্ধ মানুষ তাদের জীবনকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে ফেলল। উপরন্তু বুনো পরিবেশে যে সব আদিম মানুষ বাস করত তারাও একত্রিত হয়ে জীব-জন্তু বা প্রকৃতির মোকাবিলা করত। নৃতাত্ত্বিকরা দেখেছেন যে বহু আপদ-বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে গিয়ে আদিম মানুষ জাদু ও ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। এই ধরনের কাণ্ডকারখানা তাদের অতিন্দ্রিয় আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করত বলে তারা বিশ্বাস করত। সভ্য মানুষ জাদু ও ধর্মের বদলে নানা ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে যা তাদের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করেছে। যেমন, রাষ্ট্র, আইন, নির্বাচন পদ্ধতি, বিচার-ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, প্রশাসন ইত্যাদি ব্যাপারগুলো যা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রণালীবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য আজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। একইভাবে ক্রমবর্ধমান জনগণের বাসস্থানের দাবি মেটাতে গিয়ে গড়ে উঠেছে শহর ও নগরের বহুতল বিশিষ্ট-বাড়ি, আর তার আশেপাশে বস্তির সমারোহ। নানা প্রকার প্রাথমিক (যেমন পরিবার, আত্মীয় বা বন্ধুগোষ্ঠী) ও গৌণগোষ্ঠীর (যেমন, সংঘ, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান) সমাবেশ আমাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার সমস্যা কিছুটা সমাধান করে চলেছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপও আমাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে চলেছে।

2.2.2 আয় (Income)

মানুষের জীবন ধারনের জন্য নূন্যতম প্রয়োজন হল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান আর তা মেটাতে গেলে চাই আয়। আয়ের ধারণাটি অবশ্য আধুনিক। বিনিময়মূলক অর্থনীতিতে (exchange economy) মানুষ তার উৎপাদিত বস্তুর আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারত। কিন্তু মুদ্রা প্রচলনের পর থেকে বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার সূচনা হয় আর সেগুলি হয়ে ওঠে আয়ের প্রধান উৎস।

আয়ের ধারণার সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মুনাফা, ভোগবাদ, সংস্কৃতি ও মর্যাদা যুক্ত থাকে। যেমন, বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদাগত পার্থক্য আয়ের পরিমাণ দ্বারা বহুক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয়। যেমন অধ্যাপক, ডাক্তার, উচ্চপদস্থ আমলাদের সামাজিক মর্যাদা অনেক উপরে। যদিও তাত্ত্বিক দিক দিয়ে আয় ও মর্যাদার মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট সম্পর্ক নেই, তবুও উন্নত জীবনযাপন, শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি অধিক আয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। নিম্ন বিত্তরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই অধিক মুনাফালাভের জন্য তারা পরিবেশকে মাত্রাতিরিক্তভাবে ব্যবহার করছে ও বিপদ ডেকে আনছে। যেমন অরণ্য ছেদন বা পরিত্যক্ত খনি থেকে কয়লা সংগ্রহ। তাই আয় হল আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশের এমন এক উপাদান যা মানব জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করে।

2.2.3 শিক্ষা ও সামাজিক স্থিরতা (Education & Social Stability)

মানব সমাজের একটি মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া হল শিক্ষা। শিক্ষা বলতে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে বড় করে তোলা বা সাফল্যের সঙ্গে তাকে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তার মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে তোলা *"According to Aristotle, to educate meant to develop man's faculties, especially his mind so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, beauty and goodness"* (Vidya Bhusan & Sachdeva)। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato)-র মতানুসারে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল জ্ঞানার্জন। দার্শনিক রাসেল (Bertrand Russel)-র মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের সৎ-চরিত্র গঠন করা। স্পেনসার (Herbert Spencer)-এর মতানুসারে, শিক্ষার লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ জীবনের সামগ্রিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব কিছু করার জন্য যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলা। ভারতীয় দার্শনিক অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর (University Education Commission)-র প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছেন, "The purpose of all education, it is admitted by thinkers of East and West, is to provide a coherent picture of the universe and integrated way of life", সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, শিক্ষা আয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা না থাকলে আমোদ-প্রমোদ, গণতান্ত্রিক অধিকার, উপার্জন ইত্যাদি সব কিছুরই দরজা বন্ধ। তাই তাদের জীবনকুশলতার পরিমাণ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হল সামাজিকীকরণ কি? উত্তর হল এটি একটি অবিধিবদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতের সাথে পরিচয় করানো হয় এবং বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীর একজন অংশগ্রহণকারী সভ্যরূপে গড়ে তোলা হয়। পরিবার, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-গোষ্ঠী, গণমাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই ধরনের শিক্ষার সহায়ক। শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ হল এক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। অবশ্য এটা ঠিক বিধিবদ্ধ শিক্ষা একটি স্তর পর্যন্ত চলে। সংস্কৃতির সঞ্চালক ও

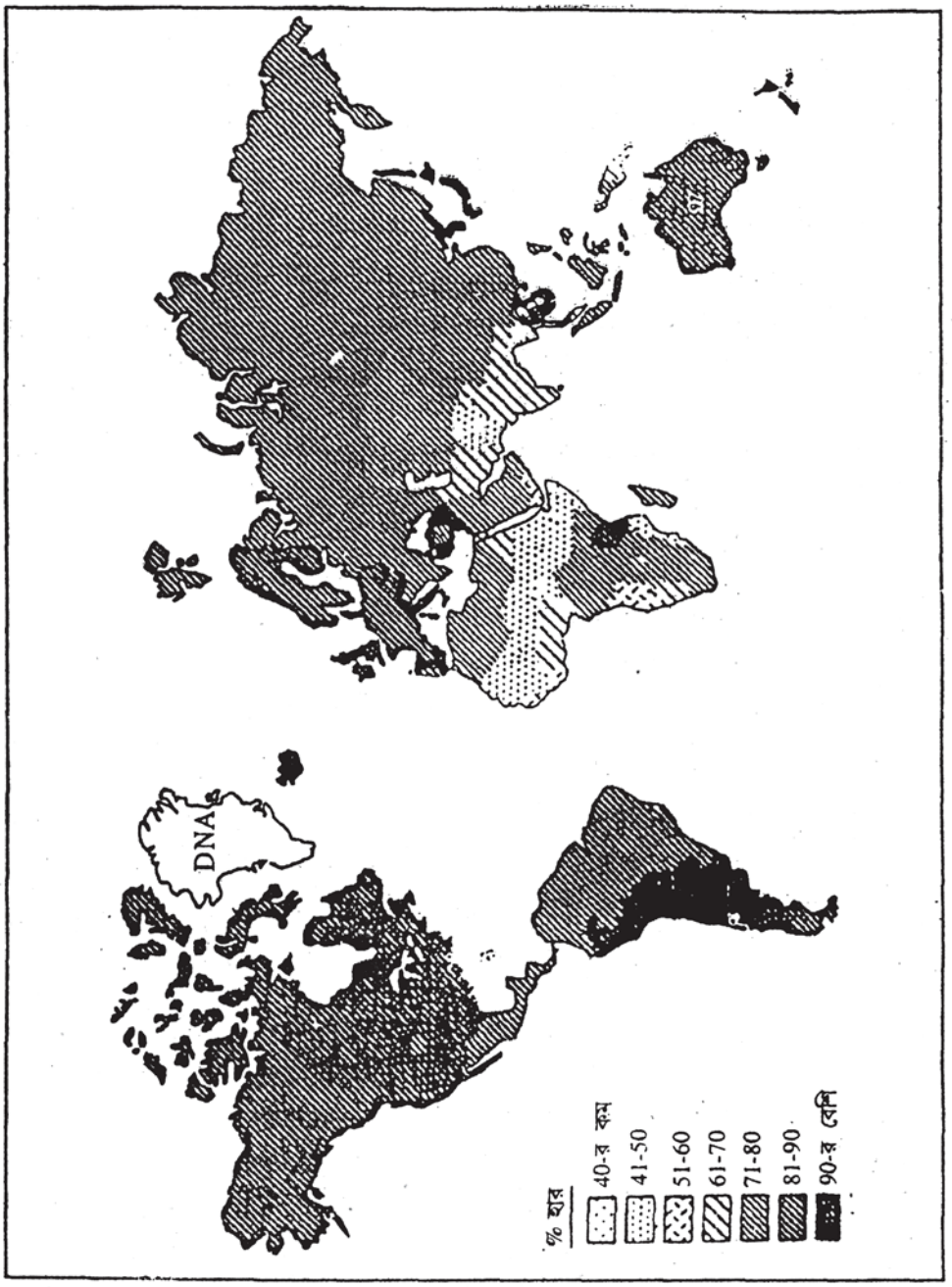

চিত্র I.2.1 ♦ পৃথিবী ঃ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সাক্ষরতার হার (%), 1995 *(Majid Hussain : Human Geography অবলম্বনে)*

ব্যক্তিত্বের বিকাশকারী হিসাবে এই দুইধরনের শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে যার প্রয়োজনীয়তা সমাজবিজ্ঞানীরা অনুভব করে এসেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবসভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডার এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে

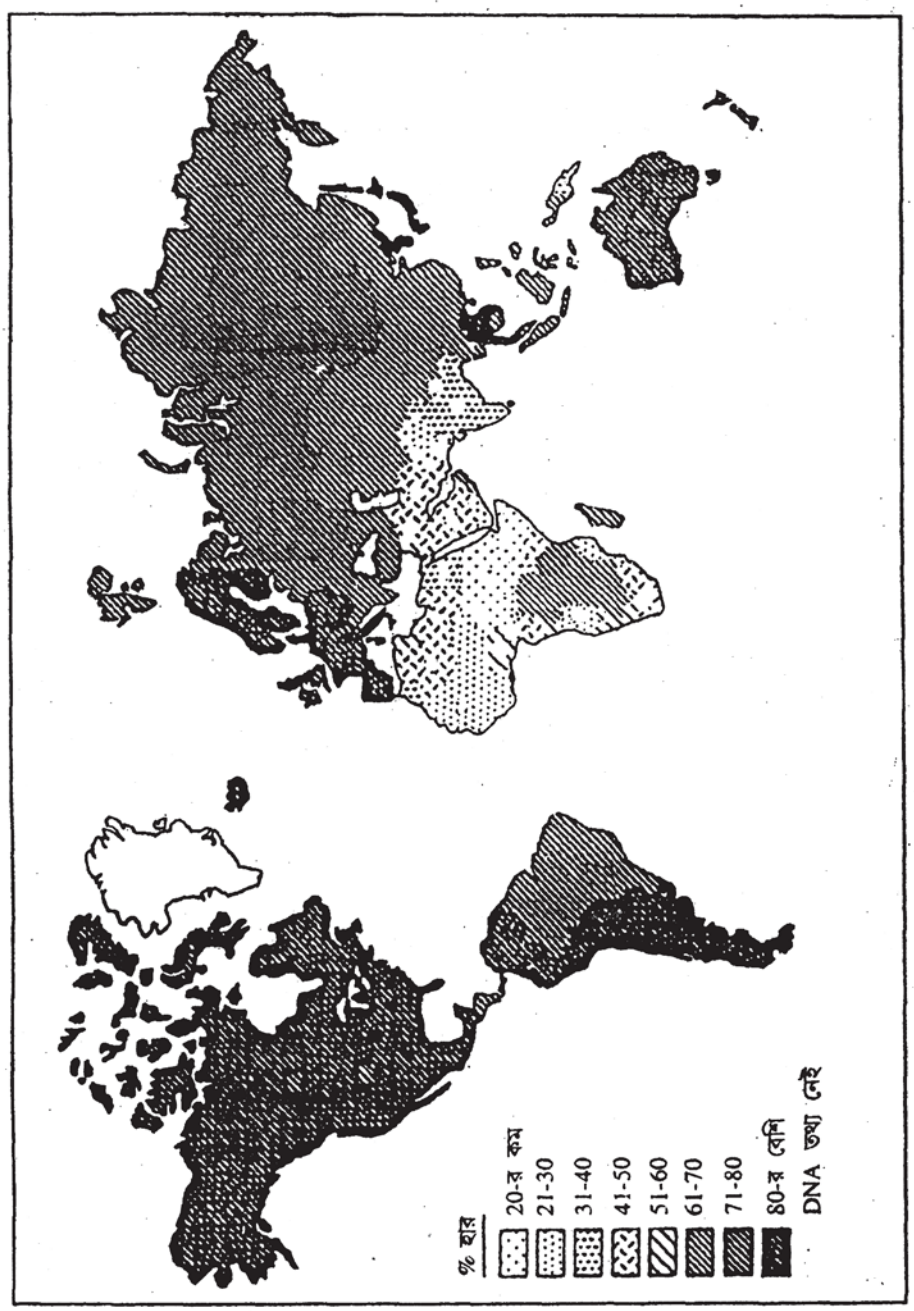

চিত্র I.2.2 ▸ পৃথিবী : প্রাপ্তবয়স্ক নারী সাক্ষরতার হার (%), 1995 *(সূত্র : পূর্ববৎ)*

স্থানান্তরিত হয়। শিক্ষা তাই আমাদের অতীত ও বর্তমানের সাথে পরিচয় ঘটায় এবং ভবিষ্যতের পন্থা নির্দেশ করে। এই প্রকার ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সামাজিক স্থিরতা বজায় রাখে। সামাজিক

স্থিরতা বলতে আমরা এখানে সামাজিক অবক্ষয় ও ধ্বংস থেকে সমাজকে মুক্ত ও সুরক্ষিত রাখার প্রয়াসকে বুঝি। প্রকৃত শিক্ষা কখনোই সামাজিক পরিবর্তন ও প্রগতির পরিপন্থী নয়। বরং সামাজিক শৃঙ্খলা ও সামাজিক প্রগতির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে শিক্ষা পরিবেশের উন্নয়ন ঘটায়। আর্থ-সামাজিক পরিবেশের একটি উপাদান হিসেবে তাই শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

2.3 স্বাস্থ্য ও পুষ্টি (Health and Nutrition)

WHO-র মতে শুধুমাত্র নিরোগ থাকাই নয়। সম্পূর্ণভাবে শারীরিক ও মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গলও স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। এটি মানুষের গুণাগুণের একটি দিক যা যথোপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবার দ্বারা আরোও বিকাশ ঘটানো যেতে পারে।

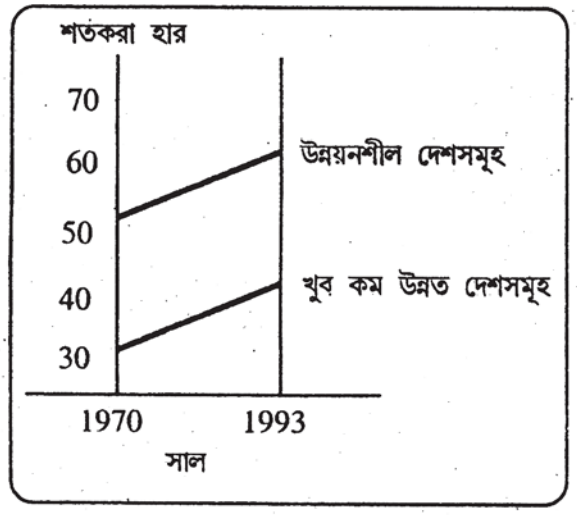

চিত্র ▸ প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হারে উন্নতি
(Hussain অনুকরণে)

জনসংখ্যার কত ভাগ লোক স্বাস্থ্য ও পরিষেবার আওতায় এলেন তার সূচক হল ঐ পরিষেবা ও জনতার অনুপাত। এ বিষয়ে World Bank-র World Development Indicators, 2000-এ যে সূচকগুলোর কথা বলা হয়েছে, তা হল—

(a) স্বাস্থ্য খাতে দেশের মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদনের কত শতাংশ খরচ করা হয় ;

(b) স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু খরচের পরিমাণ কত ;

(c) প্রতি 1000 জন-পিছু কতজন ডাক্তার আছেন ;

(d) প্রতি 1000 জন-পিছু হাসপাতালে কতগুলো শয্যা পাওয়া যায় ;

(e) রোগী ভর্তির হার কত ;

(f) শিশুদের নিরোগ রাখার প্রকল্পে

(Child immunization) যোগদানের হার প্রভৃতি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে—স্বাস্থ্য খাতে প্রতিটি দেশের সরকার বহুভাবে খরচ করে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে টাকার বরাদ্দ করা হয়। বিভিন্ন ঋণদান সংস্থা থেকে দরকার বোধে

সরকার ধার নেয়। তাছাড়া নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠন বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলার জন্য টাকা খরচ করে। World Bank-এর 2000-এর প্রতিবেদন অনুসারে 1990 থেকে 1998 সালের মধ্যে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনস্বাস্থ্যের মান ভাল ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বার্ষিক মাথাপিছু আয় অনুসারে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(a) নিম্নবিত্ত দেশ* ; (b) নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশ** ও (c) উচ্চ মধ্যবিত্ত দেশ***।

এছাড়া রয়েছে উচ্চবিত্ত উন্নত দেশ যাদের মাথাপিছু বার্ষিক আয় 9,380 ডলারের বেশি।

এবার দেখা যাক্ উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে কিরকম ব্যয় করে বা উভয় প্রকার দেশগুলোতে পরিষেবার ধরন কিরকম।

সারণি 11.2

1990 থেকে 1998 সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা

স্বাস্থ্য-সূচক	উন্নয়নশীল দেশ			উন্নত দেশ
	নিম্নবিত্ত দেশ	নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশ	উচ্চ মধ্যবিত্ত দেশ	
স্বাস্থ্যখাতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) শতকরা ব্যয়ের পরিমাণ (%) প্রতি বছরে	4.2%	5.3%	6.3%	9.8%
স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু খরচের পরিমাণ প্রতি বছরে	23 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 1,150 টাকা	102 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 5,100 টাকা	335 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 16,750 টাকা	2,585 ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 1 লক্ষ 30 হাজার টাকা
প্রতি 1,000 মানুষ-পিছু ডাক্তারের সংখ্যা	1 জন	2 জন	1.5 জন	2.8 জন
প্রতি 1,000 মানুষ-পিছু হাসপাতালের সংখ্যা	1, 8টি	5, 1টি	3, 2টি	7, 4টি
প্রতি 100 জন মানুষ-পিছু রোগী ভর্তির হার (%)	5 জন	15 জন	6 জন	15 জন

* মাথাপিছু বার্ষিক আয় 760 ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় 38,000 টাকা)।

** মাথাপিছু বার্ষিক আয় 761-3030 ডলার (38,000-1.5 লক্ষ টাকা, প্রায়)

*** মাথাপিছু বার্ষিক আয় 3031-9,360 ডলার (1.5-4.68 লক্ষ টাকা, প্রায়)

স্বাস্থ্য-সূচক	উন্নয়নশীল দেশ			উন্নত দেশ
	নিম্নবিত্ত দেশ	নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশ	উচ্চ মধ্যবিত্ত দেশ	
1 বছরের কম বয়সী প্রতি 100 জন শিশুর মধ্যে কত জনকে সংক্রামক রোগ প্রতিহত করার টিকা দেওয়া হয়েছে (%), যেমন হাম, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া	80 জন	89 জন	92 জন	100 জন
টিটেনাস	82 জন	89 জন	82 জন	100 জন

Source : World Development Indicators, 2000

সারণি 11.2 থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মোট ব্যয়ের মাত্র 5.3% স্বাস্থ্য খাতে খরচ করা হয়। অথচ উন্নত দেশগুলোতে এই খরচের পরিমাণ গড়ে 9.8%। পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য খাতে খরচের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি 13.9%, আর নাইজিরিয়াতে সবথেকে কম (0.7%)। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য খাতে মোট খরচের পরিমাণ 5.2%।

WHO-র দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া, টিটেনাস, হুপিং কাশি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। এছাড়া বর্তমানে AIDS-এর মত মারাত্মক রোগ যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সব দেশেই এই রোগ থেকে প্রচুর প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সব দেশে সাধ্যমত ব্যবস্থা নিলেও রোগী প্রতি চিকিৎসকের সংখ্যা এত কম যে, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো ঠিকমতো রূপায়ণ করা, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফ্রিকার ইথিয়োপিয়াতে প্রতি 72,000 জনে ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র 1 জন। পক্ষান্তরে, ফ্রান্স, জার্মানির মত উন্নত দেশে প্রতি 500 জনের জন্য এক জন করে ডাক্তার রয়েছে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের ফলেও বিকাশশীল দেশগুলোতে রোগের প্রাদুর্ভাব ও শিশু মৃত্যুর হার বেশি। WHO-র প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পৃথিবীতে প্রতি পাঁচ জনে এক জন অকালে মারা যায়। সুষম খাবার না পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম প্রায় 1 কোটি 10 লক্ষ শিশু মারা যায়।

সুতরাং মানব সম্পদের সার্বিক উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রতিষেধক ও চিকিৎসার সুযোগগুলো জনসাধারণের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোব মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা নিচের সারণি (11 3) থেকে ধরা পড়ে।

সারণি 11.3 : 1995 থেকে 2000 সালের মধ্যে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা

দেশ	স্বাস্থ্য			পুষ্টি	
	গড় আয়ু (বছর) (1995-2000)	শিশু-মৃত্যু (হাজার)	কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা (লক্ষ প্রতি)	প্রয়োজনের তুলনায় ক্যালোরির যোগান (%)	কম ওজনের শিশুর সংখ্যা (Underweight Children) (%)
উন্নত দেশ					
যুক্তরাষ্ট্র	76.7	10	0.01	138	×
জার্মানি	76.7	7		148	×
যুক্তরাজ্য (%)	77.1	7	0.02	130	×
ফ্রান্স	78.8	9	0.01	143	×
জাপান	80.0	6	0.26	125	×
উন্নয়নশীল দেশ					
ভারত	62.4	115	0.36	101	53
বাংলাদেশ	58.1	115	—	88	67
পাকিস্তান	63.9	137	—	99	38

উৎস : *World Resources, 1998-99*

এছাড়া শহরাঞ্চলে প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশের সব মানুষ উন্নত পয়ঃপ্রণালী ও শৌচাগারের সুযোগ ভোগ করেন। পক্ষান্তরে, ভারতে 70%, বাংলাদেশে 77% ও পাকিস্তানে 77% মানুষ এই সুযোগ পান। এজন্য ঐ সব দেশের মানুষজন খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগ বাধ্য হন। এজন্য তারা বিভিন্ন সংক্রামিত রোগে আক্রান্ত হন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শহরবাসীর সংখ্যা কম। আর শহরবাসীরাই উন্নত পরিষেবার সুযোগ ভোগ করে থাকেন (সারণি 11.4)।

সারণি 11.4

মানুষের জীবনযাত্রার গুণমানের পার্থক্য

সূচক	সাল	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানী	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	জাপান	রাশিয়ান ফেডারেশন	ভারত	বাংলাদেশ	পাকিস্তান
শহরবাসীর সংখ্যা (%)	1997	77	87	89	75	78	77	27	19	35
শহরাঞ্চলে পয়ঃপ্রণালী ও শৌচাগারের সুযোগ (%)	1995	—	100	—	100	—	—	70	77	53

সূচক	সাল	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানী	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	জাপান	রাশিয়ান ফেডারেশন	ভারত	বাংলাদেশ	পাকিস্তান
মাথাপিছু ব্যক্তিগত ভোগের বৃদ্ধি	1980-1996	1.8	—	2.6	1.7	2.9	—	.23	0.0	1.1
শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির প্রাদুর্ভাব (%)	1990-1996	—	—	—	3	—	66	. 68	40	

উৎস : *World Development Report, 1998-99*

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হল যে, পৃথিবীর বিকাশশীল দেশগুলোতে মানব উন্নয়নের হার খুব কম, আর এজন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও জনসংখ্যা-সম্পর্কিত কারণগুলো যে দায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

2.3.1 দারিদ্র্য ও ক্ষুধা (Poverty and Hunger)

আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীতে সহায়-সম্পদের বন্টন ও মানুষের আয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এমনকি, কোন দেশের এক-একটি অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে আয় তথা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের তফাৎ, যেমন ভারতবর্ষের পাঞ্জাব-হরিয়ানার কৃষিজীবী জনতার সাথে বিহারের কৃষিজীবী জনতার আয়ে ফারাক রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানুষের মাথাপিছু আয় কম। World Bank মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) ভিত্তিতে 1977 সালে পৃথিবীর দেশগুলোকে চারটি অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে ভাগ করেছে ঃ যেমন, নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত।

সারণি 3.9

জাতীয় উৎপাদনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক গোষ্ঠী		
মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (ডলারে)	অর্থনৈতিক গোষ্ঠী	অঞ্চল
785 ও তার কম	নিম্নবিত্ত	দক্ষিণ-এশিয়া ও অব সাহারা (আফ্রিকা)

785-3, 125	নিম্ন-মধ্যবিত্ত	পূর্ব ও মধ্য এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা
3,126-9,655	উচ্চ-মধ্যবিত্ত	পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ ও পূর্ব আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ
9,655-ও তার বেশি	উচ্চবিত্ত	পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও সুদূর প্রাচ্য

এশিয়া ও আফ্রিকার দু'একটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ হয় নিম্নবিত্ত, নয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত। বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিরিখে 1977 সালে আমাদের দেশের স্থান ছিল বিশ্বে 102 তম। ঐ সময় আমাদের মাথা পিছু আয় ছিল 390 ডলার*। বিশ্ব ব্যাঙ্ক দারিদ্র্যেরও সংজ্ঞা দিয়েছে। যদি কোন ব্যক্তির দৈনিক মাথাপিছু আয় এক ডলারের কম হলে তাকে দরিদ্র বলা যাবে। 1992 সালের হিসেবে ভারতে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল শতকরা 52.5। 1996 সালে ভারতীয়দের গড় আয়ু ছিল 62.5 (শ্রীলঙ্কার থেকেও কম 73 বছর)। ঐ সময় শিশুমৃত্যুর (5 বছরের কম) ছিল প্রতি হাজারে 85 জন। 1990-96-র বছরগুলোতে এদেশের 66 শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগতো। দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অশিক্ষা, শিশুমৃত্যু সব হাত ধরাধরি করে চলে। বলা বাহুল্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এসবের শিকার। নিচের সারণিতে তা পরিষ্কার হবে।

সারণি 3.10

দেশ	স্বাস্থ্য				পুষ্টি	
	গড় আয়ু (1995-2000)	শিশু মৃত্যু (হাজারে)	ডাক্তারের সংখ্যা (প্রতি একলক্ষে)	কলেরা আক্রান্ত রোগী- (সংখ্যা প্রতি এক লক্ষে)	প্রয়োজনের তুলনায় ক্যালোরির যোগান (%)	কম ওজনের শিশুর সংখ্যা (%)
উন্নত দেশ						
যুক্তরাষ্ট্র	76.7	10	245	0.01	138	--
জার্মানী	76.7	7	3 19		148	--
যুক্তরাজ্য	77.1	7	164	0.02	130	--

* এর বেশ কিছুটা বৈদেশিক ঋণের আসল (Principle) ও সুদ (Interest) মেটাতে বেরিয়ে যায়।

দেশ	স্বাস্থ্য				পুষ্টি	
	গড় আয়ু (1995-2000)	শিশু মৃত্যু (হাজারে)	ডাক্তারের সংখ্যা (প্রতি একলক্ষে)	কলেরা আক্রান্ত রোগী- (সংখ্যা প্রতি এক লক্ষে)	প্রয়োজনের তুলনায় ক্যালোরির যোগান (%)	কম ওজনের শিশুর সংখ্যা (%)
ফ্রান্স	78.1	9	280	0.01	143	--
জাপান	80.0	6	177	0.26	125	--
উন্নয়নশীল দেশ						
ভারত	62.4	85	48	0.36	101	53
বাংলাদেশ	58.1	115	18	--	88	67
পাকিস্তান	63.9	137	52	--	99	38

(উৎস : World Resources, 1998-99)

WHO-র প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ম্যালেরিয়া, কলেরা, হুপিং কাশি, টিটেনাস-র মতো রোগের প্রকোপ বেশি। অথচ দুর্ভাগ্য হল পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রোগী প্রতি চিকিৎসকের সংখ্যা অতি নগণ্য, আফ্রিকার ইথিয়োপিয়াতে প্রতি 77,000-এ ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র এক জন। এর বিপরীতে ফ্রান্সে প্রতি 500 জনের জন্য রয়েছে এক জন ডাক্তার। সুষম খাদ্যের অভাবই পৃথিবীতে অকাল মৃত্যুর কারণ। এক হিসেবে দেখা গিয়েছে প্রতি বছর পৃথিবীতে পাঁচ বছরের কম শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা হল প্রায় 1 কোটি 10 লক্ষ। সত্যি বলতে কি, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার জন্য বিনিয়োগ খুব কম। এবার দেখা যাক দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মানুষের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির ওপর কি রকম প্রভাব ফেলে ?

2.3.2 প্রথম মাত্রার প্রভাব : স্বাস্থ্যের ওপর (First Level effect on Health) :

WHO-র মতে শুধুমাত্র নিরোগ থাকাই নয়, সম্পূর্ণভাবে শারীরিক ও মানসিক এবং সামাজিক মঙ্গলও স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। এটি মানুষের গুণাগুণের আর একটি দিক যা যথোপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবার দ্বারা আরো বিকাশ ঘটানো যেতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান কম। এর কারণ আর্থিক সঙ্গতির অভাব। সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা ভালো খাদ্য ও চিকিৎসায় সুযোগ নিতে

পারেন। দরিদ্ররা অপুষ্টিতে ও অনেক সময় বিনা চিকিৎসায় ভোগেন ও মারা যান। এ প্রসঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের লভ্যতা ও পুষ্টির কথা চলে আসে।

উপনিষদে আছে—অন্ন ন নিন্দ্যাৎ। তদব্রতম। প্রাণে বা অন্নম শরীর মন্নাদম। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্টিতম। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। (তৈত্তিবীরোপনিষৎ, তৃতীয় ভৃগুবল্যধায়, সপ্তম অনুবাক) অন্নকে কখনো নিন্দা না করার ব্রত গ্রহণ করবে। প্রাণই অন্ন এবং শরীর অন্ন হতে জাত, কারণ শরীর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। অথচ উপনিষদের দেশ ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে বর্তমানে 25 থেকে 30 কোটি ভারতবাসী অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায়। 25 কোটি মানুষ খাদ্যদ্রব্যের ন্যূনতম প্রয়োজনের তিন-চতুর্থাংশেরও কম ভোগ করে। বাকি প্রায় 5 কোটি মানুষ জীবনধারণের জন্য দৈনিক যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তার অর্ধেক তারা গ্রহণ করে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অন্তত পক্ষে 2,200 ক্যালোরি (1992) গুণসম্পন্ন আহারের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ভারতীয়দের গড় হল 2,395 ক্যালোরি। আমাদের মাথাপিছু খাদ্য-প্রাপ্তির বার্ষিক পরিমাণ হল 160 কেজি। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ায় ঐ পরিমাণ হল যথাক্রমে 3,300, 2,500 ও 3,3,00। ICMR (ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পর্ষদ) দৈনিক মাথাপিছু 2,160 ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন হয় বলে জানিয়েছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গরীব মানুষ তা জোগাড় করতে পারেন না। চিকিৎসার সুযোগ সুবিধার ওপরও মৃত্যুহার নির্ভর করে। একথা খুব স্বীকৃত যে জনতা পিছু চিকিৎসকের সংখ্যা ও মৃত্যুহারের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জনতা পিছু ডাক্তারের সংখ্যা তুলনা করলে এই সত্য ধরা পড়ে। এর সঙ্গে আমরা পানীয় জল, পুষ্টি, আবাসস্থল ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে ধরতে পারি। কারণ পুষ্টির অভাব, স্বাস্থ্য-সম্মত বাসস্থান ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার অপ্রতুলতা নানাবিধ অসুখ বিসুখের সৃষ্টি করে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অনেক অনুন্নত দেশের বাসিন্দারা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন নন। সবশেষে বলা চলে অনেক সনাতনী সমাজে আজও ধর্মীয় কারণে লোকে আধুনিক ওষুধ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুযোগ নিতে চান না, ফলে সে সব দেশে রোগ বালাই ও মৃত্যু লেগেই থাকে।

এক নজরে ভারতের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা
(India's population, health and education at a glance)

জনসংখ্যা	→	1,022 (2000 সাল,)
জনসংখ্যা দু'গুণ হবার সাল	→	2031
বাৎসরিক বৃদ্ধির হার	→	1.8 শতাংশ (1995)
পৌর জনসংখ্যা, 1994 সাল	→	26 শতাংশ
গ্রামীণ জনসংখ্যা	→	74 শতাংশ

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতাংশ		→	16	
স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতার বাইরে জনসংখ্যা		→	135.2 মিলিয়ান	(1985-95)
বিশুদ্ধ জল ভোগকারী জনতা		→	171.3 মিলিয়ান	(1990-95)
পয়ঃ প্রণালী সুবিধা ভোগকারী জনতা		→	640 মিলিয়ান	
জনসংখ্যা প্রতি	ডাক্তার	→	2,437 (1988-91) জন	
জনসংখ্যা প্রতি	নার্স	→	3,333 জন	
ধূমপায়ী জনতার	(UNO 1990)	→	পুরুষ 53 %	
	সমীক্ষা	→	নারী 3%	
R + D বৈজ্ঞানিক ও কারিগরীবিদ		→	0.3%	(1985-92)
প্রতি হাজার লোকসংখ্যায়				
ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ঃ প্রাইমারী স্কুল		→	48 জন ছাত্রপিছু একজন শিক্ষক	
ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ঃ মাধ্যমিক		→	33 জন ছাত্রপিছু	(1992)
শিক্ষার হার (1993)		→	পুরুষ 64%	
		→	নারী 36%	
প্রতি 100 জনসংখ্যায় সংবাদপত্রের সংখ্যা		→	3টি	(1992)
প্রতি 1 লক্ষ জনসংখ্যায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা		→	1টি	(1990-91)

সূত্র ঃ Manorama Year Book, 1997

এক নজরে আমাদের খাদ্য
(Our food at a glance)

ক্যালোরি গ্রহণ (গড়ে প্রতিদিন মাথাপিছু)	2,395 (1992)
দুধ (প্রতিদিন)	107 গ্রাম
মাংস (বাৎসরিক)	2000 গ্রাম (1990)
মাথাপিছু খাদ্য প্রাপ্তি (প্রতিদিন)	436 গ্রাম (1994)
ডাল	38 গ্রাম (1994)
ভোজ্য তেল	6,000 গ্রাম (1992-93)
বনস্পতি	1,000 গ্রাম (1992-93)

শাকসব্জী	150 গ্রাম প্রতিদিন (1995)
ফল	80 গ্রাম (1995)
চিনি	14,000 গ্রাম (1992-93)

(সূত্র : Manorama Year Book, 1997)

2.3.3 দ্বিতীয় মাত্রার প্রভাব

● স্বস্তি, সুবিধে ও নান্দনিক বিষয়ের ওপর (Second Level Effects on Comfort, Convenience and Aesthetics)

প্রত্যেক মানুষই চায় একটু ভালোভাবে থাকতে। আর একটু ভালোভাবে থাকতে মানুষ কঠোর পরিশ্রম করেছে। তাই যখন যে দারিদ্র্য সীমার ওপরে উঠে আসে, তখন সে জীবনযাত্রার অন্যান্য উপকরণ পেতে আগ্রহী হয়, যাতে সে একটু স্বস্তি ও সুবিধে পায়। স্বস্তি মানুষকে সুখী করে, বাড়িয়ে তোলে তার কর্মদক্ষতা। যেমন ধরা যাক কম্পিউটারের কথা। হাতে ছাপার চেয়ে কম্পিউটারে ছাপা অনেক ঝকঝকে। অনেক কম আয়াসে এই ছাপাতে অক্ষরের বিন্যাসও নান্দনিক। এই ছাপাতে চিত্র যোগ করতে আলাদা করে ব্লকের প্রয়োজন হয় না। তেমনি বাড়িতে টেলিভিশনের উপস্থিতি মানুষের বিনোদনের খোরাক যোগাচ্ছে। মানুষকে কষ্ট করে সিনেমায় যেতে হচ্ছে না। আজকের জেট যুগে বাড়িতে একটা মোটরগাড়ি থাকলে অনেক কাজ সহজেই হয়ে যায়। তাই বলছিলাম বৈদ্যুতিক পাখা, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, মোটর গাড়ী মানুষকে অনেক আরাম ও স্বস্তি দিয়েছে। মানুষের কাজের সুবিধে ও কর্মদক্ষতা বাড়িয়েছে।

এসব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার পাশাপাশি মানুষ তার একঘেয়েমি জীবন থেকে বৈচিত্র্যের স্বাদ খুঁজতে ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়ে। দিকে দিকে কত না নগর রাজধানী, মানুষের কত কীর্তিকে জানতে মানুষ ঘর ছেড়ে মাঝে মাঝে বেড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজারী তো মানুষ। তাই তারা পর্বতমালা, অরণ্যভূমি, সাগরবেলা, এমন কি ঐতিহাসিক স্থানে বারেবারে ছুটে যায়। ঠিক এই জন্যই সঙ্গতিপন্নরা সাগরবেলা, স্বাস্থ্যকর স্থান, পাহাড়ে ছুটি উপভোগ করার জন্য বাড়ী বানায়। অনেকে আবার শহর থেকে একটু দূরে নিরিবিলি স্থানে বাগানবাড়ি বানায়। এছাড়া সখ করে মানুষ তার ফুলের বাগান লাগায়, সূক্ষ্ম হাতের কাজ করে। এ সবই তার নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ।

2.3.4 তৃতীয় মাত্রার প্রভাব

● বাস্তুতন্ত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ওপর (Third Level Effect on Ecosystem and Natural Balance) ঃ

এখন প্রশ্ন হল মানুষ যে বিলাসব্যসনে মত্ত হয়েছে, তার উপকরণ কোথা থেকে আসে ? উত্তর হল ব্যাপকহারে বৃক্ষচ্ছেদন ও শিল্পায়ন। ফলে বাড়তে থাকে পরিবেশের অবক্ষয় ও দূষণ। পরবর্তী আলোচনাতে আমরা দেখবো যে উন্নত দেশগুলো ভোগবিলাসের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দূষণ ছড়াচ্ছে। এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মোটর গাড়ি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ দেশে প্রতি তিন জন পিছু দুটি মোটরগাড়ি রয়েছে। সুতরাং ঐ দেশে মোটরগাড়ি থেকে কত পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছড়াচ্ছে, তা সহজেই অনুমেয়। ভারতও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। এদেশেও মোটরযানের সংখ্যা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে 2,000 সালের প্রথম কয়েক মাসের মোটরযান বিক্রয়ের হিসেব

ভারতবর্ষের 2000 সালের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত মোটরযান বিক্রয়

মোটরযান	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন
স্কুটার	1,07,966	94,547	85,454	78,679
মোটর সাইকেল	2,05,194	1,65,797	1,69,850	1,64,201
মোপেড	78,019	56,604	57,389	63,049
মোটর গাড়ি	73,090	53,499	52,593	36,974
অন্যান্য	17,194	8,299	10,131	9,771
মোট	**4,81,463**	**3,78,746**	**3,75,417**	**3,52,674**

Source : Overdrive, Vol. 2, No. 10-12 & Vol. 3, No. 1, 2000

থেকে এই তথ্য ধরা পড়ে। শুধুমাত্র অরণ্যচ্ছেদন ও ফলস্বরূপ কার্বন-ডাই-অক্সাইড-র পরিমাণ বৃদ্ধি পরিবেশকে দূষিত করছে তাই নয়, কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারও দূষণে সহায়তা করছে। কীটনাশকের সংস্পর্শে এলে অনেক রোগের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এটা নির্ভর করে কীটনাশকের toxicity ও মানুষের শরীরে কতটা পরিমাণ কীটনাশক প্রবেশ করেছে তার ওপর। ধরা যাক কোন কৃষিকর্মীর চামড়ায় কয়েক ফোঁটা মেথিল প্যারাথিয়ন পড়লো, ফলে ঐ ব্যক্তির খুব ঘাম হতে পারে, মাথা যন্ত্রণা করতে পারে, বমি হতে পারে, এমন কি, চলাফেরায় অক্ষম হতে পারে। মাত্রা একটু বেশি হলে

চামড়া পুড়ে যেতে পারে, পঙ্গু, অন্ধ, এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। বেশির ভাগ কীটনাশকজনিত দূষণ ও মৃত্যু উন্নয়নশীল দেশেই ঘটে থাকে, যদিও উন্নত দেশসমূহে অনেক বেশি পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করা হয়।

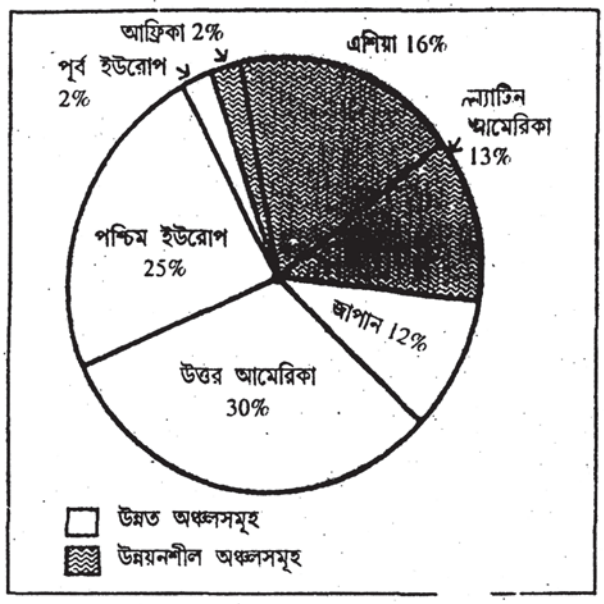

চিত্র : 3.12 কীটনাশক ব্যবহারে উন্নত অঞ্চলসমূহের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়

2.4 প্রশ্নাবলী

১। পরিবেশ কি?
২। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কি কি?
৩। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে কি বোঝায়?
৪। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি?
৫। আর্থ-সামাজিক পরিবেশ কি?
৬। আর্থ-সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলি কি কি?
৭। আশ্রয় কি?
৮। আশ্রয়ের সাথে নিরাপত্তার প্রশ্নটি কিভাবে জড়িত?
৯। পৃথিবীতে আসাম্যের পরিমাপের সূচক কি?
১০। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সম্পর্ক কি?
১১। পৃথিবীতে কোন্ ধরনের দেশগুলি গ্রোপের শিকার?
১২। মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলিকে কয়টি অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়?
৩। দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মানুষের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির উপর কিরকম প্রভাব ফেলে?

একক 3 ❐ পরিবেশ অবক্ষয়, বিপর্যয় ও ঝুঁকি

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

3.2 পরিবেশ অবক্ষয় ও পরিবেশগত বিপর্যয়-পরিচিতি

3.3 বন্যা (Flood)

3.4 খরা (Drought)

3.5 মৃত্তিকা অবক্ষয়ের ধারণা (Soil Degradation)

3.6 বর্জ্য (Waste)

3.7 দূষণ (Pollution)

3.8 সামাজিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

3.9 চরম ঘটনাবলী

3.10 সংক্ষিপ্তসার

3.11 প্রান্তিক প্রশ্নাবলী

3.12 গ্রন্থপঞ্জী

3.1 প্রস্তাবনা

মানুষ জীবমণ্ডলের একটি অংশ। মানুষকে ঘিরে রয়েছে পরিবেশ। জীবনধারণের জন্য মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সম্পদের স্রষ্টা ও ভোক্তা হিসাবে মানুষ দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন ভাবে পরিবেশের উৎকর্ষ হানি বা অবক্ষয় ঘটেছে। পরিবেশ অবক্ষয়ের কিছু কারণ প্রাকৃতিক হলেও মানুষের ক্রিয়াকলাপও অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। পরিবেশ অবক্ষয় যখন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনে ক্ষতি বা বিপদ আনে তখন তাকে বলাহয় বিপর্যয়। বিপর্যয় তিনরকম—প্রাকৃতিক, আধা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট। বন্যা, খরা ও মৃত্তিকা অবক্ষয়ের প্রাকৃতিক কারণ আছে। তবে এই ধরনের বিপর্যয়ের ত্বরান্বিত হওয়ায় মানুষের ভূমিকা আছে। বর্জ্য ও দূষণ জনিত বিপর্যয় মনুষ্যসৃষ্ট। বিপর্যয়ের সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধেও আপনাদের এই এককে জানানো হল।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পড়ার পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

- পরিবেশ অবক্ষয়, বিপর্যয় ও ঝুঁকি সম্পর্কে
- বন্যা, তার কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে
- খরা, তার কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে
- মৃত্তিকা অবক্ষয়, তার কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে
- বর্জ্য ও দূষণ তার কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে
- পরিবেশ অবক্ষয়ের সামাজিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে
- পরিবেশ অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের কিছু চরম ঘটনাবলী সম্পর্কে

3.2 পরিবেশ অবক্ষয় ও পরিবেশগত বিপর্যয়-পরিচিতি (Environmental degradation and hazards-their consequences)

মানুষ জীবমণ্ডলের একটি উপাদান। মানুষ তার প্রয়োজনে প্রাথমিক চাহিদা মিটিয়ে নেবার জন্য পরিবেশ থেকে নানাবস্তু আহরণ করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষ শস্যের উৎপাদন, বনজ সম্পদ, জলের নিষ্কাশন ও ব্যবহার বৃদ্ধির চেষ্টায় পরিবেশ অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর কখনও কখনও ক্ষতি হয় খুব ধীরে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যাবে যে পরিবেশ অবক্ষয় বা পরিবেশের উৎকর্ষহানি শিল্প বিপ্লবের পরে ও পৌরায়ণের পরে খুবই দ্রুত ঘটে গেছে। এই অবক্ষয়ের প্রকাশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় হলেও অনেক প্রভাবই দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী।

3.2.1 বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে অবক্ষয়

বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে অবক্ষয় ও অবক্ষয়ের মূল কারণ সমূহের আলোচনা আমাদের পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান দিক ও গুরুত্ব সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হতে সাহায্য করবে। UNEP এর আদলে মূলতঃ পাঁচটি বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে এই আলোচনা করা হল ঃ

বাস্তুতন্ত্র	চাপ	কারণসমূহ
কৃষি বাস্তুতন্ত্র	● কৃষিক্ষেত্র নগর ও শিল্পকেন্দ্রে রূপান্তর	● জনসংখ্যা বৃদ্ধি
	● পুষ্টি জলধারায় দূষণ	● খাদ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা
	● জলের অভাব	● পৌরায়ণ
	● মৃত্তিকা অবক্ষয়	● জল ও পরিবহণ সংক্রান্ত সরকারী নীতি
উপকূলবর্তী বাস্তুতন্ত্র	● অতিরিক্ত মৎস্য শিকার	● জনসংখ্যা বৃদ্ধি
	● জলাশয় ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের রূপান্তর	● খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি
		● উপকূলীয় পর্যটনের বৃদ্ধি
	● কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পস্থল থেকে জলদূষণ	● সরকারীভাবে মৎস্য শিকারে উৎসাহ দান
	● স্বাভাবিক খাঁড়ির দূষণ	● মৎস্যক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব
বন বা অরণ্য বাস্তুতন্ত্র		উপকূলীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা
	● কৃষি এলাকা বিস্তার অথবা পৌরায়ণের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির বাসস্থানের বিলোপ বা খণ্ডকরণ	● জনসংখ্যা বৃদ্ধি
		● কাঠ, কাষ্ঠমণ্ড ও অন্যান্য দ্রব্যের বর্দ্ধিত চাহিদা
মিষ্টজল বাস্তুতন্ত্র	● বনবিনাশ ও তার প্রভাব স্বরূপ জীববৈচিত্র্য হ্রাস, সঞ্চিত কার্বন নিঃসরণ, জল ও বায়ু দূষণ	● কাঠের নিলাম
	● কৃষি শিল্প ও পৌর ব্যবহারের জন্য অধিক জল নিষ্কাশন	● জনসংখ্যা বৃদ্ধি
	● আভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রের অতিরিক্ত ব্যবহার	● জল ব্যবহারে সরকারী ভর্তুকি
	● জলসেচ, জলবিদ্যুৎ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ	

বাস্তুতন্ত্র	চাপ	কারণসমূহ
তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্র	● কৃষি, শিল্প ও পৌরক্ষেত্র থেকে জলদূষণ ● কৃষি ও নগরায়নের ফলে রূপান্তর মৃত্তিকা অবক্ষয় পশুপালন হেতু জলদূষণ পশু শিকার	● জলদূষণের সম্বন্ধে কম জানা ● জলবিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি ● জনসংখ্যা বৃদ্ধি ● কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি ● পশুমাংসের চাহিদা বৃদ্ধি

3.2.2 পরিবেশগত বিপর্যয়-সংজ্ঞা ও ধারণা (Environmental disaster)

পৃথিবীতে নানা প্রাকৃতিক ক্রিয়া সর্বদাই ঘটে যায়। এই ক্রিয়ার পশ্চাতে কিছু শক্তি থাকে। এই সব ক্রিয়ার গতি ও প্রকাশ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কোনো প্রাকৃতিক বা আর্থ-সামাজিক ক্রিয়ার চরম অবস্থায় যদি মনুষ্যজীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়, তবেই সেই ক্রিয়া ও তার ফলকে বিপর্যয় বলা চলে।

যদি প্রাকৃতিক ক্রিয়া বা উপাদানগুলির গড় অবস্থাকে কল্পনা করি, তাহলে গড় এবং গড় হতে কিয়দংশ বিক্ষিপ্ত পর্যন্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এক মানানসই সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

যেমন খুব কম বৃষ্টি হলে খরা আর অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা, এই দুটি হল বৃষ্টিপাত নামক প্রাকৃতিক উপাদানটির চরম অবস্থা। এই দুই চরম অবস্থাতেই জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।

হিউইট ও বাটন (১৯৭১) বিপর্যয় সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশগত ক্রিয়াগুলিকে উৎস অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। নীচের সারণিতে এই নথিকরণ প্রদর্শিত হল ঃ

(ক) বায়ুমণ্ডলীয় বিপর্যয় ঃ

একক উপাদান	মিশ্র উপাদান
বৃষ্টি	ধূলার ঝড়
তুষারপাত	তুষার ঝড়
শিলাবৃষ্টি	কালবৈশাখী

বজ্রপাত
তাপপ্রবাহ
শৈত্যপ্রবাহ
কুয়াশা
টর্নেডো
হারিকেন
খরা

(খ) উদক বিপর্যয় ঃ

বন্যা
জলমগ্নতা
হ্রদ ও উপকূলীয় স্রোত ক্রিয়া
হিমবাহ অগ্রসরতা
জলধারার স্বল্পতা হেতু খরা

(গ) ভূতাত্ত্বিক ঃ

পুঞ্জিত ক্ষয়
ক্ষয়
ডাইক বা নদীতে পলল অবক্ষেপ হয়ে হঠাৎ রুদ্ধ হওয়া
ভূমিকম্প
আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

(ঘ) প্রাণীগত বিপর্যয় ঃ

মনুষ্য সমাজে মহামারী
উদ্ভিদ জগতে মহামারী
গৃহপালিত পশু ও বন্য পশুদের মধ্যে মহামারী
বন ও তৃণভূমিতে দাবানল

(ঙ) প্রযুক্তিগত বিপর্যয় ঃ

পরিবহন দুর্ঘটনা
কারখানার দুর্ঘটনা
দুর্ঘটনার বিষাক্ত বায়বীয় পদার্থ নিঃসরণ
আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্ঘটনা

বড় কোনো কাঠামো ভেঙে পড়া

আণবিক যুদ্ধ

3.2.3 ঝুঁকি

ঝুঁকি হল প্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ। বিপর্যয় মোকাবিলার অর্থ প্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকিকে কমিয়ে আনা। ঝুঁকির বিশ্লেষণ করতে গেলে ঘটনাটির ঘটার আশঙ্কা ও তার ফলে আক্রান্ত মানুষের বিপন্নতার পরিমাপ করা প্রয়োজন।

3.2.4 বিপজ্জনক অবস্থা বা বিপন্নতা

কোন জনগোষ্ঠীর অসহায়তার মাত্রা হল তার বিপন্নতা। ঝুঁকির পরিমাপের সঙ্গে বিপন্নতার সম্পর্ক আছে। জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, তাদের অবস্থান, প্রকৃতি, সম্পদের উপর তাদের ব্যবহার অধিকারের উপর বিপন্নতা নির্ভর করে।

অনুশীলনী—1

3.2.5

১। 'হ্যাঁ' বা 'না' এ উত্তর দিন—

(ক) পরিবেশের উৎকর্ষহানি শিল্প বিপ্লবের পরে ও পৌরায়ণের পরে খুবই ধীরে ঘটে গেছে।

(খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিন ও বাক্য সমাপ্ত করুন ঃ

(ক) বন্যা এক ধরনের (উদক/ভূতাত্ত্বিক) বিপর্যয়।

(খ) পুঞ্জিত ক্ষয় এক ধরনের (প্রযুক্তিগত/ভূতাত্ত্বিক) বিপর্যয়।

(গ) প্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণকে (ঝুঁকি/বিপন্নতা) বলা হয়।

৩। ঝুঁকি কি?

3.2.6 উত্তর

১। (ক) না (খ) হ্যাঁ

২। (ক) উদক (খ) ভূতাত্ত্বিক (গ) ঝুঁকি

৩। 3.2.3 অংশ দেখুন।

3.3 বন্যা (Flood)

বন্যা এক উদক বিপর্যয়। নদীর জল যখন নদীর স্বাভাবিক বা কৃত্রিম বাঁধ বা পাড় ছাপিয়ে নদীবক্ষ হতে চারপাশে ব্যাপ্ত হয়ে স্বাভাবিক জনজীবনকে বেশ কিছু দিনের জন্য বিপর্যস্ত করে তখন বন্যা হয়। একজন উদক বিজ্ঞানীর পক্ষে বন্যার মাত্রা বুঝতে নদীর চরম জলধারা বা প্রতি মূহুর্তে কত জল বয়ে চলেছে জানা প্রয়োজন। বন্যার মূল কারণ বৃষ্টি হলেও মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়ার ফলেও বন্যার প্রকোপ বাড়ে।

3.3.1 বন্যা প্রবণ এলাকা ঃ

কয়েকটি বিশেষ ধরনের এলাকায় বন্যা প্রবণতা বেশী।

(ক) নিম্ন অববাহিকা এলাকা প্রায়ই প্লাবিত হয়।

(খ) ক্ষুদ্র নদী অববাহিকা যেখানে বনচ্ছেদন হয়েছে বা ঢাল বেশী সেখানে স্বল্প সময়ের তীব্র বৃষ্টিতে হঠাৎ বন্যা হয়ে যায়। সাধারণতঃ শুষ্ক এলাকায় সংকীর্ণ নদী খাতে এমন প্রবণতা দেখা যায়।

(গ) পলল ব্যজনীতে নদীপথ প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। ঢাল বেয়ে তীব্র গতিসম্পন্ন জলধারা অনেক পলি নিয়ে আসে। এর ফলে বন্যা হয়।

3.3.2 বন্যার কারণ

3.3.2.1 প্রাকৃতিক কারণসমূহ

(ক) অভিক্ষেপ—বন্যার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল অতিবর্ষণ। পরিচলন বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা হয়।

বৃহৎ নদী অববাহিকায় দীর্ঘ সময় ধরে ক্রান্তীয় নিম্নচাপ থাকলে বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে নিম্নচাপ গভীর হয়ে থাকলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। ক্রান্তীয় নিম্নচাপের কারণে মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে বন্যা আসতে পারে। গ্রীষ্মকালে পরিচলন বৃষ্টিপাতের ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট নদী অববাহিকায় বন্যা হয়।

বসন্তে ও গ্রীষ্মের শুরুতে উচ্চ অক্ষাংশে নিয়মিত বরফগলা জল বন্যা আনে। অনেক সময় বসন্তের শেষে বরফের চাঙড় বাঁধের মত নদীতে জমে থাকে। হয়তো কোনো সাঁকোর ধারে বা নদীপথের কোনো গহ্বরে এই চাঙড় জমে রইল, তখন প্রথমে নদীর উর্ধ্ব অববাহিকায় বন্যা হয় কারণ গলে আসা জল এই চাঙরের পিঠে ধাক্কা খায়। পরে নদীর নিম্ন অববাহিকায় এই বরফ টুকরো হয়ে ভেঙে জল হয়ে বন্যা আনে।

শুষ্ক ও মরুপ্রায় এলাকায় এমনিতে বৃষ্টি কম হয়। এমন সব স্থানে স্বাভাবিক জলনির্গম প্রণালী দুর্বল থাকে। হঠাৎ বেশী বৃষ্টি হলে সেই জল বহনের ক্ষমতা স্থানীয় নদীনালার থাকে না, সমগ্র এলাকায় বন্যা হয়ে যায়। জয়পুর শহরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১৯৮১ সালে জুলাই ১৭ থেকে জুলাই ২১-র বৃষ্টিতে প্রবল বন্যা হয়েছিল।

নদীপথে যদি ভূমিধ্বস বা পুঞ্জিত ক্ষয়ের ফলে অনেক বড় পাথর, চাঙড় বা পলল এসে বাঁধের মত হয়ে যায়, তখন নদীতে বন্যা আসে। ১৯৭৮ এ ভাগীরথী নদীতে কানোড়িয়া গড় নদী অঞ্চলে ধ্বসের ফলে অনেক চাঙড় এসে বাঁধের মত জমা হয়,ভাগীরথীর দুকূল ছাপিয়ে বিধ্বংসী বন্যা হয়।

3.3.2.2 মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও বন্যা

(ক) বনবিনাশ বনভূমিতে গাছের গুঁড়ি বেয়ে জল নেমে আসে এবং মাটিতে পড়ে থাকা পাতার মধ্যে দিয়ে জল সহজেই চুঁইয়ে মাটির গভীরে নামে। নদীর উচ্চ অববাহিকায় বৃক্ষচ্ছেদন বা বনবিনাশ হলে সেখানকার জল চোঁয়ানোর ক্ষমতা হ্রাস পায়।

বনবিনাশের ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় বৃদ্ধি পায়, নদীতে বেশী পলল নেমে আসে। নদী গর্ভে বেশী পলল জমা হয়ে নদীর জল বহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এর ফলে বন্যা ত্বরান্বিত হয়।

(খ) পৌরায়ণ—পৌরায়ণের ফলে যে সড়ক, বাড়িঘর তৈরী হয়, সেই তলগুলি দ্বারা জল তেমন চুঁইয়ে ভৌমভাণ্ডারে পৌঁছতে পারে না। বর্ষার জলের অধিকাংশই দ্রুত নদী নালায় গিয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে শহরের বর্জ্যও বিভিন্ন পথ ধরে নদীতে এসে তার গতিপথকে প্রায় রুদ্ধ করে ফেলে। বহু ক্ষেত্রেই নিম্নভূমিতে বা জলাভূমিতে পুরোনো নদী খাতে বিস্তৃত হতে পারে, তার ফলস্বরূপ স্বাভাবিক নিকাশী ব্যবস্থা ব্যহত হয়ে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

কৃত্রিম বাঁধ—কৃত্রিম বাঁধ দেওয়ার ফলে পলি সমৃদ্ধ জল নদীর বক্ষে আবদ্ধ হয়ে যায়। নদীতে প্রচুর পলল জমতে থাকে। পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ বাঁধে আশ্রয় নেয়, তখন বাঁধকে রক্ষা করার প্রয়াস নিতে হয় সরকারকে। নদী যদি এই বাঁধকে ভেঙে ফেলে তখন জলের আবার নদীতে ফিরে আসা কঠিন হয় কারণ নদীবক্ষ আশপাশের এলাকার তুলনায় উঁচু হয়ে গিয়েছে। কৃত্রিম বাঁধ উত্তর বিহার অঞ্চলে বন্যার অবস্থানে আরও সঙ্গীন করে তুলেছে।

3.3.4 ভারতে বন্যা (Floods in India)

'রষ্ট্রীয় বার আয়োগ' ভারতে বন্যাপ্রবণ এলাকাকে চিহ্নিত করেছেন। ব্রহ্মপুত্র ও বরাক অববাহিকা, গঙ্গা অববাহিকা, উত্তর পশ্চিম ভারতের নদী অববাহিকা, মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির নিম্ন অববাহিকা বন্যাপ্রবণ।

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারী বর্ষা হয়। ব্রহ্মপুত্র ও বরাকের উত্তরের নদীগুলির উচ্চ অববাহিকায় ভূমিধ্বস হয়। প্রচুর পরিমাণ ভাসমান কঠিন পদার্থ এই নদীতে বয়ে আসে। উত্তরপূর্ব ভারত ভূমিকম্পপ্রবণ হওয়ায় নদী গতিপথ ও জলধারায় বিশেষ পরিবর্তন হয়ে বন্যা হয়।

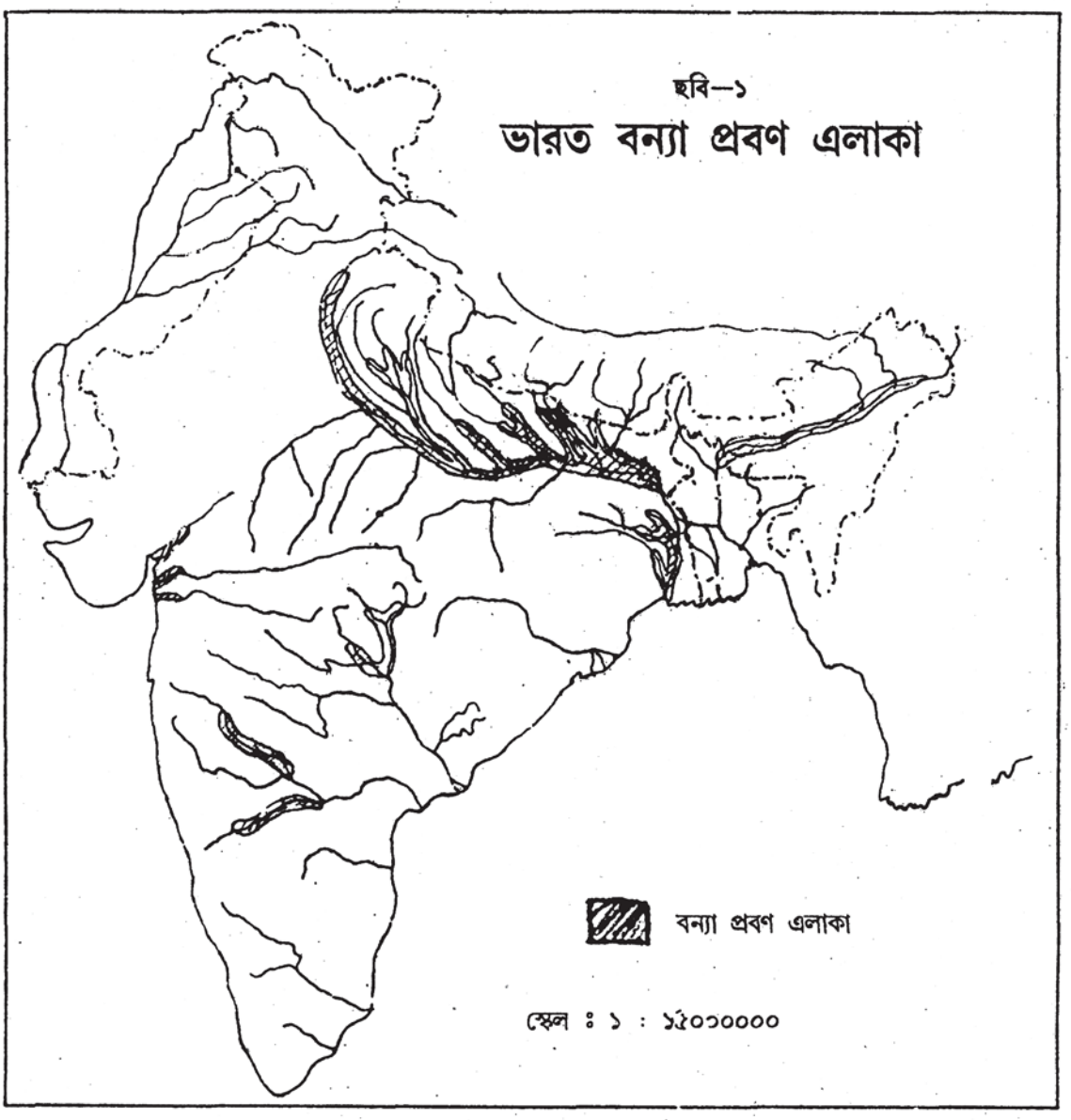

গঙ্গা অববাহিকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৮০ শতাংশ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বর্ষা ঋতুতে ঘটে। উত্তরের নদীগুলি প্রায়ই গতিপথ পরিবর্তন করে। রাপ্তী, সারদা, ঘর্ঘরা, গণ্ডকের বন্যা কুখ্যাত। বিহারে বুড়ি

গণ্ডক, বাগমতী, কোশী ও মহানন্দায় প্রায়ই বন্যা হয়। উত্তর বিহারে পললব্যজনী এলাকায় অনবরত নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় বন্যা বেশী হয়। উত্তর বিহারের নদীগুলির উর্ধ্বপ্রবাহ নেপাল হিমালয়ে। জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৮০ শতাংশ হয়। প্রতিটি নদী প্রচুর পরিমাণে পলল নিয়ে আসে। হিমালয় অঞ্চলে খাড়া ঢাল বেয়ে নদী নেমে আসে উত্তর বিহারে। সমভূমিতে আসায় হঠাৎ ঢাল কমে যায়। এর ফলে নদীগুলির পলল বহন ক্ষমতা অনেকটাই হ্রাস পায় ও নদী গর্ভে পলল অবক্ষেপ হয়। এর ফলে নদীর জলবহন ক্ষমতা কমে যায়। হিমালয়ের ভূমিধ্বস, মৃত্তিকা ক্ষয়ের ফলে কোশী নদীতে প্রতি বছর প্রায় ১৯ ঘনমিটার প্রতি হেক্টর পলল চলে আসে। বর্ষাকালে অতি বর্ষণের ফলে, পাড় ক্ষয়িষ্ণু হওয়ায় উত্তর বিহারের স্বল্প ঢাল এলাকায় কোশী বিনুনী আকৃতি নেয়। এখানে বর্ষার সময় প্রবল বন্যা হয়।

উত্তরবঙ্গে ভূমিধ্বস, বৃক্ষচ্ছেদন, ভূটানের ডলোমাইট খননের ফলে নদীতে অধিক পলল এসে পড়ে। নদীর বহনক্ষমতা কমে যায় ও বন্যা হয়। উত্তরবঙ্গের তিস্তা, লিস, গিস, জলঢাকা, ডায়না, রায়ডাক ও তোর্ষা নদীর খাত গত পঞ্চাশ বছরে উল্লেখযোগ্য ভাবে উঁচু হয়েছে। হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের পরিবেশ অবক্ষয়ের ফলে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত এবং সর্বোচ্চ জলপ্রবাহের মধ্যে সময় ব্যবধান বিশেষ হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং মাঝারি ও ছোট নদীগুলিতে যেমন জয়ন্তী, ডায়না, লিসগিম, কালজানি নদীতে বন্যার প্রকোপ বেড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তরবঙ্গের জলাভূমিতে জনবসতি কৃষিকাজ গড়ে ওঠায়, বর্ষাকালে জল ধারণের স্থান হ্রাস পেয়েছে। দক্ষিণমুখী নদীপ্রবাহের পথ চিরে রেল ও সড়ক ব্যবস্থা পূর্বপশ্চিম পথে যাওয়ায় স্বাভাবিক নিকাশী পথ অনেকটা নষ্ট হয়েছে। ভাগীরথী, অজয়, দামোদর অববাহিকায় পৌরায়ণের ফলে জলনিকাশী ব্যবস্থা বিনষ্ট হওয়ায় ও নদীর বহন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় দক্ষিণবঙ্গে বন্যা হয়। পিয়ালী, বিদ্যাধরী নদী মজে যাওয়ায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দামোদর বহুমুখী পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য হল বন্যা নিয়ন্ত্রণ। সময়ের সাথে সাথে দামোদরের জলাধারে পলিসঞ্চয়ের ফলে ব্যবহার্য জলস্তরের ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৮ এ সেপ্টেম্বর মাসে নিম্নচাপের জন্য প্রবল বৃষ্টি হলে দামোদর প্রকল্পের পরিপূর্ণ জলাধার ঐ উদ্বৃত্ত জলধারণ করতে না পেরে ছেড়ে দেয় ও বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২০০০ সালে অতিরিক্ত বর্ষা, মাসানজোর বাঁধ ও দামোদর প্রকল্পের জল ছাড়াও নিকাশী ব্যবস্থার অবক্ষয়ের কারণে পশ্চিমবঙ্গে বন্যা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলি জোয়ারের জল আসার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নচাপের প্রবল বৃষ্টি একই সময় হলে বন্যার আশঙ্কা বাড়ে।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল বৃষ্টিপাত উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী, বৈতরণী ও সুবর্ণরেখা অববাহিকায় বন্যার মূল কারণ। একই কারণে অন্ধ্রপ্রদেশের কলেরু হ্রদ সংলগ্ন এলাকা বন্যাপ্রবণ। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নিম্ন

অববাহিকায় বন্যা সমস্যা প্রকট। এখানে জোয়ারের জল আসে এবং ভূমির ঢাল কম বলে বন্যা পর্ব সুদীর্ঘ হয়।

বাঁধ বা জলাধার ভেঙে প্রলয়ঙ্করী বন্যা হতে পারে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে বাঁধ ভেঙে বন্যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচের সারণীতে দেখানো হল—

রাজ্য	বাঁধের নাম	বাঁধ ভাঙার বছর
মধ্যপ্রদেশ	কেদারনালা	১৯৬৪
উত্তরপ্রদেশ	নানকসাগর	১৯৬৭
কর্ণাটক	চিক্কাহোল	১৯৭২
তামিলনাড়ু	কোদানগর	১৯৭৭
গুজরাত	মাচ্ছু-II	১৯৭৯
গুজরাত	মিঠী	১৯৮৮

3.3.5 বন্যা নিয়ন্ত্রণে বড় বাঁধের ভূমিকা

বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধের কাজ হল অতিবৃষ্টির সময় অতিরিক্ত জলকে ধারণ করা। কিন্তু বাঁধে পলল সঞ্চয়ের ফলে বাঁধের জলধারণের ক্ষমতা কমে আসে। বাঁধগুলি হয় বিশাল ফলে এদের ভেঙে যাওয়া প্রবল বিধ্বংসী বন্যা নিয়ে আসতে পারে। তাই বন্যানিয়ন্ত্রক বাঁধগুলির ক্ষেত্রে বাঁধের অস্তিত্ব ঠিক রাখার জন্য বাঁধ থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হয়।

3.4 খরা (Drought)

দীর্ঘ সময় অনাবৃষ্টির অবস্থাকে খরা বলে। দীর্ঘকালীন বৃষ্টিপাতের গড় থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে কম বৃষ্টি হলে জলের অভাব হয় ও শস্য উৎপাদন বিশেষভাবে হ্রাস পায়। বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণ দ্বারা 'খরা' সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয় কারণ ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত ভিন্ন হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৮০ মিলিমিটারের কম হলে লিবিয়ায় 'খরা' হয় কিন্তু বালীতে মাত্র ৬ দিন বৃষ্টি না হলেই খরা হয়।

3.4.1 খরার ধারণা

যে কোনো জলবায়ু অঞ্চলেই খরা হতে পারে। এটি প্রকৃতির এক বিপর্যয়। খরা হয়েছে কি না

বুঝতে হলে এলাকার দীর্ঘকালীন বৃষ্টিপাত, বাষ্পীভবন, স্বেদীকরণ সম্পর্কে তথ্য থাকা প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে বাষ্পীভবন ও স্বেদীকরণের সম্পর্ক, বৃষ্টিপাতের সময় বা মূল ঋতু, বৃষ্টিপাত শুরু হবার সময়, বৃষ্টিপাতের সঙ্গে শস্য রোপন বা বপনের ও বৃদ্ধির পর্যায়ের সম্পর্ক, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ইত্যাদির সঙ্গে 'খরা' ধারণার সম্পর্ক আছে। ধরা ধারণা স্পষ্ট করার জন্য আবহাওয়াবিদ, উদক বিজ্ঞানী, মৃত্তিকাবিজ্ঞানী ও কৃষিবিজ্ঞানীরা প্রয়াস নিয়েছেন।

3.4.1.1 আবহবিদের ধারণায় 'খরা'

শুষ্কতার মাত্রা অনুসারে খরার সংজ্ঞা দেওয়া হয়। দীর্ঘ আবহ তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোনো নির্ধারিত 'স্বাভাবিক' আর্দ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে 'খরা' চিহ্নিত করা হয়। যে সব স্থানে সারা বছর জুড়ে বৃষ্টিপাত হয় অর্থাৎ বর্ষার কোনো নির্দিষ্ট ঋতু নেই সেখানে বছরে কয়দিন বৃষ্টিপাতের এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম মাত্রার থেকে কম বৃষ্টি হয়েছে জেনে সেই দিনগুলিকে খরা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। দৈনিক ন্যূনতম বৃষ্টিপাত খরা চিহ্নিতকরণে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে আর্দ্র বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল, আর্দ্র মধ্য অক্ষাংশীয় জলবায়ু অঞ্চলে এইভাবে খরা চিহ্নিত করা হয়। যে সব স্থানে বর্ষায় নির্দিষ্ট ঋতু রয়েছে সেখান মাসিক গড় বা বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কতটা কম দেখে খরা চেনা হয়। কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের গড় মান থেকে যদি বৃষ্টিপাত পঁচিশ শতাংশেরও বেশী হ্রাস পায় তাহলে তাকে আবহাওয়া খরা বলে।

3.4.1.2 কৃষিবিদের ধারণায় 'খরা'

এই ধরনের 'খরা'কে অনেক সময় অদৃশ্য খরা নামে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন আবহাওয়া ও উদক অবস্থা কৃষিকে প্রভাবিত করে। যদি বৃষ্টিপাতের মাত্রার তুলনায় বাষ্পীভবন ও স্বেদীকরণ বেশী হয়, ভৌমজলের ভাণ্ডার হ্রাস প্রাপ্ত হয়, শস্যের উৎপাদনও হ্রাস পায়। এমন অবস্থাকে কৃষি খরা বলা যায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের জলের প্রয়োজন ভিন্ন, এমনকি ভিন্ন পর্যায়ে একই শস্যের জলের প্রয়োজন এক থাকে না। যদি প্রথম পর্যায়ে বা বপনের সময় মৃত্তিকার উপরিস্তরে জল শস্যের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তবে মৃত্তিকার গভীর স্তরে জলের অভাব শস্য উৎপাদনকে ব্যবহৃত করতে পারে না। কৃষি খরা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে জলের সাম্য (water balance) অর্থাৎ বৃষ্টি জলধারা ও বাষ্পীভবনের সম্পর্ক সঠিকভাবে বিচার করতে হয়। যে অবস্থায় মৃত্তিকাস্থিত জল এবং বৃষ্টি উভয়েই শস্যের বৃদ্ধির পক্ষে অপর্যাপ্ত হয়, তবে শস্যের ক্ষতি হয় আর ঝরে পরার কারণ হয়, সেই অবস্থা হল কৃষি খরা

3.4.1.3 উদকবিদের ধারণায় খরা

বৃষ্টিপাত, তুষারপাত বা অন্য অভিক্ষেপ কম হবার ফলে যদি জলধারা, নদী, জলাধার, হ্রদ ও ভৌমজলের পরিমাণ কম হয় তবে 'উদক' খরা হয়। উদক খরা আবহ খরা বা কৃষি খরার সঙ্গে এক সময় হয় না। জলাধার, নদী ও ভৌমজলাধারে জলের পরিমাণে কৃষি খরা বা আবহ খরার প্রভাব প্রকট হতে যথেষ্ট সময় নেয়। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা মৃত্তিকার উপরিস্তরে জলের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস করিয়ে দেয় কিন্তু জলাধারে এর প্রভাব তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় না।

নদী বাঁধ ও জলাধারের জল ভিন্ন ভিন্ন কাজ যেমন সেচ, পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় সুতরাং উদক খরার প্রভাব এই সব ক্রিয়ায় দেখা যায়। জলের বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়।

ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন যেমন বন বিনাশ, ভূমি অবক্ষয়, নদীতে বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি একটি অববাহিকার উদক পরিস্থিতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। আবহ খরার প্রভাব সমগ্র অববাহিকাতেই পড়তে পারে। নদীর উচ্চ অববাহিকায় ভূমি ব্যবহারে বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে মাটিতে জল চোঁয়ানো বেড়ে গেলে বা কৃত্রিম জলাধারে জল ধরে রাখা হলে নিম্ন অববাহিকায় উদক খরা দেখা যায়।

3.4.2 খরার সংজ্ঞা দেওয়ার সমস্যা

(ক) খরা এবং শুষ্কতা এক নয়

(খ) খরা শুধু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে না। খরা হল জলের অভাব। বৃষ্টিপাত জলের উৎস ঠিকই কিন্তু খাদ্য প্রস্তুতের জন্য জল উদ্ভিদ মাটি থেকেই গ্রহণ করে। পানের জন্য জল বা সেচের জন্য জল বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাধার, নদী, কৃত্রিম জলাধার থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং খরার প্রাবল্য বা তীব্রতা অনুধাবনের জন্য জলচক্র ও জলের বিভিন্ন ব্যবহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান প্রয়োজন।

(গ) খরা কতটা প্রাকৃতিক কারণে এবং কতটা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে তা নির্ধারণ করা কঠিন।

খরা জনিত সমস্যাগুলি অতিরিক্ত পশুচারণ, ভ্রান্ত শস্য চাষ পদ্ধতি, বনবিনাশের দ্বারা আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

3.4.3 খরার কারণ (The causes of Drought)

খরার সঙ্গে বায়ু ও সমুদ্র পৃষ্ঠ তাপমাত্রার সম্পর্ক আছে। দক্ষিণ গোলার্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে যে

সমুদ্রস্রোত ও বায়ু পরিবহন ব্যবস্থা আছে তাকে বিজ্ঞানী গিলবার্ট ওয়াকারের নাম অনুসারে ওয়াকার ব্যবস্থা বলা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে ITCZ ধরে পূর্ব পশ্চিম সমুদ্র জল স্থানান্তর হয়। দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরিভাগের জলকে পশ্চিমে সরিয়ে আনে। জল যতই পশ্চিমে যায় ততই জল উষ্ণতর হতে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ধরে শীতল পুষ্টিসমৃদ্ধ জল সমুদ্রের গভীর থেকে উঠে এসে পশ্চিমে সরে যাওয়া জলের জায়গা নেয়।

প্রশান্ত মহাসাগর 'পৃষ্ঠের উষ্ণ জলের গভীরতা ১০০ মিটারেরও কম। এই জলস্তরের নিম্নসীমায় আছে থার্মোক্লাইন। থার্মোক্লাইনের নীচে জল অনেকটাই শীতল। নিরক্ষরেখার দক্ষিণে, উষ্ণ জলের পশ্চিমে স্থানান্তরের ফলে থার্মোক্লাইনের গভীরতা পরিবর্তিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে থার্মোক্লাইন সমুদ্রপৃষ্ঠের খুব কাছাকাছি বা কম গভীরতায় থাকে। থার্মোক্লাইন ধরে পূর্বগামী যে জলপ্রবাহ চলে তার নাম ক্রমওয়েল স্রোত। এই ব্যবস্থার ফলে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে স্বল্প বৃষ্টি ও প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

কোনো কোনো বছর ওয়াকার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তার জায়গা নেয় এল নিনো দক্ষিণ গোলার্ধীয় ব্যবস্থা। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি বা নিম্ন অক্ষাংশে সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অন্তত ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায়। উষ্ণ জলের এলাকা পূর্বদিকে বৃদ্ধি পায় এবং বৃষ্টিপাত এলাকা পূর্ব দিকে সরে যায়। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পায়। চাপ পার্থক্য হ্রাস পাওয়ায় আয়ন বায়ু দুর্বল হয়ে যায়। এই সময় ভারতে ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মেক্সিকোতে খরা দেখা যায়।

সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে বায়ুর চাপের সম্পর্ক আছে।

সুতরাং সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হেরফেরের সঙ্গে খরার সম্পর্ক আছে।

বার্ষিক বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের থেকে কম, মৌসুমী বায়ুর, বিলম্বে আসা, মৌসুমী বায়ুর দ্রুত প্রত্যাবর্তন, আন্তঃ মৌসুমী ঋতুতে দীর্ঘ শুষ্ক পর্যায় ভারতে খরার কারণ।

3.4.4 ভারতে খরা (Drought in India)

ভারতের মোট এলাকার ৩৩ শতাংশ খরাপ্রবণ।

১৯৬৬-৭, ১৯৭২-৩, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮৬-৭, ১৯৯৭-৮ সালে ভারতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে খরা হয়েছে।

বিভিন্ন এলাকায় খরা আসার প্রবণতা	
এলাকা	অতি স্বল্প বৃষ্টিপাত
আসাম	১৫ বছরে একবার
পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা	৫ বছরে একবার
বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর কর্ণাটক	৪ বছরে একবার
পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত, পূর্ব রাজস্থান, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কাশ্মীর রায়লসীমা, তেলেঙ্গানা	৩ বছরে একবার
পশ্চিম রাজস্থান	২.৫ বছরে একবার

২০০২-র খরা সম্পর্কে বিশেষভাবে জানানো হলো।

● **উড়িষ্যা :** প্রতিটি জেলাতেই মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে কম। বিগত ৪০ বছরের মধ্যে ২০০২তেই জুলাই মাসের বর্ষা সব থেকে কম হল। ৩০টি জেলা এবং ২৮৩ ব্লক প্রত্যেকটিই খরা কবলিত। এমনিতে জুলাই মাসে সারা বছরের মধ্যে বর্ষা সব থেকে বেশী হয়। সেপ্টেম্বর মাসে ৯টি জেলায় স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টি হয়েছে, বাকী জেলাগুলিতে স্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছিল।

খরিফ চাষের পরিমাণ স্বাভাবিক বছরে ৫.০৫ মিলিয়ন হেক্টর, জুন জুলাই মাসে বর্ষা কম হওয়ায় ০.৮ মিলিয়ন হেক্টরে চাষ সম্ভব হয় নি। ধান উৎপাদন ৬৮% কম হয়েছে। জেলাভিত্তিক শস্য হানির হিসাব অনুসারে কেন্দ্রপাড়ায় ক্ষতি হয়েছে সব থেকে বেশী। কেন্দ্রপাড়ায় ৯৪.২৫% শস্য হতে পারে নি। বালেশ্বর, গজপতি, জাজপুরে শস্য ক্ষতির পরিমাণ ৯০% র বেশী। কান্ধামাল, রায়পাড়া, নয়াগড়, দেওগড়, বলাঙ্গীর, ভদ্রক, নররঙপুর, মার্সুগাড়া, নোয়াপাড়ায় ৫০% রও বেশী শস্য হানি হয়েছে। ৭০০০০ হেক্টর বীজতলা খরা কবলিত। খরিফ মরশুমে ১লা জুলাই থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ২০টি জেলায় ধান রোপণ খুব কম হয়েছে। উঁচু জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে। উঁচু জায়গায় ধানের উৎপাদন খুবই ব্যহত হয়েছে। খরাপ্রবণ জেলাগুলিতে কিছু ডাল এবং তৈলবীজের চাষের সুযোগ রয়েছে।

● **গুজরাত :** ১৭টি জেলায় খরার প্রকোপ খুবই বেশী। এই জেলাগুলি হল কচ্ছ, বনসকাঁথা, আমেদাবাদ, আনন্দ, জামনগর, জুনাগড়, খেদা, পাঁচমহল, পোরবন্দর, রাজকোট, সুরেন্দ্রনগর, ভালসাদ, গান্ধীনগর, দাহোদ, মাহসানা, পাটন, সবরকাঁথা। শস্য নষ্ট হওয়ায় এই সব জেলায় কাজের সুযোগ কমে যাবে।

● **রাজস্থান ঃ** শতাব্দীর নিকৃষ্টতম খরা ২০০২-৩ সালে ৩২টি জেলাকে আক্রান্ত করে। সমগ্র রাজ্যে জলের চরম অভাব দেখা দেয়।

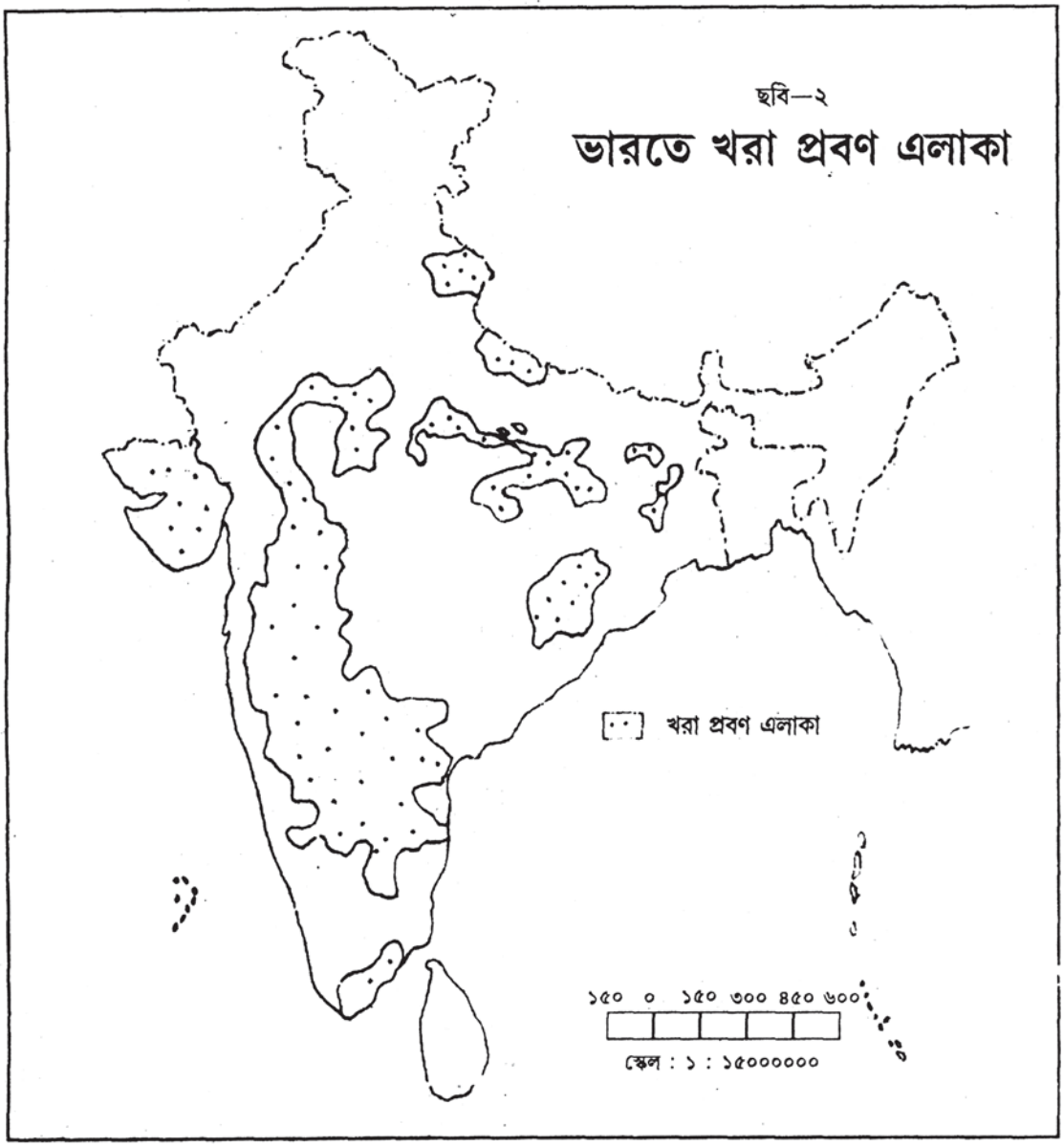

3.4.5 অনুশীলনী

১। 'হ্যাঁ বা 'না' উত্তর দিন ঃ

(ক) দীর্ঘ সময়ের স্বল্প বৃষ্টিতে বন্যা হয়।

(খ) পলল ব্যজনীতে নদীপথ প্রায়ই পরিবর্তিত হয়।

(গ) বনবিনাশের ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় হ্রাস পায়।

২। সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) কৃত্রিম বাঁধ দেওয়ার ফলে —— পলল অবক্ষেপ হয়। (নদীগর্ভে/হ্রদে)

(খ) উত্তরপূর্ব ভারত —— হওয়ায় নদী গতিপথ পরিবর্তিত হয়। (ভূমিকম্পপ্রবণ/খরাপ্রবণ)

(গ) নিকাশী ব্যবস্থার —— ফলে বন্যা হয়। (উন্নতির/অবক্ষয়ের)

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) বন্যাপ্রবণ এলাকা কোন কোন বিশেষ ধরনের এলাকায় বেশী দেখা যায়?

(খ) বনবিনাশের সঙ্গে বন্যার সম্পর্ক কি?

(গ) কৃত্রিম বাঁধ ও বন্যার মধ্যে সম্পর্ক কি?

উত্তরমালা

১। (ক) না (খ) হ্যাঁ (গ) না

২। (ক) নদীগর্ভে (খ) ভূমিকম্পপ্রবণ (গ) অবক্ষয়ের

৩। (ক) 3.3.1 অংশ দেখুন (খ) 3.3.2.1 অংশ দেখুন (গ) 3.3.2.2. অংশ দেখুন

অনুশীলনী

১। হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর দিন ঃ

(ক) উদক খরা ও কৃষি খরা একই সঙ্গে একই সময়ে হয়।

(খ) ভিন্ন ভিন্ন শস্যের জলের প্রয়োজন ভিন্ন।

(গ) দৈনিক উর্দ্ধতম বৃষ্টিপাত খরা চিহ্নিতকরণে ব্যবহার করা হয়।

২। বন্ধনী থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিন ও বাক্য সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) এল নিনো সময়ে (দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে/দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে) বৃষ্টিপাত বেশী হয়।

(খ) বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণ দ্বারা 'খরা' সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয় কারণ ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের গড় (এক/ভিন্ন) হয়।

৩। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :**

(ক) ভূমির ব্যবহার ও উদক খরার সম্পর্ক কি?

(খ) ভারতে বিভিন্ন এলাকায় খরা আসার প্রবণতা কেমন?

উত্তরমালা :

১। (ক) না (খ) হ্যাঁ (গ) না

২। (ক) দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে (খ) ভিন্ন

৩। (ক) 3.4.1 অংশ দেখুন

(খ) 3.4.4 অংশ দেখুন।

3.5 মৃত্তিকা অবক্ষয়ের ধারণা (Concept of Soil Degradation)

মৃত্তিকা শিলামণ্ডলের উপরিস্থিত এক স্তর। মৃত্তিকার অজৈব অংশ হল শিলার চূর্ণ। মৃত্তিকার মধ্যে জৈব পদার্থ যেমন প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহাবশেষ থাকে। মৃত্তিকার মধ্যে বায়ু ও জল থাকে।

মৃত্তিকা কৃষিকাজের স্থল ও চারণভূমি হিসাবে মানুষের খাদ্য যোগান দেয়। মৃত্তিকা ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের আবাসস্থল। মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে। মৃত্তিকার গুণগত মান হল মৃত্তিকার উদ্ভিদ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য যোগান দেওয়ার ক্ষমতা। মৃত্তিকার গুণগত মানের হ্রাস ও পরিমাণ হ্রাসকে মৃত্তিকা অবক্ষয় বলা হয়। মৃত্তিকার গভীরতা হ্রাস, মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদান হ্রাস, মৃত্তিকার লবণায়ন মৃত্তিকা অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক।

বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকায় ও বিভিন্ন জলবায়ু অবস্থায় মৃত্তিকার অবক্ষয়ের মাত্রা বিভিন্ন হয়। নানা ধরনের অবক্ষয় হল নিম্নরূপ—

3.5.1 মৃত্তিকা ক্ষয় :

মৃত্তিকার কণা বিচ্ছিন্ন হয়ে জল ও বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হলে মৃত্তিকা ক্ষয় ঘটে। জল দ্বারা মৃত্তিকা বিচ্ছিন্নকরণ ও পরিবহণ মূলতঃ তিন ভাবে ঘটে।

3.5.1.1 বৃষ্টির জলের তোড় :

বৃষ্টির জল মাটির উপর এসে পড়লে, মাটির দানাগুলি ভেঙে যায়। এই দানাগুলি ছিটিয়ে গিয়ে

মাটির মধ্যে ছিদ্রগুলিকে ঢেকে দেয়। ঐ ছিদ্র দিয়েই জল চুঁইয়ে নামতে পারত। ছিদ্রগুলি ঢেকে যাওয়ায় জল চোঁয়ানোর পরিমাণ কমে জলধারার পরিমাণ বাড়ে ও ক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

বৃষ্টির জলের তোড়ে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হবে তা নিম্নোক্ত উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে—

(ক) ঢাল—ঢাল যত বেশী হবে, বৃষ্টির জলের ফোঁটায় মৃত্তিকার ক্ষয়ক্ষতি তত বেশী হবে।

(খ) বায়ুর দিক—যদি বায়ু ঢাল বেয়ে নেমে আসে তবে ক্ষয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী হবে।

(গ) উদ্ভিদ আচ্ছাদন—উদ্ভিদ আচ্ছাদন না থাকলে ক্ষয় অনেক বেশী হবে। উদ্ভিদ আচ্ছাদন বৃষ্টির জলের গতিকে কিছুটা প্রতিহত করে।

3.5.1.2 চাদর ক্ষয়

বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি হবার পর বৃষ্টির জল মৃত্তিকার কণাগুলিকে একসাথে চাদরের মত সরিয়ে নিয়ে যায়। কোনো জায়গায় কতটা চাদর ক্ষয় হবে তা নিম্নোক্ত উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে—

(ক) ঢাল—ঢাল যত বেশী হবে, চাদর ক্ষয় তত বেশী হবে।

(খ) জলবায়ু—ভারী বর্ষণযুক্ত এলাকায় চাদর ক্ষয় বেশী হয়।

(গ) মৃত্তিকার গুণাবলী—মৃত্তিকার উপরিস্তর যদি অগভীর হয় আর ঠিক নীচে যদি ঘন কম প্রবেশ্যতাযুক্ত মৃত্তিকা থাকে তবে চাদর ক্ষয় বেশী হতে পারে। যে যে মৃত্তিকায় কর্দম বেশী, জৈব পদার্থ কম, সেই সেই মৃত্তিকায় চাদর ক্ষয় বেশী হয়।

(ঘ) উদ্ভিদ আচ্ছাদন—অনাচ্ছাদিত মৃত্তিকায় চাদর ক্ষয় অধিক হয়।

3.5.1.3 জলনালিকা ক্ষয়

জলধারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রবাহ পথের মধ্য দিয়ে মৃত্তিকা ক্ষয় করে চলে। এগুলি অস্থায়ী প্রবাহপথ। জমিতে বয়ে যাওয়া জল ছোট ছোট গর্ত তৈরী করে। এই গর্ত ক্রমে গভীর হয়ে জলনালিকা সৃষ্টি করে। জলনালিকা খুব দ্রুত ক্ষয় করে। যে সব এলাকায় প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হয়, মৃত্তিকার শোষণ ক্ষমতা কম, কর্দম মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের দুর্বল আচ্ছাদন সেইসব এলাকায় জলনালিকা ক্ষয় হয়।

3.5.1.4 সংকীর্ণ নালিকা ক্ষয়

বৃষ্টিপাতের মাত্রা এবং জলধারার গতি বৃদ্ধি পেলে প্রবাহপথ গভীর হয়ে ওঠে। জলনালিকাগুলি সংকীর্ণ নালিকায় রূপান্তরিত হতে পারে। কৃষিজমিতে মানুষ ও গবাদি পশুর যাতায়াতের ফলে পথ তৈরী হয়। এই পথগুলিতে বর্ষার জল এসে আরও গভীর সংকীর্ণ নালিকা তৈরী হয়ে যায়। সংকীর্ণ নালিকা ক্ষয় নিম্নলিখিত অবস্থার উপর নির্ভর করে যথা—

(ক) শিলা ও মৃত্তিকার ক্ষয়প্রবণতা

(খ) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বন্টন ও মাত্রা

(গ) উদ্ভিদ আচ্ছাদনের প্রকৃতি ও অবস্থা

(ঘ) ভূ-প্রকৃতি ও ভূমির ঢাল

সংকীর্ণ নালিকা ক্ষয়ের চারটি পর্যায় ভারতীয় উদাহরণ থেকে নেগি লক্ষ্য করেছেন। পর্যায়গুলি এইরকম ঃ-

- প্রথম পর্যায়—মৃত্তিকার উপরিস্তর জলধারা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং নির্দিষ্ট গতিপথ তৈরী হয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়—সংকীর্ণ নালিকা মস্তক ক্ষয় করতে থাকে।
- তৃতীয় পর্যায়—সংকীর্ণ নালিকার আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- চতুর্থ পর্যায়—অবক্ষয় বৃদ্ধি পায় ও উৎখাত ভূমিরূপ তৈরী হয়। সংকীর্ণ নালিকার জালিকা সৃষ্টি হয়।

গুজরাতে মাহী অববাহিকায় সংকীর্ণ নালিকার প্রকৃতি লক্ষ্য করে সংকীর্ণ নালিকা শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে (দত্ত ১৯৮৬)। শ্রেণীগুলি এই রকম—

শ্রেণী	বৈশিষ্ট্য
প্রথম শ্রেণী-খুব ছোট সংকীর্ণ নালিকা	৩ মিটারের মত গভীরতা, প্রসার সর্বাধিক ১৮ মিটার
দ্বিতীয় শ্রেণী-ছোট সংকীর্ণ নালিকা	৩ মিটারের মত গভীরতা, প্রসার ১৮ মিটারের বেশী
তৃতীয় শ্রেণী-সংকীর্ণ নালিকা (মাঝারি)	গভীরতা ৩ মিটার থেকে ৯ মিটার, প্রসার ১৮ মিটার ন্যূনতম
চতুর্থ শ্রেণী-বৃহৎ সংকীর্ণ নালিকা	গভীরতা ৩-৯ মিটার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৯ মিটারের বেশী, প্রসার ১৮ মিটারের বেশী, পার্শ্ব ঢাল প্রায় লম্ব

ক্ষয়ের চরম পর্যায়ে উৎখাত ভূমিরূপ তৈরী হয়। উদ্ভিদ আচ্ছাদন পশুচারণের ফলে নষ্ট হলে, বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে নষ্ট হলে, খরার প্রকোপ বাড়লে, উৎখাত ভূমিরূপ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। চম্বল অববাহিকায় মূলতঃ মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে উৎখাত ভূমিরূপ তৈরী হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের গনগনি এলাকাতেও উৎখাত ভূমিরূপ রয়েছে।

3.5.1.3 বায়ুর দ্বারা ক্ষয়

বায়ু প্রধানতঃ শুষ্ক সমতল ও ঢালু অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয় করে থাকে। আর্দ্র অঞ্চলেও জলের সঙ্গে সঙ্গে বায়ু ক্ষয়কার্য করে থাকে। যে জমিতে উদ্ভিদ আচ্ছাদন নেই বা খুবই কম সেখানে বায়ুর ক্ষয় বেশী

হয়। দ্রুত বেগে বয়ে চলা বায়ু মৃত্তিকার পৃথক হয়ে আসা কণাগুলিকে শীঘ্র পরিবহণ করে নেয়। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ এর মধ্যে উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ক্ষয়ের ফলে 'ধূলা এলাকা' বা 'ধূলাবাটি' (Dust Bowl) তৈরী হয়েছিল।

3.5.2 মৃত্তিকা ক্ষয়ের কারণসমূহ (Causes of Soil Erosion)

মৃত্তিকা ক্ষয়ের কারণসমূহকে বিভিন্ন গবেষকগণ 'সাধারণ মৃত্তিকা ক্ষয়' (Universal soil loss) সমীকরণ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন—

মৃত্তিকা হ্রাস $= R \times K \times LS \times C \times P$

R- বৃষ্টিপাতের ক্ষয়ক্ষমতার সূচক

K-মৃত্তিকার ক্ষয়ত্ব যোগ্যতার সূচক

LS-ঢালের দৈর্ঘ্য ও নতি

C-ভূমি আচ্ছাদনকারী উদ্ভিদ ও শস্যের সূচক

P-ভূমি সংরক্ষণকারী পদক্ষেপের সূচক

R-বৃষ্টিপাতের ক্ষয় ক্ষমতা—খুব স্বল্প সময়ের জন্য অধিক বৃষ্টিপাত মৃত্তিকা ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে। দীর্ঘ সময়ের হাল্কা বৃষ্টিপাতের তুলনায় স্বল্প সময়ের অধিক বৃষ্টিপাত মৃত্তিকা কণাকে পৃথক করতে বেশী কার্যকরী। দীর্ঘ শুষ্ক ঋতুর পর বর্ষা এলেও মৃত্তিকা ক্ষয় বৃদ্ধি পায় কারণ অনাচ্ছাদিত চাষের জমি খুবই দুর্বল হয়ে থাকে।

K-মৃত্তিকার ক্ষয় যোগ্যতা—মৃত্তিকার ভৌত ধর্ম অনুসারে মৃত্তিকার ক্ষয় হয়। মৃত্তিকার গঠন ও গ্রথণ মৃত্তিকার জলা চুঁইয়ে নামার প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকার মধ্যে যত বেশী জল চুঁইয়ে নামবে, তত কম জল ভূপৃষ্ঠ বেয়ে যাবে এবং তত কম মৃত্তিকা ক্ষয় হবে। মৃত্তিকায় সূক্ষ্ম পদার্থ কম হলে জল সহজেই মৃত্তিকা চুঁইয়ে নামে। মৃত্তিকার গ্রথণ ভারী হলে অর্থাৎ সূক্ষ্ম পদার্থ বেশী থাকলে জল মৃত্তিকার গভীরে প্রবেশ না করে ভূপৃষ্ঠ দিয়ে বয়ে যায় ও ক্ষয় বেশী হয়। মৃত্তিকার গঠন মৃত্তিকার জল চোঁয়ানোর ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মৃত্তিকার কণাগুলি ভৌত ও রাসায়নিক উপায়ে গুটি বা ped সৃষ্টি করে। গুটিদার মৃত্তিকার জল চুঁইয়ে মাটির গভীরে প্রবেশ করে। গুটি সৃষ্টি না হলে মৃত্তিকার অনুরন্ধ্রগুলি আবদ্ধ হয়ে যায় ও জল চুঁইয়ে নামার সম্ভাবনা কমে যায়। তখন জলনির্গমন বেশী হয় ও মৃত্তিকা ক্ষয় বেশী হয়। মৃত্তিকার উপরিস্তরে জৈব পদার্থ থাকে। হঠাৎ বৃষ্টির ধাক্কাকে জৈব পদার্থ প্রতিহত করে নীচের স্তরের মৃত্তিকাকে রক্ষা করে থাকে।

LS-ভূমির ঢালের দৈর্ঘ্য ও নতি—অধিক ঢাল যুক্ত ভূমিতে জল দ্রুত নীচে নামে এবং মৃত্তিকায় ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। বর্ষার জল সূক্ষ্ম পদার্থ ও মৃত্তিকাকে সম্পৃক্ত করে কর্দম প্রবাহের সৃষ্টি করে। ঢাল কম হলে জলের প্রবাহের গতি কম হয় ও মৃত্তিকা ক্ষয় কম হয়।

C-ভূমি আচ্ছাদনকারী উদ্ভিদ—ভূমি আচ্ছাদনকারী উদ্ভিদ ও দীর্ঘমূলযুক্ত শস্য মৃত্তিকার দানাকে বেঁধে রাখে, সহজে বায়ু বা জল দানাগুলিকে পৃথক করতে পারে না। বন ধ্বংস হলে বা চাষ আবাদ না হলে মৃত্তিকা উন্মুক্ত হয়ে যায় ও সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শস্য আবর্তন মৃত্তিকা ক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

P-ভূমি সংরক্ষণকারী পদক্ষেপের সূচক—মৃত্তিকা ক্ষয়রোধের জন্য মানুষ ব্যক্তিগত ও মিলিত উদ্যোগ নিয়ে থাকে। পাহাড়ী এলাকায় ধাপচাষ বরাবর চাষ, ধাপ চাষ, মালভূমি এলাকায় ফিতার আকারে জমি তৈরি করে চাষ করলে মৃত্তিকা ক্ষয় কম হয়। ভূমির ঢালের উপর ফিতার প্রস্থ নির্ভর করে। অধিক ঢালযুক্ত জমিতে ফিতা সংকীর্ণ হয়। দুটি ফিতা আকারের চাষজমির মধ্যে একটি নালা থাকে, এর মাধ্যমে অতিরিক্ত জল নিকাশ হয়।

3.5.3 মৃত্তিকার মরুকরণ

শুষ্ক, প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণ ও মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে মৃত্তিকার অবক্ষয়কে মরুকরণ বলে। জলবায়ুর পরিবর্তন, খরার প্রাধান্য, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা মরুকরণের কারণ। মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে মরুকরণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত পশুচারণ, জ্বালানীর জন্য ও চাষের জন্য বনানী অপসারণ মরুকরণ হতে সাহায্য করে।

যখন অতিরিক্ত পশুচারণের ফলে বা বনানী অপসারণের ফলে মৃত্তিকা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, মৃত্তিকা ক্ষয় বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকা ক্ষয়ের গতি বা মাত্রা মৃত্তিকা সৃজনের মাত্রার থেকে বেশী হলে মৃত্তিকার উপরিভাগ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। তখন মৃত্তিকা উর্বর হয়ে যায়। এই অবস্থায় পুনরায় বনসৃজন অসম্ভব হয়। প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টির জলের অধিকাংশ নির্গমন হয়ে যায়। জলস্তর ধীরে ধীরে এত নীচে নেমে যায় যে ঝোপঝাড়ের দীর্ঘ শিকড়গুলিও ভৌমজলস্তরের নাগাল পায় না। অনেক পশুচারণের ফলে পশুর চলাফেরায় মৃত্তিকায় চাপ পরে, মাটির মধ্যে জল ও হাওয়ার গতিপথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসে। যখন উদ্ভিদ আচ্ছাদন বিনষ্ট হয় ও মৃত্তিকার জল খুবই কমে আসে তখন মরুকরণ হয়।

3.5.4 মৃত্তিকার উপরিস্তর কঠিন হয়ে যাওয়া

অনেক সময় সাভানা তৃণভূমির গাছ ও ঝোপঝাড় পুড়িয়ে ফেলা হয়। এক্ষেত্রে প্রচুর জৈব পদার্থ ছাই, ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যায়। ভারী বর্ষণ হলে প্রচুর ছাই বৃষ্টির জলে বয়ে চলে যায়। আগুনের তাপে

মাটির কীটানু জীবাণুও মারা যায়। এর ফলে মৃত্তিকার উপরিস্তর খুব কঠিন হয়ে যেতে পারে। যান্ত্রিক কৃষিতে চাষের আগে যন্ত্র দিয়ে উদ্ভিদ আচ্ছাদন নষ্ট করা হলে যন্ত্রের চাপে মৃত্তিকার প্রবেশ্যতা প্রায় ৭০% কমে যায়।

3.5.5 মৃত্তিকার জৈব পদার্থ হ্রাস

শস্য, দানাশস্য, পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত ঘাস অপসারিত হলে, অতিরিক্ত পশুচারণ হলে মৃত্তিকার জৈব পদার্থ কমে যায়। শুষ্ক পরিবেশে জৈব পদার্থ কমে আসলে মৃত্তিকার ক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

3.5.6 জলসেচ ও লবণায়ন

নদী থেকে আসা খাল এবং ভৌমজল ব্যবহারকারী কূপের মাধ্যমে জলসেচ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিগত কয়েক দশকে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে জলসেচের কুপ্রভাব হল লবণায়ন। বিশেষ করে শুষ্ক এলাকায় জমিতে সেচের জল ঐ মৃত্তিকার কিছু লবণকেও দ্রবীভূত করে ফেলে। সেচের জল স্বাভাবিক নিয়মে বাষ্পীভূত হলে মৃত্তিকার উপরিস্তরে লবণের স্তর রয়ে যায়। যদি জলনিকাশী ব্যবস্থা সুচারু না হয়, লবণায়ন পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হয়।

3.5.7 মাটি বসে যাওয়া

জৈব পদার্থ পুষ্ট মৃত্তিকা অতিরিক্ত সেচের সময় বসে যায়। এর ফলে কৃষি উৎপাদনের হার কমে যায়।

3.5.8 দূষণ

শিল্প বা পৌর এলাকার বর্জ্য পদার্থ জমা হয়ে মৃত্তিকার গুণাবলী নষ্ট হয়। মৃত্তিকায় অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, বায়ুবাহিত দূষণকারী পদার্থ, অতিরিক্ত সার প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে মৃত্তিকা দূষিত হয়।

3.5.9 অম্লকরণ

উপকূলবর্তী এলাকায় পাইরাইট যুক্ত মৃত্তিকায় জল জমে যাওয়ার ফলে অম্লকরণ হয়। অতিরিক্ত সার প্রয়োগের ফলে বা দূষণকারী বস্তুর প্রভাবেও অম্লকরণ হতে পারে।

3.5.10 মৃত্তিকা অবক্ষয় :- অনুশীলনী

১। 'হ্যাঁ' অথবা 'না' এ উত্তর দিন :

(ক) ঢাল যত বেশী হয়, বৃষ্টির জলের ফোঁটায় মৃত্তিকার ক্ষয় ক্ষতি তত বেশী হয়।

(খ) ভারী বর্ষণযুক্ত এলাকায় চাদর ক্ষয় বেশী হয়।

(গ) জলনালিকা খুব ধীরে ক্ষয় করে।

২। বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিন ও শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) পাহাড়ী এলাকায় —— বরাবর চাষ করলে মৃত্তিকা ক্ষয় কম হয়। (সমোন্নতি/উপত্যকা)

(খ) বর্ষার জল মৃত্তিকাকে —— করে কর্দম প্রবাহের সৃষ্টি করে। (সম্পৃক্ত/উন্মুক্ত)

(গ) —— কুপ্রভাব হল লবণায়ন। (জলসেচের/বনবিনাশের)

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

(ক) মৃত্তিকার অম্লকরন কিভাবে হয়?

(খ) মৃত্তিকার লবণায়ন কিভাবে হয়?

(গ) মৃত্তিকা ক্ষয়ের নিয়ন্ত্রকগুলির নাম লিখুন।

(ঘ) মৃত্তিকার উপরিস্তর কঠিন হয়ে যায় কেন? সাভানা এলাকার উদাহরণ দিয়ে লিখুন।

3.5.11 উত্তরমালা

১। (ক) হ্যাঁ (খ) হ্যাঁ (গ) না।

২। (ক) সমোন্নতি (খ) সম্পৃক্ত (গ) জলসেচের

৩। (ক) 3.5.9 অংশ দেখুন (খ) 3.5.6 অংশ দেখুন (গ) 3.5.2 অংশ দেখুন (ঘ) 3.5.4 অংশ দেখুন।

3.6 বর্জ্য (Waste)

বর্জ্য কি ?

বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ও গৃহস্থালীর কাজের ফলে নানা জৈব ও অজৈব পদার্থ নির্গত হয় যাদের আমরা আর ব্যবহার করতে চাই না, তাদের বর্জ্য বলি। বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের অবশেষ, পড়ে যাওয়া পাতা, পচন ধরে যাওয়া ফুল, ফল, রেচন পদ্ধতিতে নির্গত জৈবও বর্জ্য।

3.6.1 বর্জ্যের প্রকারভেদ

উৎস অনুসারে বর্জ্য কয়েক প্রকার—

(ক) গার্হস্থ্য—গৃহে উৎপন্ন বর্জ্য। যেমন রান্নাঘরের নানা আবর্জনা, সবজি, মাছ মাংসের অবশেষ, কাগজ, নানা ধরনের টিন, বোতল, ফুরিয়ে যাওয়া ব্যাটারী ইত্যাদি।

(খ) শিল্পজাত—শিল্পে উৎপাদনের সময় নানা রাসায়নিক রঙ, বালি, নানা ধাতব পদার্থ, ছাই, তরল বর্জ্য নির্গত হয়। এর মধ্যে বেশ কিছু বর্জ্য পদার্থ বিষাক্ত ও ক্ষয়কারী।

(গ) কৃষিজাত—কৃষিক্ষেত্রে নানা বর্জ্য উৎপন্ন হয়। যেমন খড়কুটো, শস্যের ঝাড়াই এর পর পরে থাকা কুঁড়ো, সার ইত্যাদি।

(ঘ) বিবিধ—হাসপাতাল ও যুদ্ধক্ষেত্রের বর্জ্য

(ঙ) আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আণবিক গবেষণাগার জাত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য।

3.6.2 বিপজ্জনক বর্জ্য

সব বর্জ্য সমান বিপজ্জনক নয়। বিপজ্জনক বর্জ্য মানুষ, পশুপাখী, উদ্ভিদ বা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী আবার কখনও কখনও তাৎক্ষনিক ক্ষতি সাধন করে।

3.6.2.1 বিপজ্জনক বর্জ্যের বৈশিষ্ট্য হল নিম্নরূপ ঃ

- বর্জ্যের মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী, কোষ বৈশিষ্ট পরিবর্তনকারী যৌগ থাকে। যেমন নানা দ্রাবক, কীটনাশক।
- সহজে দাহ্য, যেমন গ্যাসোলিন, রঙ, নানা দ্রাবক।
- এই সব বর্জ্য থেকে বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গত হতে পারে।
- এই সব বর্জ্য থেকে বিস্ফোরণ হতে পারে, যেমন নানা অম্ল, ক্ষারকীয় পদার্থ, ব্লিচ ইত্যাদি।
- এই বর্জ্য ক্ষয় করতে পারে নানা ধাতুকে।

3.6.2.2 বিপজ্জনক বর্জ্যের উৎস

ধাতু শিল্প, যানবাহন মেরামতি কারখানা, পেট্রোল পাম্প, ধোবাখানা, রঙ কারখানা, ছাপাখানা, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, পশু চিকিৎসাগার থেকে নানা বিপজ্জনক বর্জ্য নির্গত হয়। রঙ কারখানা থেকে নানা ধাতু, দ্রাবক ও বিষাক্ত তরল বর্জ্য নিঃসৃত হয়। ছবি তৈরীর কেন্দ্র থেকে জৈব রাসায়নিক, ক্রোমিয়াম যৌগ, ফসফেট ও অ্যামোনিয়াম যৌগ নির্গত হয়। গৃহস্থলীর সব বর্জ্য নিরাপদ নয়। ব্যাটারী, রঙ, ঘরদোর পরিষ্কার করার নানা রাসায়নিক বিপজ্জনক বর্জ্যের অন্তর্গত। আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র এবং আণবিক গবেষণাগার থেকে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপাদিত হয়। এই বর্জ্য তরল বা কঠিন হতে পারে। তেজস্ক্রিয়তা পরিবেশ ও মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে।

3.6.3 তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের শ্রেণীবিভাজন

ব্রিটিশ নিউক্লিয়ার ফুয়েলস্ এর তরফ থেকে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে। এই বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

তেজস্ক্রিয় বর্জ্য	উৎস
নিম্ন পর্যায়ের বর্জ্য	নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর শীতল করা জল, তেজস্ক্রিয় পদার্থের কাছাকাছি ব্যবহৃত দস্তানা, কাগজের তোয়ালে, পরিত্যক্ত রিঅ্যাক্টর থেকে আসা সামগ্রী
মাঝারি পর্যায়ের বর্জ্য	বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত ঘন তরল পদার্থ, দূষিত যন্ত্রপাতি
উচ্চ পর্যায়ের বর্জ্য	ব্যবহৃত ও পুরোনো পারমাণবিক অস্ত্র, রিঅ্যাক্টরের অংশ

3.6.4 কঠিন বর্জ্য সমস্যা ঃ

পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য সমস্যা ভয়াল আকার ধারণ করেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মতে (২০০০)—

(ক) প্রতিদিন ভারতে ০.১ মিলিয়ন টন পৌর কঠিন বর্জ্য উৎপাদিত হয়।

(খ) ভারতে মাথাপিছু পৌরবর্জ্য উৎপাদন ০.২ কিলোগ্রাম থেকে ০.৬ কিলোগ্রাম।

(গ) প্রতি পৌর সংস্থা প্রতি টন কঠিন বর্জ্য প্রতি ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা ব্যয় করে। এই ব্যয়ের ৬০-৭০% বর্জ্য সংগ্রহে, ২০-৩০% পরিবহনে ও ৫% বর্জ্য নিষ্কাশনে ব্যবহার হয়ে যায়।

(ঘ) ভারতের বিভিন্ন শহরে বর্জ্য সংগ্রহের মাত্রা ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সমীক্ষার পর যেসব সিদ্ধান্তে পৌছোচ্ছেন তা হল ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ভারতীয় আবর্জনার কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে যেমন,

(ক) জৈব বর্জ্যর উৎপাদন ৪০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ হয়ে দাঁড়াবে

(খ) প্লাস্টিক বর্জ্যর পরিমাণ ৪ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ হবে

(গ) ধাতব বর্জ্যর পরিমাণ ১ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশ হবে

(ঘ) কাঁচের পরিমাণ ২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ হবে

(ঙ) বর্জ্যের কাগজের পরিমাণ ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ হবে

(চ) ছাই, বালি, কাঁকরের পরিমাণ সমগ্র বর্জ্যের ৪৭ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ হয়ে যাবে।

3.6.5 বর্জ্য নিষ্কাশন ও পরিচালন ব্যবস্থা

জীবনযাত্রার মান যতই বাড়তে থাকে বা উন্নত হতে থাকে ততই আবর্জনা বা বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবর্জনার পরিমাণ এত বেশী যে শহরে আবর্জনা ব্যবস্থাপন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৮ সালে সর্বোচ্চ আদালত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্বন্ধে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে 'বর্মেন কমিটি' নিয়োগ করেন। ২০০০ সালে 'বর্মন কমিটি'র সুপারিশে কিছু নীতি গৃহীত হয়েছে। দেশের সব পৌর সংস্থাকেই বর্জ্য সংস্থাপনের সময়ানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্তমানে হাডকো এবং নাবার্ড এই ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করছে।

3.6.5.1 বর্জ্য নিষ্কাশনের উপায় ও সমস্যা

(ক) জৈবভঙ্গুর বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরী করা হয়। মাটিতে নিয়মিত জৈবভঙ্গুর বর্জ্য ফেলা হয়। জীবাণুর সাহায্যে বা কেঁচোর সাহায্যে জৈবভঙ্গুর বর্জ্যকে সারে রূপান্তরিত করা হয়।

(খ) কঠিন বর্জ্যকে অনেক সময় ভস্মীভূত করা হয়। এর দ্বারা বায়ু দূষণ হয়। প্লাস্টিক পোড়ালে ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হয়।

(গ) মাটিতে বর্জ্য পুঁতে ফেলার পদ্ধতিকে 'জমিভরাট' বলা হয়। খাদের নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলে তার উপর মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। বর্জ্যতে বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য বা অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ থাকলে জমি ভরাট করার ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। মাটির মধ্যেকার জীবাণু আবর্জনার ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। অবাত পরিবর্তনের ফলে পৌর আবর্জনা থেকে বায়োগ্যাস তৈরী হতে পারে। এই গ্যাস পরবর্তীকালে ফাটলের মধ্য দিয়ে সরে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। এই গ্যাস বার করার জন্য চিমনি গোছের থাকে। এর মাধ্যমে বায়োগ্যাস নিষ্কাশন করে ব্যবহৃত হতে পারে।

তবে মাটি ভরাট করার সময় যথেষ্ট সাবধান না হলে বর্জ্য নিঃসরণ হয়ে ভৌম জলাধার দূষিত হতে পারে।

3.6.5.2 সুস্থায়ী বর্জ্য নিষ্কাশন বা পরিচালন ব্যবস্থা

সুস্থায়ী বর্জ্য নিষ্কাশন বা পরিচালন ব্যবস্থার কিছু নীতি আছে যেমন ঃ

(ক) বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস—আবর্তন বা পুর্ব্যনবহার করে বর্জ্য পরিমাণ হ্রাস করাতে হবে। যেমন খবরের কাগজ থেকে নিউজপ্রিন্ট তৈরী, পুরোনো খবরের কাগজ থেকে কার্ডবোর্ড তৈরী। পুনশ্চক্রায়ন দ্বারা বিভিন্ন ধাতু যেমন অ্যালুমিনিয়াম, লোহা ফের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়। পুনর্ব্যবহার আইন করে বাধ্যতামূলক করা যায়। যে শিল্প প্রতিষ্ঠান মোড়ক বা বোতলে তার উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করছেন, সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানই ঐ সব মোড়ক বা বোতল খরিদ করে নিতে বাধ্য থাকবেন।

(খ) বর্জ্য পরিবহণ ও সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত কর বসানো—গৃহ এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই কর বসানো হলে নাগরিকরা সচেতন ভাবে বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস করবেন।

(গ) শিক্ষণ ও স্বেচ্ছামূলক আচরণ—ক্রেতা সাধারণকে বর্জ্য বিষয়ে সচেতন করে তোলা সম্ভব। তারপর স্বেচ্ছামূলক আচরণ দ্বারাই বর্জ্য অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠবে।

(ঘ) কারিগরী—প্রয়াস দ্বারা বর্জ্যকে প্রথমেই পৃথকীকরণ করে নেওয়া প্রয়োজন। যে বর্জ্য পুর্ব্যনবহারযোগ্য তাকে পৃথক করে প্রথমেই পুর্ব্যনবহার কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। যে যে দ্রব্য পুনর্ব্যবহার বা পুনশ্চক্রায়ন সম্ভব নয়, সেগুলিই জমি ভরাটের জন্য ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে বর্জ্য খাদের উপর চাপ কমবে।

(ঙ) অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমুখী প্রয়াস—বর্তমানে পরিকাঠামো পুনর্বিন্যাসের জন্য বেসরকারী সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সাধারণ মানুষের সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন।

3.6.6.3 তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপন ঃ

নিম্নপর্যায়ের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি ব্যবস্থাপন করা হয়। অনেক সময় বিশেষ ধরনের পাত্রে বন্ধ করে এগুলি মাটির সামান্য নিচে পুঁতে দেওয়া হয়। ফিনল্যাণ্ডে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে এই নিম্ন পর্যায় ও মাঝারি পর্যায়ের বর্জ্য সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়।

উচ্চ পর্যায়ের বর্জ্য বিশেষতঃ আণবিক শক্তি মশাল (Nuclear fuel Rod) পুনশ্চক্রায়ন করা হয়। এর ফলে তরল তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিঃসৃত হয়। এই তরলকে কাঁচের মত দ্রব্যে রূপান্তরিত করা হয়।

উচ্চ পর্যায়ের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনের দীর্ঘকালীন সমাধান পাওয়া যায় নি। পুরনো আণবিক কেন্দ্রগুলির আয়ু শেষ হওয়ার মুখে, তাই এইসব কেন্দ্রগুলির ব্যবস্থাপন এক কঠিন সমস্যার উদ্রেক ঘটাবে।

3.7 দূষণ (Pollution)

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে সৃষ্ট কোনো দ্রব্য যদি পরিবেশের ক্ষতি করে তা হলে দূষণ হয়েছে বলা যায়। এই অংশে চার ধরনের দূষণ সম্পর্কে আলোচনা হবে—যথা বায়ুদূষণ, জলদূষণ, ভূমিদূষণ ও শব্দদূষণ।

3.7.1 বায়ুদূষণ (Air Pollution)

যদি বায়ুমণ্ডলে কিছু বস্তু এমন ভাবে মেশে যা বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে ও মানুষের ক্ষতি করে, তাহলে সেই অবস্থাকে বায়ুদূষণ বলা যায়। এই সব বস্তু মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে অথবা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হয়।

3.7.1.1. বায়ুদূষক-উৎস

উৎস অনুসারে বায়ু দূষকগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা—

(১) প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট

(২) মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে সৃষ্ট

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়ুদূষকগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) আগ্নেয়গিরি হতে উদ্গত ধূলি, ধোঁয়া, ছাই, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ

(খ) সবুজ উদ্ভিদ থেকে নির্গত বাষ্প, ফুলের পরাগ

(গ) সমুদ্র থেকে আসা লবণাক্ত ফেনা

(ঘ) স্থলভাগ থেকে ক্ষয়জাত ধূলিকণা

মানুষের ক্রিয়াকলাপের জন্য সৃষ্ট বায়ুদূষকগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) গার্হস্থ্য ক্রিয়ায় নির্গত বায়বীয় পদার্থ ও তাপ

(খ) যানবাহন, মূলতঃ বাষ্প ও খনিজ তেল চালিত যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়ায় গ্যাসীয় পদার্থ

(গ) গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্পকেন্দ্রের বর্জ্য জ্বালানোর সময় উৎপন্ন ধোঁয়া ও গ্যাসীয় পদার্থ

(ঘ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ

3.7.1.2 প্রকৃতি অনুসারে বায়ুদূষকগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়

(ক) গ্যাসীয় বায়ুদূষণ চার ধরনের গ্যাসকে প্রাথমিক বায়ুদূষক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যথা কার্বন

মনোঅক্সাইড (CO), সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন। এছাড়া অমোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), ক্লোরিন (Cl), ফ্লুরিন (Fl) ইত্যাদিও বিষাক্ত গ্যাস।

(খ) বায়ুতে প্রলম্বিত বা ভাসমান কণা জাতীয় পদার্থজনিত বায়ুদূষণ—বায়ুতে ভাসমান বিভিন্ন সূক্ষ্ম বা স্থূল কঠিন পদার্থ যেমন ধূলি, ছাই, বিভিন্ন ধাতব কণা, যাদের ব্যাসার্দ্ধ ১ মাইক্রন থেকে ১০ মাইক্রন, নানা জৈব পদার্থ যেমন ব্যাকটেরিয়া পরাগরেণু বায়ুদূষণ ঘটায়।

(গ) তেজস্ক্রিয় পদার্থজনিত বায়ুদূষণ—মৃত্তিকা থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা পারমাণবিক কেন্দ্র থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ুকে দূষিত করতে পারে।

3.7.1.3 বিভিন্ন বায়ুদূষক-তাদের উৎস ও বায়ুদূষণ

(ক) সালফার ডাই অক্সাইড : এই দূষকের উৎস হল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণ এবং জৈব ক্রিয়া। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, খনিজ তৈল শোধনাগার এবং যানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানী জ্বালালে এবং ধাতব গন্ধক পোড়ালে এই গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুতে গিয়ে মেশে। বড় অগ্ন্যুৎপাতের ফলে কিছুটা সালফার ডাই অক্সাইড স্ট্রাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত পৌছে যায়। এর ফলে ওজোন স্তরের হ্রাস ঘটে। সালফার ডাই অক্সাইড ও মানুষের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিম্নোক্ত সারণিতে দেখানো হল—

সালফার ডাই অক্সাইডের অস্তিত্ব একক প্রতি মিলিয়ন	আয়ুষ্কাল	ক্ষতি
০.০৩-০.৫	সারাক্ষণ	ব্রঙ্কাইটিস রোগীর অবস্থার দ্রুত অবনতি
০.৩-১.০	২০ সেকেন্ড	মস্তিষ্কের ক্ষতি
০.৫-১.৪	১ মিনিট	গন্ধ
১-৫	৩০ মিনিট	ফুসফুসে কষ্ট, গন্ধ পাওয়া যায় না
১.৬-৫	> ৬ ঘন্টা	নাসিকা ও ফুসফুসের পথ সংকীর্ণ হয়ে আসা
৫-২০	> ৬ ঘন্টা	ফুসফুসের ক্ষতি
>২০	> ৬ ঘন্টা	ফুসফুসে জল জমা, শেষ পর্যন্ত মৃত্যু

(খ) নাইট্রোজেন অক্সাইড : নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের প্রাথমিক দূষক। নাইট্রাস অক্সাইড বহুক্ষণ বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারে থাকে। ক্ষুদ্র প্রাণীরা

নাইট্রেট থেকে নাইট্রাস অক্সাইড তৈরী করে। যদি জলনিকাশী ব্যবস্থা দুর্বল হয় এবং সেই অবস্থায় মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার প্রয়োগ করা হয়, তবে নাইট্রাস অক্সাইড বেশী নির্গত হয়। জলাশয়ে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার ধুয়ে আসার ফলেও এই গ্যাস তৈরী হয়।

নাইট্রিক অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড দ্রুত অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে যৌগ তৈরী করে। মূলতঃ জৈব ভর দহন, জীবাশ্ম জ্বালানী দহন, জেট বায়ুযানের জ্বালানী থেকে এই গ্যাসগুলি উৎপন্ন হয়।

এই অক্সাইডগুলির রাসায়নিক ক্রিয়ায় অম্ল তৈরী হয়। এর প্রভাবে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ, ফুসফুসের ক্যান্সার, মাড়ির অসুখ হয়।

(গ) **মিথেন ও অন্যান্য হাইড্রোকার্বন :** বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়ায় মিথেন তৈরী হয়। ক্ষুদ্র প্রাণীরা বহু অবস্থায় যেমন জলাশয়ে এবং গবাদি পশুর খাদ্যনালীতে মিথেন তৈরী করে। এছাড়া কম তাপমাত্রায় জৈব পদার্থ দহন, বর্জ্য নিষ্কাশন ও খনিজ তৈল উৎপাদন, ধান উৎপাদনের ফলেও মিথেন তৈরী হয়। মিথেন দূষণের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। মিথেন ছাড়াও আইসোপ্রেন, α পিনেন ধরনের হাইড্রোকার্বন বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়। এছাড়াও যানবাহনের জ্বালানী দহনের ফলেও এইসব গ্যাস নিষ্কৃত হয়। এগুলি গ্রীনহাউস গ্যাস এবং এর ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটে।

(ঘ) **কার্বন-ডাই-অক্সাইড :** জীবদেহের শ্বাসপ্রক্রিয়া, নানা ধরনের দহনের দ্বারা এই গ্যাস নির্গত হয়। বনবিনাশের ফলে এই গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রে অম্লভাব বৃদ্ধি পাবে ও সামুদ্রিক প্রাণীদের ক্ষতি হবে।

(ঙ) **কার্বন মনোঅক্সাইড :** জীবাশ্ম জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহন, ডিজেল ও পেট্রোল চালিত যানবাহন, খনিজ তেল শোধনের ফলে এই গ্যাস নিষ্কৃত হয়। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। কার্বন মনোঅক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফলে শরীরের মূল অংশে স্বল্প অক্সিজেন পৌছোয়। এর ফলে নিঃশ্বাসপ্রক্রিয়া ব্যহত হতে পারে।

(চ) **ক্লোরোফ্লুরো কার্বন :** কার্বন, ক্লোরিন ও ফ্লুরিনের এই যৌগগুলিতে হাইড্রোজেনও থাকতে পারে। রেফ্রিজারেটর, বিভিন্ন স্প্রে, ফোম প্লাস্টিক, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, নানা প্রসাধন দ্রব্য থেকে এই ধরনের যৌগ নির্গত হয়। এগুলি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে পৌছে ওজোন স্তরের ক্ষতি করে। প্রতি বছর ১৩ থেকে ২৮ শতাংশ হারে এই সব যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওজোন স্তরের ক্ষতির ফলে ক্ষতিকারক অতি বেগুনী রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে সহজে পৌছোয়। এর ফলে ত্বকের ক্যান্সার হয় এবং নানা রোগের পরিপ্রেক্ষিতে মানব দেহের প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস পায়। অতি বেগুনী রশ্মি শস্য, বনসম্পদ ও স্বাদুজলের মাছের ক্ষতি করে

(ছ) ভাসমান পদার্থ ঃ বিগত শতকে বায়ুতে ভাসমান পদার্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। মৃত্তিকা ক্ষয়, সমুদ্রের জল ছিটিয়ে আসা, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে, জীবভর দহনের ফলে এই সব পদার্থ নির্গত হয়। জীবাশ্ম জ্বালানী দহনের ফলেও এইসব পদার্থ বায়ুতে গিয়ে মেশে। ধাতব ও অধাতব খনিজ উত্তোলনের ফলেও বিভিন্ন কণা নিঃসৃত হয়। এইসব পদার্থ মানুষের ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে। এগুলি এতই ছোট হয় যে মানুষের ফুসফুসে প্রবেশ করে রক্ত পরিবহণ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারে। বিশেষ করে কাঁচ, অ্যাসবেস্টস ও সীসার কণা বিশেষ ক্ষতি ডেকে আনে।

3.7.1.4 বায়বীয় দূষণের অন্যান্য ফলাফল

ধোঁয়াশা-ধোঁয়া কুয়াশা মিলে ধোঁয়াশা হয়। তাপমাত্রা বৈপরীত্য বিশেষ করে শীতের রাতে হয়, এর ফলে কুয়াশা হয়। এই কুয়াশা ভাসমান ধোঁয়া ধূলির চারপাশে জমা হয়ে ধোঁয়াশা তৈরী করে। এর মধ্যে সালফার ডাই অক্সাইড থাকলে ফুসফুসের কাজ ধীরে হয়। ফলস্বরূপ সহজেই ধোঁয়া, ধূলি, ময়লা ফুসফুসে

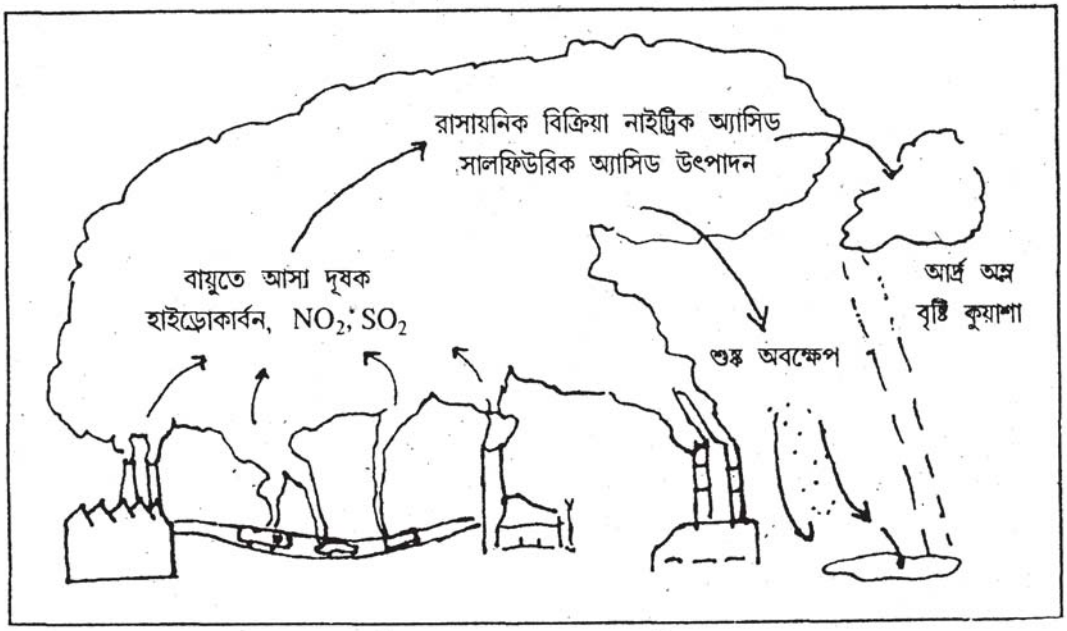

চিত্র বায়ু দূষণ ও অম্ল বৃষ্টিপাত

প্রবেশ করে। এছাড়া সালফার ডাই অক্সাইড জলের সঙ্গে মিলে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী করে। এই অ্যাসিডের জন্য খুব বেশী কাশি হয় ও শ্বাসরোধও হতে পারে। এই ধোঁয়াশা লণ্ডনে বেশী হয়, তাই একে লণ্ডন ধরনের ধোঁয়াশা বলা হয়।

নিম্ন অক্ষাংশে দিনের বেলায় যখন অনেক যানবাহন চলছে তখন এই ধোঁয়াশা হয়। হাইড্রোকার্বন

দহন অসম্পূর্ণ হলে বলডেহাইড সৃষ্টি হয়। পরে ধোঁয়াশা হয়। ধোঁয়াশায় থাকে PAN বা পেরক্সিএসিল নাইট্রেট, নাইট্রাস অক্সাইড। PAN এর জন্য উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়া কমে যায়। এভাবে শস্য উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। মানুষের শ্বসন প্রক্রিয়া ও দৃষ্টিশক্তি ব্যহত হয়। এই ধরনের ধোঁয়াশাকে লসএঞ্জেলস ধরনের ধোঁয়াশা বলা হয়।

অম্ল বৃষ্টিপাত ঃ যে বৃষ্টিপাতের PH অদূষিত বৃষ্টিপাতের থেকে কম বা ৫ এর কম, তাকে অম্ল বৃষ্টিপাত বলা হয়। দূষিত বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডের দ্বারা বৃষ্টিপাতের অম্লীকরণ হয়। এর ফলে উদ্ভিদের ক্ষতি হয়।

3.7.1.5 মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস

হঠাৎ অসাবধানতার কারণে বা যান্ত্রিক গোলযোগে কোনো শিল্পকেন্দ্র থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হতে পারে। ভোপালে ১৯৮৪ তে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে মোবিল আইসোসায়ানেট গ্যাস (MIC) নির্গত হয়েছিল। এর ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ৭০০০ এরও বেশী মানুষের মৃত্যু হয়।

3.7.2 জলদূষণ (Water Pollution)

পৃথিবীর ২/৩ অংশ জল। জলের ৯৭% রয়েছে সাগরে আর ১% রও কম আছে জলাশয় ও নদীতে। জলে কোনো দ্রব্য মিশে জলের ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন হয়ে মানুষ ও অন্যান্য জীব ও উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক অবস্থা তৈরী হলে জলদূষণ হয়েছে বলা হয়।

3.7.2.1 জল দূষণের উৎসসমূহ

মূলতঃ জলদূষণের দুই প্রকার উৎস আছে—

(ক) **প্রাকৃতিক উৎস ঃ** মৃত্তিকা ক্ষয়, ভূমিধ্বস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপীরণ, উদ্ভিদ ও জীব দেহের পচনের ফলে নদী ও জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণ দূষণকারী পদার্থ এসে পৌঁছোয়।

(খ) **মানুষের ক্রিয়াকলাপ ঃ** নগর এলাকায় গার্হস্থ্য ক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্র, গ্রামীণ এলাকার কৃষিক্ষেত্র থেকে প্রচুর দূষণকারী পদার্থ জলে গিয়ে মেশে। বিভিন্ন মেলাপার্বণের সময় এক জায়গায় অনেক মানুষের সমাগম, ভোজন, পূজাপার্বনের ফলে ব্যবহৃত দ্রব্যও অবশিষ্ট নদী বা হ্রদের জলে মিশে দূষণ ঘটায়।

3.7.2.2 জলদূষণকারী পদার্থের শ্রেণীবিভাগ

উৎসের ভিত্তিতে জল দূষণকারী পদার্থসমূহকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(ক) **কৃষিজাত দূষণকারী পদার্থ ঃ** রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক, আগাছা ও উদ্ভিদের অংশ বিশেষ জলকে দূষিত করে।

(খ) **শিল্পজাত দূষণকারী পদার্থ ঃ** শিল্পজাত রাসায়নিক দূষণ যেমন বিভিন্ন কার্বনেট, ক্লোরাইড, সালফাইড, ধাতব পদার্থ যেমন সীসা, পারদ, জিংক, আর্সেনিক, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য জলকে দূষিত করে।

(গ) **পৌরায়ণজনিত দূষণকারী পদার্থ ঃ** যানবাহন থেকে নিঃসৃত সালফেট, নাইট্রেট, নানাধরনের জীবাশ্ম জ্বালানী, মানুষ ও পশুর দেহাবশেষ থেকে নির্গত নাইট্রেট, ফসফেট, পৌরএলাকার অন্যান্য ময়লা জলদূষণ করে থাকে।

(ঘ) প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন দূষণকারী পদার্থের মধ্যে ধূলিকণা, আবহবিকার ও ক্ষয়, ভূমিধ্বস, জৈবপদার্থের পচনের ফলে নির্গত বহু পদার্থ জলদূষণ ঘটায়।

জলদূষণ দুই ভাবে ঘটতে পারে—

(ক) নির্দিষ্ট কোনো স্থান থেকে

(খ) অনির্দিষ্ট বৃহৎ এলাকা থেকে

নির্দিষ্ট উৎসের মধ্যে কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, তৈলখনি, কয়লাখনি, পয়ঃপ্রণালী উল্লেখ্য।

অনির্দিষ্ট বৃহৎ এলাকা থেকে জলদূষণ হয় যখন জল মাটির উপর দিয়ে বয়ে আসার সময় অনেক দূষিত পদার্থ বয়ে নিয়ে আসে। বায়ুমণ্ডলের দূষক পদার্থ ধোওয়া বৃষ্টিধারা, কৃষিক্ষেত্র দিয়ে বয়ে আসা জলধারা, শহরাঞ্চলের সড়ক, বড় বাগান দিয়ে বয়ে আসা জলধারা এমন অনির্দিষ্ট বৃহৎ এলাকা থেকে দূষণের দৃষ্টান্ত।

3.7.2.3 প্রধান জল দূষণকারী পদার্থ ও জলদূষণ

(ক) **প্যাথোজেন বা রোগজীবাণু**—কীটানু, ছত্রাক, ভাইরাস, জীবাণু জলকে দূষিত করে। মানুষ ও পশুর মলমূত্র, হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থ থেকে এই দূষক পদার্থ আসে। মূল কয়েকটি জলবাহিত রোগ ও দূষকের সারণি নিচে দেওয়া হল—

জলবাহিত রোগ	দূষক
টাইফয়েড	সালমোনেলা টাইফি (জীবাণু)
কলেরা	ভাইব্রিও কলেরি (জীবাণু)
সালমোনেলোসিস	সালমোনেলা (জীবাণু)
ডাইরিয়া	ইসকেরিকিয়া কোলি (জীবাণু)
সংক্রামক হেপাটাইটিস	হেপাটাইটিস ও ভাইরাস
পোলিওমেলাইটিস	পোলিও ভাইরাস
জিয়ারডিয়াসিস	জিয়ার্ডিয়া ইনটেসটিনালিস

(খ) পচনশীল জৈব আবর্জনা

মানুষ ও পশুর বর্জ্য, গাছের পাতা, ঘাস ইত্যাদি জলে প্রবেশ করে। এগুলি অতি ক্ষুদ্র জলচর প্রাণীদের খাদ্য। ফলত জৈবক্ষয় এর ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। সুতরাং যতই জলে জৈবক্ষয়িষ্ণু জৈবিক পদার্থ বৃদ্ধি পায়, ততই দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। জলের মধ্যে থাকা আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের অক্সিজেন চাহিদা জলের জৈবক্ষয়িষ্ণু জৈবিক পদার্থের পরিমাণ নির্দেশ করে।

(গ) রাসায়নিক দূষণকারী পদার্থ

জলে বহু রাসায়নিক পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে থাকে। এগুলি অজৈব হতে পারে যেমন সীসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, নিকেল, খনি থেকে আসা অম্ল বা অ্যাসিড, অম্ল বৃষ্টিপাত। জৈব রাসায়নিক পদার্থ হল খনিজ তৈল, কীটনাশক, পলিক্লোরিনেটেড বাইফেনিল। এগুলি জলকে বিষাক্ত করে তোলে ও প্রাণীদের বসবাসের বা পানের অযোগ্য করে তোলে। খনিজ তৈল উত্তোলনের সময়, পরিবহনের সময় যান্ত্রিক গোলযোগে এই দূষণ ঘটতে পারে। পারদের সঙ্গে জীবাণুর বিক্রিয়ার ফলে মনোমোবিলমার্কারি তৈরী হয়। এই যৌগ জলে দ্রাব্য ও খুবই বিষাক্ত। মাছ এই বিষ খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে ও অসুস্থ হয়। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে নানা অসুখ এই বিষ থেকে হতে পারে।

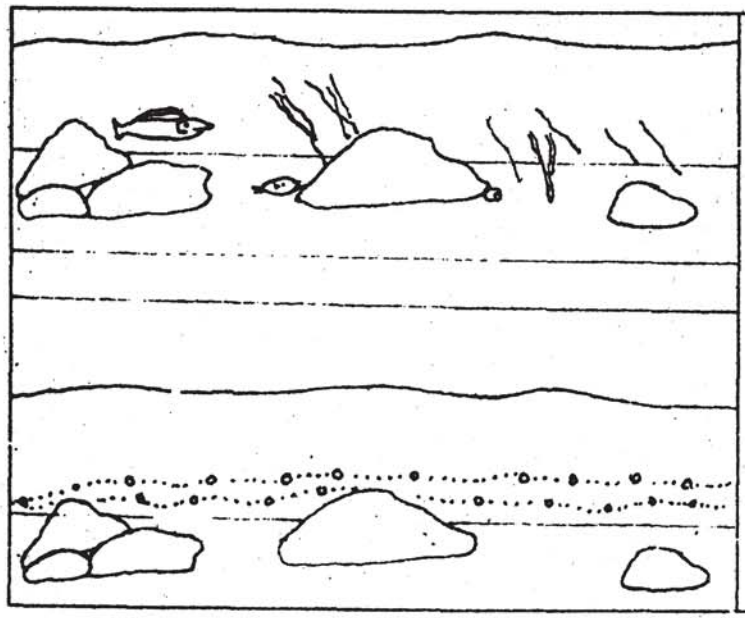

(ক) নদী বাস্তুতন্ত্র—সামান্য পলল

আলো ভালোভাবে প্রবেশ করছে

বিভিন্ন প্রাণী পাথরের খাঁজে

(খ) নদী বাস্তুতন্ত্র—অধিক পলল

আলো প্রবেশে কর্দম (ভাসমান) বাধা দিচ্ছে

প্রাণীদের খাঁজ থেকে কুরে বার করা হল।

সীসার খনি, রঙ কারখানা থেকে সীসা এসে জলে মেশে। সীসা খুব ধীরে মানুষের শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায়। সীসা শিশুদের মস্তিষ্কের ক্ষতি করে দিতে পারে।

জৈব পলিক্লোরিনেটেড বাইফেনিল বা পি সি বি-পয়ঃপ্রণালী, বর্জ্য দহন যন্ত্র, বিষাক্ত বর্জ্য স্থাপন

কেন্দ্র থেকে জলে প্রবেশ করতে পারে। এগুলি দাহ্য। ভৌমজলেও এগুলি প্রবেশ করতে পারে। স্নেহ পদার্থে এগুলি সহজেই দ্রবীভূত হয় সুতরাং একধরনের প্রাণী থেকে অন্য ধরনের প্রাণীতে ছড়িয়ে যায়। মানুষের শরীরে পি সি বির প্রভাবে ত্বকের অসুখ, ক্লান্তি ও হাড়ে ব্যথা আনে। অর্গ্যানোক্লোরিন কীটনাশক মূলতঃ ডিডিটি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর নানা ক্ষতি করে।

(ঘ) **পলল**—আবহবিকারের ফলে কৃষিক্ষেত্র, চারণভূমি, খনি এলাকা, সড়ক থেকে ক্ষয়ের ফলে প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ জলে ভেসে আসে। যখন এই ক্ষয়জাত পদার্থ কম পরিমাণে আসে তখন নদী নালার জল প্রায় পরিষ্কার থাকে। ঐ জলে নানাধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। এই জলজ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজয়া, কীট, মাছ বেঁচে থাকে। ছোট ছোট প্রাণীরা নদী গর্ভে থাকা ছোট খাটো পাথর ইত্যাদির খাঁজে বা ছায়ায় বাস করে। নদীতে ক্ষয়ে আসা দ্রব্যের পরিমাণ বেড়ে গেলে কর্দম ও হিউমাস ভাসমান অবস্থায় থাকার ফলে জলে আলো কম আসে। নিচে থিতিয়ে আসা বালি পাথরের খাঁজে ছায়ায় পৌঁছে প্রাণীগুলিকে তাদের বিশ্রাম বা আবাস থেকে চ্যুত করে। বেশী পরিমাণে পদার্থ এসে জলে জমা হওয়ায় গভীরে থাকা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটে।

(ঙ) **খাদ্য বা পুষ্টি দ্রব্য**—ধৌত প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট স্থান বা অনির্দিষ্ট ব্যাপক স্থান থেকে অনেক পুষ্টি জলে এসে পড়লে জলে উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত পয়ঃপ্রণালী থেকে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি জলে

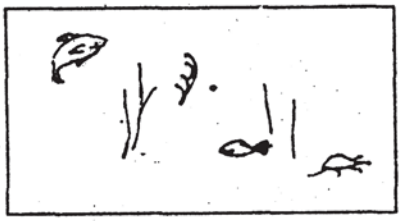

অবস্থা—১
পুষ্টি কম
সীমিত ফাইটোপ্লাঙ্কটন
স্বচ্ছ জল
আলো সহজে প্রবেশ করছে।

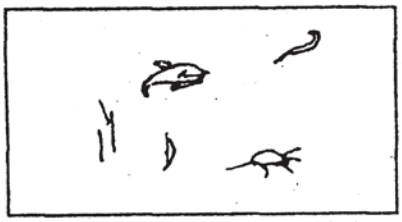

অবস্থা—২
পুষ্টি বৃদ্ধি
ফাইটোপ্লাঙ্কটন সংখ্যায় বাড়ছে
জল ঘোলাটে

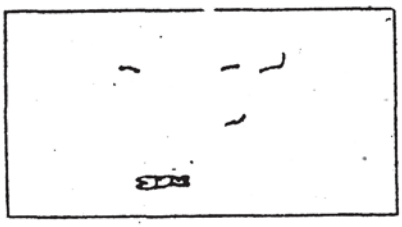

অবস্থা—৩
পুষ্টি বৃদ্ধি
ফাইটোপ্লাঙ্কটন সংখ্যা বৃদ্ধি
এ্যালগির মৃত্যু
মাছের শ্বাসরোধ
মৃতজীবী সংখ্যা বৃদ্ধি

আসে। যেসব কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হচ্ছে সেখান থেকেও রাসায়নিক সার, শস্যের কুটোকাটা বৃষ্টি বা সেচের জলে ধুয়ে নদীনালা, পুকুরে এসে পড়ে। এর ফলে জলে ফাইটোপ্ল্যাংকটনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এদের মধ্যে বেশ কিছু ফাইটোপ্ল্যাংকটন মারা যায়। নদী বা হ্রদের গর্ভে এই মৃত ফাইটোপ্ল্যাংক্টনের উপর নির্ভর করে অনেক ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। জলে প্রাণীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে জৈবনিক অক্সিজেন চাহিদা বৃদ্ধি পায়, দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে আসে, মাছের মৃত্যু ঘটে।

(চ) তাপ দূষণ—জল বিভিন্ন শিল্পে যন্ত্রকে ঠাণ্ডা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের পর প্রায়শই ঐ জল উৎস নদীটিতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে তাপ দূষণ হয়। জলে কিছু এ্যালগি ঐ তাপ সহ্য করতে পারে না। কিছু কিছু মাছের অক্সিজেন চাহিদা বেড়ে যায়। অধিক তাপমাত্রায় দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায় বিশেষত যে মাছগুলি আরও শীতল জলে অভ্যস্ত সেই মাছগুলি মারা যায়। তাপমাত্রা বাড়ায়, মাছের ডিম বেশী তাড়াতাড়ি ফুটে ছোট মাছ জন্মায়। এগুলি খাদ্যের অভাবে মারা যায়।

3.7.2.4 গঙ্গাদূষণ (Ganga Pollution)

গঙ্গা নদীর জল মারাত্মক ভাবে দূষিত হয়েছে।

গঙ্গা দূষণের উৎসগুলি হল নিম্নরূপ—

(১) নালিকা ও জলনালিকা ক্ষয়ের ফলে উদ্ভূত পলল, বালি ইত্যাদি

(২) নগর এলাকা থেকে আসা পয়ঃপ্রণালীর জল

(৩) শিল্পকেন্দ্রের বিষাক্ত রাসায়নিক ও ধাতব পদার্থ, ময়লা জল

(৪) গ্রামীণ এলাকার মানুষের ও পশুর দেহাবশেষ

(৫) রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক

(৬) পূজা পার্বণে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত ফুল, দুধ ইত্যাদি

হৃষিকেশে ভারত হেডি ইলেকট্রিকাল বা ভেল'এর শিল্প বর্জ্য গঙ্গাকে দূষিত করছে। এছাড়া ইন্ডিয়ান ড্রাগ প্রোডাকশন লিমিটেডের শিল্প বর্জ্য গঙ্গায় এসে পরে। তৈলাক্ত পদার্থ ও রাসায়নিকে হরিদ্বারের কাছে গঙ্গার জল সেচেরও অনুপযুক্ত। কুম্ভ মেলার সময় পূজা পার্বন উপলক্ষ্যেও গঙ্গা খুব দূষিত হয়ে পড়ে।

কানপুর শহরের থেকে শহরের বর্জ্য, শিল্প বর্জ্য, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য আসায় গঙ্গা দূষণ বৃদ্ধি পায়। এখানে পশম শিল্প, চামড়া শিল্প, কার্পাস বয়ন শিল্প, কাগজ শিল্প, শর্করা শিল্পের বর্জ্য এসে গঙ্গায় পড়ছে। প্রতি লিটার জলে ৬৬.৩ মিলিগ্রাম থেকে ১৭৩ মিলিগ্রাম কঠিন পদার্থ গঙ্গায় ভাসমান।

এলাহাবাদে প্রতিদিন ৭৮০০০ লিটার পৌর বর্জ্য প্রতি মিনিটে গঙ্গায় এসে পড়ে। নৈনি শিল্প কেন্দ্র থেকেও জল এসে যমুনা নদীতে পড়ছে। ৫৫০০০ ঘনমিটার ফুলপুর রাসায়নিক সার শিল্পের বর্জ্য প্রতিদিন গঙ্গায় এসে পড়ছে। কুম্ভমেলার সময় জলে টাইফয়েড, ডায়ারিয়া, কলেরা, জনডিসের জীবাণু ছড়িয়ে

থাকে। বারাণসীতে পয়ঃপ্রণালীর বর্জ্য, মৃতদেহ, পূজা সামগ্রী মিলে গঙ্গাকে দূষিত করছে। বারাণসীর ঘাটগুলিতে দাহকার্যের ফলে দূষক পদার্থগুলি গঙ্গায় মেশে। দাহের ফলে এই সব ঘাটের কাছে তাপদূষণ হয়। বিহারের মোকামায় বাটা ফ্যাক্টরি ও মকডাওয়েল সুরা কারখানার বর্জ্য যেখানে গঙ্গায় মেশে সেখানে দূষণের ফলে অনেক মাছ মারা যায়। বারাউনি তৈল শোধনাগার থেকে গঙ্গায় তাপদূষণ হয়।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তীব্র মাত্রায় দূষণ হয়। তীরবর্তী পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্প কেন্দ্রগুলির বর্জ্য গঙ্গাকে দূষিত করে। এছাড়া মৃতদেহ দাহ, শহরের পয়ঃপ্রণালী দূষণ বৃদ্ধি করায়।

3.7.2.5 হ্রদ দূষণ

নদীর মত হ্রদও প্রাকৃতিক কারণে ও মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপের ফলে দূষিত হয়। নদীর তুলনায় দূষণের মাত্রা হ্রদে অনেক বেশী কারণ হ্রদের জল স্থায়ী বা স্থির। প্রাকৃতিক কারণে ভূমিধ্বস ও আবহবিকারের ফলে এবং মানুষের দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে প্রচুর পলল কুমায়ুনের হ্রদগুলিতে জমা হয়েছে। এর ফলে হ্রদের জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। হ্রদের জলে শিল্পজাত বর্জ্য ও কৃষিক্ষেত্রের রাসায়নিক সার, কীটনাশক এসে জমা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডুলুসে সুপিরিয়র হ্রদে এ্যাসবেস্টসজনিত দূষণের ফলে পেট ও ফুসফুসের ক্যান্সার রোগ বেড়ে গিয়েছে।

3.7.2.6 ভৌমজল দূষণ

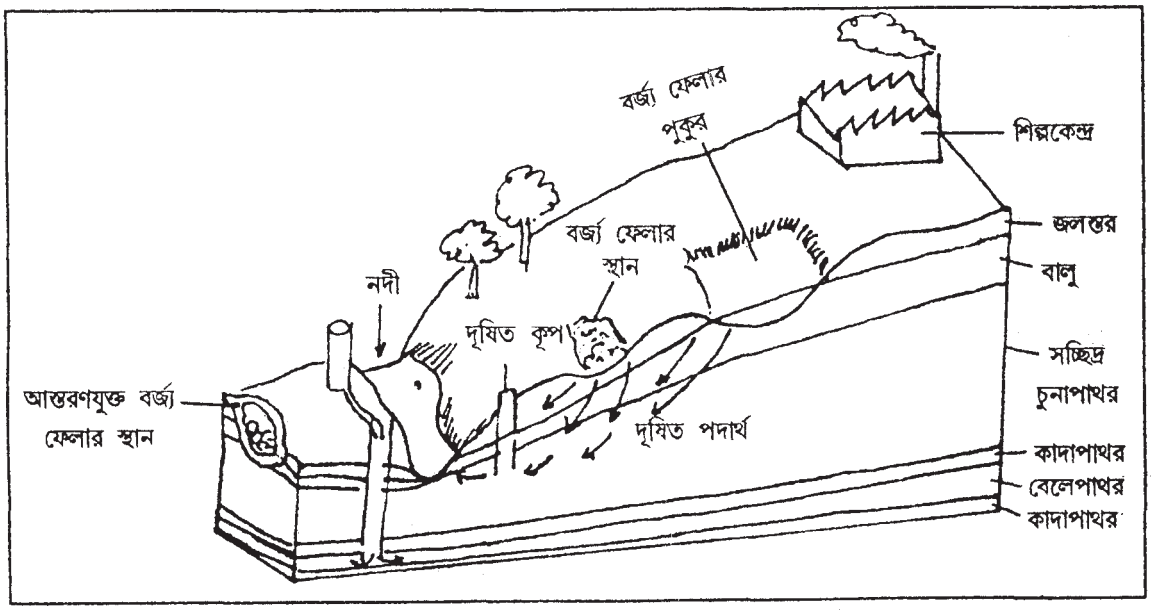

চিত্র ▸ ভৌমজল দূষণ

মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে যদি ভৌমজলে দ্রবীভূত বা ভাসমান পদার্থের পরিমাণ মানুষ ও প্রাণীদের সহ্যসীমার উপর চলে যায় তাহলে ভৌমজল দূষিত হয়েছে বলা চলে।

অসম্পৃক্ত জলস্তরের জলের পরিমাণ ও সম্পৃক্ত জলস্তরে ভৌমজলের প্রবাহের উপর দূষণকারী পদার্থের মিশে যাওয়া নির্ভর করে।

ভৌমজল দূষণের উৎস	দূষকের বৈশিষ্ট্য
(১) সেপটিক ট্যাঙ্ক	ভাসমান কঠিন পদার্থ ১০০-৩০০ মিলিগ্রাম/লিটার অ্যামোনিয়া ২০-৪০ মিগ্রা/লি ক্লোরাইড ১০০-২০০ মিগ্রা/লি কোলিফর্ম ও স্ট্রেপটোকক্কি
(২) শিল্প	বেশী ভাসমান পদার্থ, গন্ধ ভাসমান পদার্থ, ক্ষারকীয় পদার্থ
খাদ্য ও পানীয় উৎপাদক	ক্লোরাইড, সালফাইড, ক্রোমিয়াম
বয়ন শিল্প	
চামড়া শিল্প	
রাসায়নিক শিল্প	
অম্ল	অম্ল
সাবান	উঁচু বি ও ডি (অক্সিজেন জৈবনিক চাহিদা)
কীটনাশক	বেনজিন যৌগ, অম্ল
পেট্রোলিয়াম ও	উঁচু বি ও ডি, ক্লোরাইড, ফেনল,
পেট্রোরসায়ন	গন্ধক, ক্লোরাইড
ইঞ্জিনিয়ারিং	ভাসমান পদার্থ, হাইড্রোকার্বন, পরিবর্তনশীল বি ও ডি (অক্সিজেন জৈবনিক চাহিদা)
(৩) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	ছাই, সালফেট, অম্ল, তেজস্ক্রিয় পদার্থ
(৪) কৃষি	সার থেকে নাইট্রেট, এমোনিয়া, সালফেট, ক্লোরাইড, ফসফেট জৈব সার থেকে ব্যাকটেরিয়া কীটনাশক থেকে অর্গানোক্লোরিন যৌগ

ভৌমজল দূষণের উৎস	দূষকের বৈশিষ্ট্য
(৫) পশুপালন	ভাসমান কঠিন পদার্থ, নাইট্রোজেন, কোলিফর্ম ও স্ট্রেপটোকক্কি
(৬) গার্হস্থ্য বর্জ্য	সালফেট, ক্লোরাইড, এমোনিয়া, ভাসমান কঠিন পদার্থ, ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দূষণ
(৭) খনি ও খনিজ উত্তোলন	প্রচুর ভাসমান কঠিন পদার্থ, অম্ল

3.7.2.7 সামুদ্রিক জলদূষণ

সামুদ্রিক জল দূষণ দ্বারা এমন অবস্থা বোঝায় যে মানুষের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এমন কোনো পদার্থ সামুদ্রিক পরিবেশ সমুদ্র বা খাঁড়িতে আসে যার দ্বারা প্রাণীসম্পদের ক্ষতি, মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি ও সামুদ্রিক জলের উৎকর্ষের হানি হয়।

নদীগুলি প্রচুর দূষক পদার্থ সমুদ্রে নিয়ে আসে। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা ধূলি, বর্জ্য হতে নির্গত গ্যাস সমুদ্রে এসে পড়তে পারে। সরাসরি বহু শিল্পকেন্দ্র থেকে ও শহরগুলি থেকে বর্জ্য সমুদ্রে ফেলা হয়। মূল তৈলবাহী সামুদ্রিক পথের সংলগ্ন এলাকায় খনিজ তৈল পরিবহণের সময় যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে খনিজ তৈল নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের জলকে দূষিত করতে পারে। উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তৈল পারস্য উপসাগরে দূষণ ঘটিয়েছে। সামুদ্রিক তৈল খনির দুর্ঘটনার ফলে মুম্বাই হাইতে দুবার ১৯৮২ ও ১৯৮৭ তে খনিজ তৈল ছড়িয়ে দূষণ হয়েছে।

নাইট্রেট ও ফসফেটের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্রের জলে ফাইটোপ্ল্যাংকটন সংখ্যায় বেড়ে যায়। এর ফলে সমুদ্রে অক্সিজেনের অভাব ঘটেছে। সামুদ্রিক জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে ও সামুদ্রিক প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরে এই ঘটনা ঘটেছে।

3.7.3 ভূমি দূষণ (Land Pollution)

ভূমি নানাভাবে দূষিত হতে পারে।

বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ দ্বারা ভূমির উৎকর্ষ হানি হয়।

মূলতঃ জীবাণু, কীটাণু ও আগাছা ভূমিকে দূষিত করে। এর মধ্যে মানুষ ও পশুর মলমূত্রে থাকা কীটাণু ও জীবাণু রয়েছে। এমনিতেও মাটিতে নানা রোগবাহক কীট থাকতে পারে।

বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র থেকে নানা দূষক পদার্থ, যানবাহনের জ্বালানী দহনের ফলে উদ্ভূত নানা বায়বীয়

পদার্থ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বর্জ্য বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে ভূমিকে দূষিত করতে পারে। কারখানা থেকে নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইড বায়ুতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সালফিউরিক অ্যাসিড হিসাবে মাটিতে এসে পড়ে। মাটিতে অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও মাটি চাষের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন খনি থেকে আসা ধাতুর গুঁড়ো মিশে মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে যায় আর মাটি চাষের অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগের ফলে উপকারী কীটও নষ্ট হয়ে যায়। এই সব রাসায়নিক খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে পশু ও মানবদেহে প্রবেশ করে ও ধীর গতিতে বিষাক্ত করে তোলে।

মাটিতে জৈব ফসফেট যৌগ কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সব যৌগ বেশী ব্যবহারের ফলে ভূমিতে এসেটিল ক্লোরিন জমা হয়। এই যৌগ উদ্ভিদ কোষে জমা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ ও পশু স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন বহুদিন পর্যন্ত ভূমিতে রয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে মানুষ ও পশুদের অসুস্থ করে।

3.7.4 শব্দ দূষণ (Sound Pollution)

ধারণা (Concept) ঃ শব্দ যদি উচ্চ গ্রাসের হয় এবং একটানা অনেকক্ষণ চলতে থাকে ও মানুষকে অস্থির করে তোলে তবে শব্দ দূষণ হয়েছে বলা যায়। শব্দদূষণ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অতি তীক্ষ্ম শব্দকে কোলাহল বলা যায়।

3.7.4.1 শব্দের তীব্রতার পরিমাপ

শব্দের তীব্রতা পরিমাপ করার জন্য প্রচলিত একক হল 'বেল'। বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের নাম অনুসারে এই এককের নাম দেওয়া হয়েছে। দুই শব্দের তীব্রতার অনুপাত যখন ১০ ঃ ১ তখন তাদের তীব্রতার তফাৎ ১ বেল ধরা হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেল'-এর এক দশমাংশকে তীব্রতার একক হিসাবে 'ডেসিবেল' নাম দেওয়া হয়।

3.7.4.2 শব্দ দূষণের উৎস

শব্দ দূষণের উৎসকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা—

(ক) **প্রাকৃতিক উৎস**—যেমন মেঘ গর্জন, বাজ পড়ার শব্দ, ঝড়ের শব্দ, ভারী বর্ষণ, জলপ্রপাত।

(খ) **জৈবিক উৎস**—পশুর আওয়াজ, মানুষের জোরে কথা বলা, কান্না, হাসি ইত্যাদি।

(গ) মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট শব্দাবলী—যেমন যানবাহন, বিভিন্ন শিল্প, গার্হস্থ্য সরঞ্জামের আওয়াজ।

3.7.4.3 বিভিন্ন প্রকার শব্দদূষণ

(ক) পরিবহণ জনিত শব্দদূষণ—

(১) ভূতল পরিবহণ ও শব্দদূষণ—এই শব্দদূষণ যানবাহনের সংখ্যা, গতিবেগ, রাস্তার অবস্থা, ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থার উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে প্রতি ঘন্টায় চলাচলকারী যানের সংখ্যা শব্দদূষণের মাত্রাকে প্রভাবিত করে। ভারী মোটরযানে বেশী শব্দ উৎপন্ন হয়। সময় বিশেষে শব্দদূষণের মাত্রা আলাদা হয়।

(২) বিমান পরিবহণ—বিমানবন্দরের আশেপাশে কোলাহল মাত্রা সাধারণত ৮৫ ডেসিবেলের কাছাকাছি হয়। বিমান ওঠা নামার সময় এই কোলাহল প্রায় ২০ থেকে ২৫ ডেসিবেল পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জেট বিমানের শব্দ অন্য বিমানের তুলনায় বেশী হয়।

(৩) রেল পরিবহণ—রেললাইনের কাছাকাছি রেলগাড়ি যাওয়ার সময় শব্দ দূষণের মাত্রা ৯০ ডেসিবেলের কাছে হয়। এই শব্দের প্রাবল্যে কাছাকাছি এলাকার মানুষের কান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

(খ) শিল্পজাত শব্দ দূষণ—

নানারকম যন্ত্র চলার সময় শব্দদূষণ হয়। কর্মরত শ্রমিকদের মাথা ধরা ও কানে কম শোনার সমস্যা হয়।

(গ) গার্হস্থ্য সরঞ্জাম ও শব্দ দূষণ—

জেনারেটর, জলের পাম্প, কাপড় কাচা মেশিন, টি ভি, রেডিও ভিডিও চালানোর জোরদার শব্দ, ত্রুটিপূর্ণ পাখা, সেলাই মেশিনের আওয়াজ শব্দদূষণ করে।

বিভিন্ন মেলা, পালাপার্বনের সময় মাইকের ব্যবহার, দেওয়ালী ও অন্যান্য উৎসবে বাজির আওয়াজ শব্দদূষণ করে।

3.7.4.4 শব্দের তীব্রতা, শব্দের প্রকৃতি ও ক্ষতিকর প্রভাব

কোলাহলের উৎস	শব্দের তীব্রতা (ডেসিবেল)	শব্দের প্রকৃতি ও ক্ষতিকর প্রভাব
জনবসতিহীন অঞ্চল	০	মানুষের শ্রুতিগোচর শব্দের নিম্নতম মাত্রা
গাছের পাতা নড়া	১০	অতি ক্ষীণ শব্দ
বেতার স্টুডিওর অভ্যন্তরের শব্দ	২০	খুবই মৃদু

কোলাহলের উৎস	শব্দের তীব্রতা (ডেসিবেল)	শব্দের প্রকৃতি ও ক্ষতিকর প্রভাব
পাঠাগারের অভ্যন্তরের শব্দ	৩০	খুবই মৃদু
শান্ত কার্যালয়, বাসগৃহে মৃদু বেতারের আওয়াজ	৪০	মৃদু
রেস্তোরার মৃদু কথাবার্তা যানবাহনের মৃদু শব্দ	৫০	শান্ত
সাধারণ কথাবার্তার শব্দ, বাতানুকূল যন্ত্র	৬০	মোটামুটি শান্ত
ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের শব্দ	৭০	মাঝারি প্রাবল্যের শব্দ, ক্ষতিকর
মোটর হর্ণ, লাউড স্পিকার	৮০	মাঝারি প্রাবল্যের শব্দ, ক্ষতিকর
জেনারেটর, মোটর, সাইকেল	৯০	মাঝারি প্রাবল্যের শব্দ, স্থায়ী ক্ষতিকর
সিমেন্ট ভাঙা, ড্রিলের শব্দ, ৩০০ মিটার দূর থেকে জেট বিমানের শব্দ	১০০	অতি উচ্চগ্রাস শব্দ, স্থায়ী ক্ষতিকর
বাজের শব্দ, কংক্রিট ভাঙার শব্দ	১১০	অতি বিপজ্জনক স্থায়ী ক্ষতিকর
অক্সিজেন, মশাল, শক্তিশালী বাজি	১২০	পীড়াদায়ক, অত্যন্ত ক্ষতিকারক
৩০ মিটার দূরত্বে ৫০ অশ্বশক্তিযুক্ত সাইরেনের আওয়াজ	১৩০-১৪০	বেশ পীড়াদায়ক, অত্যন্ত ক্ষতিকারক
জেট বিমান ওড়ার সময়	১৫০	অত্যন্ত পীড়াদায়ক
রকেটের উৎক্ষেপণের শব্দ	১৭০-১৯৫	অসহনীয়, যন্ত্রণাদায়ক

3.7.4.5 কারখানার শব্দদূষণ মাত্রা—ভারতে

ভারতের কিছু কিছু কলকারখানার শব্দদূষণ মাত্রা সারণির সাহায্যে দেখানো হল—

কারখানা	শব্দের তীব্রতা (ডেসিবেল)
গোলাবারুদের কারখানা	৯৪-১৪০
ওষুধপত্রের কারখানা	৯৪-১২৮
মোটর তৈরির কারখানা	১০৪-১২০
বস্ত্র বয়ন শিল্প	৯২-১০৫
সার কারখানা	১০৪-১১৮

3.7.4.6 ভারতে শব্দের তীব্রতার নির্ধারিত নিরাপদ মাত্রা

১৯৮৯ সালের সংশোধিত আইন মোতাবেক ভারতে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে দিন ও রাত্রিকালীন শব্দের তীব্রতার সীমা নির্ধারিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার শব্দদূষণ সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে।

বিশেষ এলাকা	নির্ধারিত নিরাপদ শব্দ প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল)		কলকাতায় প্রকৃত শব্দ প্রাবল্যমাত্রা (ডেসিবেল)	
	দিনে	রাত্রে	দিনে	রাত্রে
বসবাস এলাকা	৫৫	৪৫	৭৯	৬৫
বাণিজ্য এলাকা	৬৫	৫৫	৮২	৭৫
শিল্পাঞ্চল	৭৫	৬৫	৭৮	৬৭
নিঃশব্দ অঞ্চল (হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এসবের ১০০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত)	৫০	৪০	৭৯	৬৫

সুনিদ্রার উপযোগী ৩৫ ডেসিবেল মাত্রায় সকলেরই ঘুম হয়। ৫০ ডেসিবেল অথবা ৬০ ডেসিবেল মাত্রায় ঘুম আসতে বেশ দেরী হয়। শব্দ বেশী হলে ঘুমের ব্যাঘাত হয় ও অনিদ্রা রোগ দেখা দিতে পারে।

শব্দদূষণের জন্য অত্যধিক রক্তচাপ দেখা দিতে পারে, পাচকরস কম নিঃসৃত হয়, পেশীসমূহে ব্যথা ও স্নায়ুদৌর্বল্য দেখা দিতে পারে।

3.7.5 বর্জ্য ও দূষণ অনুশীলনী

১। 'হ্যাঁ' বা 'না' এ উত্তর দিন

(ক) বিপজ্জনক বর্জ্যের মধ্যে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী যৌগ থাকে।

(খ) আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নির্গত হয়।

(গ) কার্বন মনোঅক্সাইড একটি প্রাথমিক বায়ুদূষক।

(ঘ) সালমোনেলা টাইফি থেকে পোলিও হয়।

(ঙ) ৭০ ডেসিবেল তীব্রতার শব্দ ক্ষতিকারক নয়।

২। বন্ধনীর মধ্য হতে সঠিক উত্তর বেছে নিন ও বাক্য সম্পূর্ণ করুন ঃ

(ক) সীসা খুব (দ্রুত/ধীরে) মানুষের শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায়।

(খ) ভোপালে ১৯৮৪ তে (কার্বন মনোঅক্সাইড/মেথিল আইসোসায়ানেট) দ্বারা বায়ুদূষণ অনেক মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

(গ) জলের মধ্যে থাকা আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের অক্সিজেন চাহিদা জলের (জৈবক্ষয়িষ্ণু জৈবিক পদার্থের/অজৈব পদার্থের) পরিমাণ নির্দেশ করে।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

(ক) কৃষিজাত জলদূষণকারী পদার্থ কি কি?

(খ) বায়ুতে ভাসমান কণা জাতীয় দূষক পদার্থগুলি কি কি?

(গ) কীটনাশক কিভাবে ভূমিদূষণ ঘটায়?

(ঘ) নিঃশব্দ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত এলাকায় নির্ধারিত নিরাপদ শব্দ প্রাবল্যমাত্রা কত?

3.7.6 উত্তরমালা

১। (ক) হ্যাঁ (খ) হ্যাঁ (গ) হ্যাঁ (ঘ) না (ঙ) না

২। (ক) ধীরে (খ) মেথিল আইসোসায়ানেট (গ) জৈবক্ষয়িষ্ণু জৈবিক পদার্থের

৩। (ক) 3.7.2.2 অংশ দেখুন

(খ) 3.7.1.2 অংশ দেখুন

(গ) 3.7.3 অংশ দেখুন

(ঘ) 3.7.4.6 অংশে দেখুন

3.8 সামাজিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

পরিবেশগত বিপর্যয় মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি করে। তাত্ত্বিক দিক থেকে মানুষের আচরণ প্রণালী ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রণালীর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় বিদ্যা। প্রাকৃতিক কোনো ক্রিয়ার প্রভাব সহ্যসীমা অতিক্রম করলেই সেটিকে দুর্যোগ এবং বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কোনো সমাজের সহ্যসীমা কোথায় তা নির্দেশ করা গবেষকদের কাছে এক জটিল কাজ।

বিপর্যয় অনুধাবন ও প্রতিক্রিয়া মানুষের প্রত্যক্ষকরণের উপর নির্ভর করে। মানুষ তার ব্যক্তিগত বোধ বা অনুভূতি দ্বারা বিপর্যয়কে চিনে নেয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করে নেয়। একই দুর্ঘটনা বার বার ঘটলে মানুষ সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করতে পারে।

3.8.1 বিপর্যয় প্রত্যক্ষকরণ

মূলতঃ তিনভাবে বিপর্যয় প্রত্যক্ষকরণ সম্ভব, যথা—

(১) বিপর্যয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা কিন্তু তাকে কোনো এক বিশেষ ছকে ফেলে বোঝার চেষ্টা করা।

(২) বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা এবং অতীতের বিপর্যয়ের ঘটনাগুলিকে দুর্ঘটনা হিসাবে চিন্তা করা।

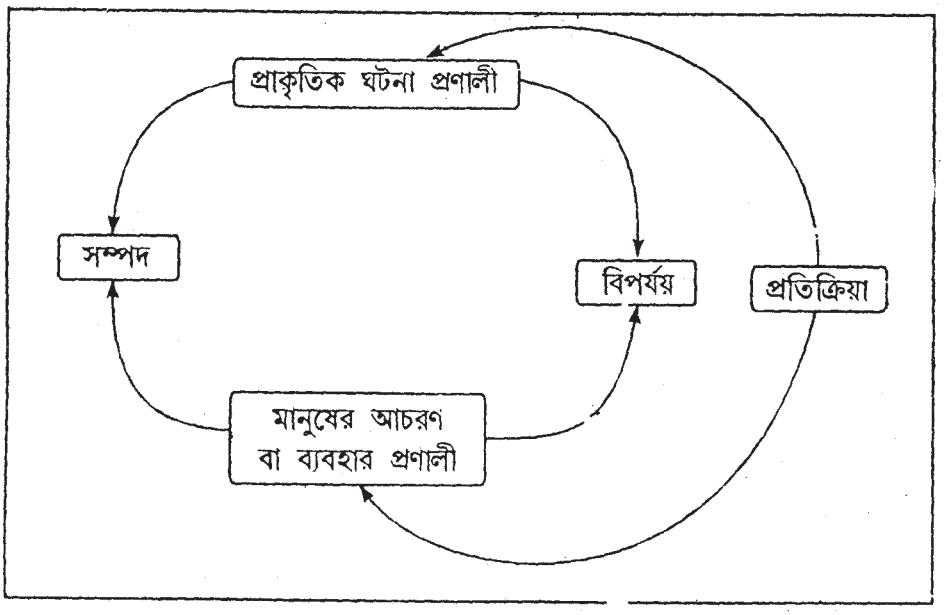

চিত্র ♦ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানুষ

(৩) বিপর্যয়ের সম্ভাবনা স্বীকার করা এবং মোকাবিলা করতেই হবে এই বোধ থাকা।

দুর্যোগ প্রত্যক্ষকরণ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অবশ্যই সম্পর্ক আছে। এটি এক জটিল সম্পর্ক। প্রণালী পদ্ধতির দ্বারা এই প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যক্ষকরণের সম্পর্ককে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আলোচনায় ব্যাখ্যার প্রয়াস রেখেছেন। মূলতঃ দুটি প্রণালীকে কেটস (১৯৭১) চিহ্নিত করেছেন—প্রাকৃতিক ঘটনা প্রণালী ও মনুষ্য আচরণ প্রণালী। তাঁর মতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুধরনের হতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া বা ক্রিয়া অতীতের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সুযোগ বা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

দুর্যোগের মোকাবিলায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একক ব্যক্তি, পরিবার, প্রশাসক ও বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানুষের জীবনে যে ক্ষতি নিয়ে আসে সেই ক্ষতিকে রোধ করার জন্যই মানুষ নানা চেষ্টা করে। বিপর্যয় প্রত্যক্ষকরণের সীমা নির্ভর করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উদ্যম ও প্রয়াস, সহ্য ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধির উপর। সুতরাং অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক হতে দুর্বল মানুষ সব ক্ষেত্রেই দুর্যোগে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামাজিক সবলীকরণ পদ্ধতিতে এই ক্ষতি কিছুটা কমতেও পারে।

3.8.2 ক্ষতি প্রবণতা

ক্ষতি প্রবণতা বিচার করার জন্য জাতিসংঘের মতে 'বিপন্নতা বিচার পদ্ধতি' অনুসরণ করা যেতে পারে। যে যে বস্তুর পরিমাপ নেওয়া হয় সেগুলি নিম্নরূপ—

(ক) ভৌতিক বা বস্তুগত অবস্থা

১ ভৌগোলিক অবস্থান ও বিপর্যয়মুখীতা

২. দারিদ্র্য

৩. সম্পদ ও ধন

৪. জীবিকার অর্থনৈতিক বা মূল ভিত্তি

৫. জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, যন্ত্রপাতি

৬. দক্ষতা ও শ্রম

৭. পরিকাঠামো অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন সেবা পাওয়ার সুযোগ ও সংস্থান

৮. শক্তি বা সামর্থ্য যেমন স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি

৯. গার্হস্থ্য অবস্থা অর্থাৎ বাসস্থান, খাদ্য ও পানীয় জল পাওয়ার সুযোগ

(খ) সামাজিক বিপন্নতার মাপকাঠি

১. গোষ্ঠীগত প্রয়াস—গোষ্ঠীর ঐক্য, উদ্যম, গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক, জাতিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভেদ

২. নেতৃত্ব—একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব বা পরিচালন, কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের মোকাবিলা

৩. সম্পদের কর্তৃত্ব, সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নতির প্রায়োগিক দিক

৪. তথ্য অর্থাৎ কোথায়, কখন ও কেমনভাবে গোষ্ঠীটি তথ্য বা সংবাদ পায়

গ. বিপন্নতার সাংস্কৃতিক বা আচরণগত মাপকাঠি

১. গোষ্ঠীর ক্ষমতা অনুসারে মানুষের নিজের সম্বন্ধে ধারণা, মানুষ কতটা তার সীমাবদ্ধতা এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন

২. প্রথাগত বিশ্বাস ব্যবস্থা, মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার দেশজ ও ঐতিহাসিক দিক

বিশেষ কিছু কারণের ফলে মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই কারণগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(১) গ্রামীণ এলাকায়

ক. ভূমিহীনতা ও প্রান্তিক চাষীদের সমস্যা

খ. উদ্বৃত্ত উৎপাদনে অক্ষমতা

গ. অন্যান্যভাবে রোজগারের ক্ষমতা না থাকা

ঘ. ধার নেওয়ার অক্ষমতা

ঙ. বাধ্যতামূলক অভিবাসন

চ. বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়

ছ. স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ হ্রাস

(২) শহর এলাকায়

ক. ক্ষুদ্র আয়যুক্ত মানুষের বিপর্যয়প্রবণ এলাকায় বস্তি তৈরী করে বাস

খ. নিম্ন আয়

গ. অপর্যাপ্ত ব্যক্তিগত, সামাজিক, পরিকাঠামো বা পরিবহণগত সুবিধা

ঘ. অধিক মানুষের অভিবাসন

বিপর্যয়প্রবণ এলাকায় মানুষের বসবাস ও কারণ ঃ নানা গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় মানুষ হয়তো কয়েকটি বিশেষ কারণে বিপর্যয়প্রবণ এলাকায় বাস করে।

প্রথমতঃ দুর্যোগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব। এক্ষেত্রে শিক্ষা ও সজাগ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ দুর্বল ও অসংগঠিত নেতৃত্ব অন্য কোনো উপায় তৈরী করতে বা বেছে নিতে সাহায্য করে না। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ সীমিত উৎসাহ, উদ্যম ও পরিবর্তনের বাসনা থাকায় অনেক সময় মানুষ বিপর্যয়প্রবণ এলাকা থেকে সরে যায় না।

চতুর্থতঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে এরা অন্য সুযোগ দেখতে পায় না।

দুর্যোগের ফলে যে সব ক্ষতি হয়ে যায় সেগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন মানুষের মৃত্যু, পশুপাখির মৃত্যু ও হারিয়ে যাওয়া, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য হানি, সম্পত্তির হানি বা নষ্ট হওয়া, পরিকাঠামো নষ্ট হওয়া, শস্য নষ্ট হওয়া ইত্যাদি। অতি জরুরী ব্যবস্থাগুলি যেমন পানীয় জল সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। বিদ্যালয়, চিকিৎসা কেন্দ্র অকেজো হয়ে পড়তে পারে। সামগ্রিক জনজীবনের সুস্থিতি বিপর্যয়ের ফলে নষ্ট হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মহিলাদের পরিস্থিতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। খরার সময় সমীক্ষা করে দেখা গেছে একেক জন মহিলা এক থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব হেঁটে পানীয় জল সংগ্রহ করেছেন। এমনিতেই মহিলাদের বাড়ির কাজ পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী থাকে। শিশুর স্বাস্থ্য ও খাদ্য দেওয়ার দায়িত্বে থাকেন মা। সামগ্রিক জীবনযাত্রা ব্যহত হওয়ায় এই দায়িত্বগুলি পালন করা কঠিন হয়ে ওঠে। বিপর্যয়ে যে সব মহিলা স্বামী হারান বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ঘটে। দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের পরে কি কি মানসিক ও সামাজিক সমস্যা হতে পারে তার ধারণা দিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

3.8.3 মানসিক সমস্যা ও বিপর্যয়

শ্রীনিবাস মূর্থির (১৯৯২) গবেষণায় জানা যায় যে বিপর্যয় সামাজিক ও মানসিক জীবনে কঠোর প্রভাব ফেলে। দুর্গতদের মানসিক জোর বা শক্তি, গোষ্ঠীর এই দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা ও সাহায্যের উপর মানসিক বিপর্যয় মোকাবিলা নির্ভরশীল।

বিপর্যয়ের ভৌতিক বা বস্তুগত ক্ষতির ফলে মানুষ হঠাৎ বিরাট বিপদের সম্মুখীন হয়। আত্মীয় প্রিয়জনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা মানুষকে বড়ই অসহায় ও আশাহত করে। অনেক ক্ষেত্রে তাকে নিজের জীবন বাঁচানো ও প্রিয়জনকে বাঁচানোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়। রুবোনিস ও বিকম্যান তাঁদের

গবেষণায় দেখেছেন যে দুর্যোগের পর ৪০% মানুষ অস্থিরতায় ভোগে, ৩২% ভোগে ভীতিতে, ৩৬% -র কঠিন মানসিক ব্যাধি হয়। ৩৬% মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে, ২৬% মানসিক অবসাদ গ্রস্ত হয়। এই ধরনের সমস্যাগুলিকে একযোগে 'বিপর্যয় অসুখ' (Disaster syndrome) বলা যায়। ৭০% দুর্গতদের মধ্যে বিপর্যযের পরে প্রথম সপ্তাহেই এই অসুখ ধরা পরে। কোনো কোনো শিল্পগত বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ১৫% দুর্গতদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এঁরা যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এই ধরনের দুর্গতদের পরবর্তীকালে গভীর মানসিক বিষাদগ্রস্ত হতে দেখা গেছে। উদ্ধারকর্মীদের মধ্যেও অনেক সময় বিপন্ন মানসিকতা দেখা দেয়।

মানসিক ও সামাজিক এই প্রভাবগুলিকে নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। উন্নতকামী দেশে মানসিক রোগের চিকিৎসাকেন্দ্র এতই অপ্রতুল যে দুর্গতদের প্রাথমিক যত্ন নেওয়াও কষ্টসাধ্য। তবে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ধারকারী দলের মধ্যে এ বিষয়ে ধারণ্য সঞ্চার করা সম্ভব। বিপদপ্রবণ এলাকায় আপৎকালীন চিকিৎসাকেন্দ্র তৈরী করা খুবই জরুরী।

3.8.4 দুর্যোগের মোকাবিলা ও স্থানীয় মানুষ—পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ

বিপর্যয়ের সময় পরিবারকে এবং দুর্গত জনগোষ্ঠীকে কিছু ভূমিকা পালনের প্রশিক্ষণ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার দিয়েছেন। পরিবারকে দুর্যোগের আগাম সতর্কীকরণের কিছুটা দায়িত্ব নিতে হবে।

বাড়ীতে যে সব জরুরী কাগজপত্র রয়েছে যেমন জন্ম নথিকরণপত্র, রেশনকাড, ভোটার আইডেনটিটি কার্ড, জমি বা বাড়ির দলিল একজনের দায়িত্বে থাকবে ও দুর্যোগে বাড়ি ছাড়তে হলে, তিনিই ঐগুলি নিয়ে যাবেন। বাচ্চাদের ইস্কুলের বইপত্র ঐ পাঠরত বাচ্চাকেই নিতে হবে।

দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের মোকাবিলার জন্য পরিকল্পনা নেবেন স্থানীয় জনগোষ্ঠী। জনগোষ্ঠীকে সম্ভাবনা এবং সম্পদকে চিনে নিতে সাহায্য করবেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সরকারী কর্মচারীরা। পরিকল্পনাতে নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক পরিবারের কাজ বলা থাকবে। সমগ্র জনগোষ্ঠীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে নির্দিষ্ট কাজ দিতে হবে। প্রাক দুর্যোগ, দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থার জন্য পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

অতীতে বিপর্যয়ের সময় কি ঘটেছিল, সতর্কবানী পাওয়া গিয়েছিল কিনা, কতটা ক্ষতি হয়েছিল, ত্রাণবন্টনে কি কি অসুবিধা দেখা গিয়েছিল, গৃহপালিত পশুর ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, বিপন্ন মানুষকে কিভাবে উদ্ধার করা হয়েছিল আলোচনা করে নিতে হবে।

বিপর্যয়ের পরে কবে সবাই গ্রামে বা শহরে নিজেদের বাড়ী ফিরে এলেন, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনে কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছিল, ফসলবীমার সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল কিনা ইত্যাদি আলোচনা করে নিলে

বিপর্যয়ের কারণ সম্বন্ধে জনগোষ্ঠীর ধারণা স্পষ্ট হবে। অতীতের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির হিসাবনিকাশ করা যাবে। নির্দিষ্ট কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যাবে যতে আগামী বা'র সেই সমস্যা না থাকে।

3.8.5 সামাজিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ঃ

অনুশীলনী

১। 'হ্যাঁ' বা 'না' এ উত্তর দিন ঃ

(ক) দুর্যোগের মোকাবিলায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের দায়িত্ব থাকে।

(খ) ক্ষতিপ্রবণতা বিচার করার জন্য জাতিসংঘের মতে 'বিপন্নতা বিচার পদ্ধতি' অনুসরণ করা যেতে পারে।

(গ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মহিলাদের পরিস্থিতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

(ঘ) উদ্ধারকর্মীদের বিপন্ন মানসিকতা দেখা যায় না।

২। সঠিক উত্তর বেছে নিন ও বাক্য সমাপ্ত করুন ঃ

(ক) দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের মোকাবিলার জন্য পরিকল্পনা নেবেন (স্থানীয় জনগোষ্ঠী/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা)

(খ) দুর্যোগে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থনৈতিক দিক থেকে (সবল মানুষ/দুর্বল মানুষ)

(গ) দুর্যোগ প্রত্যক্ষকরণ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক (আছে/নেই)

3.8.6 উত্তরমালা

১। (ক) হ্যাঁ (খ) হ্যাঁ (গ) না (ঘ) না

২। (ক) স্থানীয় জনগোষ্ঠী (খ) দুর্বল মানুষ (গ) আছে।

3.9 চরম ঘটনাবলী

পরিবেশ অবক্ষয়, বিপর্যয় ও দুর্ঘটনার কিছু চরম ঘটনাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

3.9.1 মিনামাটা দুর্ঘটনা ঃ পারদ দূষণ

১৯৫০-র দশকে জাপানে এই বিপর্যয় ঘটে। স্থানীয় এক কারখানায় মারকিউরিক অক্সাইড ব্যবহার করা হত। ঐ কারখানায় এসিটেলডেহাইড বা ইথানল আর পলিভিনাইল ক্লোরাইড তৈরী হত। কারখানার বর্জ্যের সঙ্গে পারদ মিনামাটা উপসাগরে এসে পড়েছিল। এই উপসাগরে পারদ বিষাক্ত মিথাইল ধরনের

যৌগে রূপান্তরিত হয়। স্থানীয় বিড়াল ও কুকুরদের মধ্যে প্রথমে স্নায়ুতন্ত্রের অসুখ দেখা যায়। পরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে বধিরতা ও মানসিক ব্যাধি দেখা দিল। এঁদের অনেকের পক্ষেই হাত পা নড়াচড়া করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৫৮-র মধ্যে ৫০ জনের এইরকম মিনামাটা অসুখ হল, ২১ জন এই অসুখে মারা গেলেন। মিনামাটা উপসাগরের মাছ ও প্রাণী খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করায় এই অসুখ হয়েছিল। যাঁদের এই অসুখ হয়েছিল তাঁরা প্রায় সকলেই প্রত্যহ তিনবার এই উপসাগরের মাছ খেয়েছিলেন। এক দশক পর অর্থনৈতিক চাপে এই কারখানা বন্ধ করা হয়। ১৯৭৫ অবধি ১০০ জন এই মিনামাটা অসুখে মারা যান, ৮০০ জনের এই অসুখ হয়েছিল।

3.9.2 এক্সন ভালদেজ : খনিজ তৈল দূষণ

২৪ মার্চ ১৯৮৯ সুপারট্যাঙ্কার জাহাজ 'এক্সন ভালদেজ' প্রিন্স উইলিয়াম সাউন্ডে দুর্ঘটনা হয়। এক্সনে বাহিত খনিজ তেলের ২২% সমুদ্রের জলকে দূষিত করে। ২৫০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই দূষণ ছড়িয়ে ছিল। ১৯৯৩ পর্যন্ত এই বিষাক্ত প্রভাব ছিল। বিশেষ করে অনেক গোলাপী অ্যামন মাছের ডিম নষ্ট হল। বহু সামুদ্রিক পাখি ও স্তন্যপায়ী জীবের মৃত্যু হল।

3.9.3 সেভেসো : রাসায়নিক দূষণ

উত্তর ইতালির সেভেসো শহরে ICMESA রাসায়নিক কারখানায় ১০ জুলাই ১৯৭৬ এক বিস্ফোরণ হয়। বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত রাসায়নিক ছড়িয়ে যায়। এই রাসায়নিকের মধ্যে দুই কিলোগ্রাম ডাই অক্সিন ছিল। মূলতঃ গৃহপালিত পশুর মৃত্যু হয়। ভূমি দূষণের ফলে ৩৭০০০ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

3.9.4 থ্রি মাইল আইল্যাণ্ড দুর্ঘটনা : তেজস্ক্রিয় দূষণ

২৮ মার্চ ১৯৭৯ তে থ্রি মাইল আইল্যাণ্ড এর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটটিতে দুর্ঘটনা ঘটে। জলের অভাবে একটি টারবাইন কাজ করে নি, এর ফলে রিঅ্যাক্টরের কাজ নষ্ট হয়। ডিজাইন, প্রশিক্ষণ, যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটে। মূলতঃ Xenon 133, Xenon 135 ছড়িয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার ১৫ মাস পরে আবার Krypton-85 বায়ুমণ্ডলে ছড়ায়। প্রায় ২২০০০০ মানুষকে ঐ এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

3.9.5 চেরনোবিল বিপর্যয় : তেজস্ক্রিয় দূষণ

২৫ ও ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬ তে চেরনোবিলে আণবিক দূষণ ঘটে। একটি রিঅ্যাক্টর থেকে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প নিঃসরণ হয়ে বিবিধ রাসায়নিক যৌগ তৈরী হয়ে এক বিস্ফোরণ হয়। প্রচুর তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেমন আয়োডিন ১৩১, কেসিয়াম-১৩৭ নিষ্কাশিত হয়।

স্ক্যান্ডিনেভিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে এই সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে জমা হয়ে যায়। খুব বেশী দূষণ হয়েছিল অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, জার্মানী, রোমানিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে।

3.9.6 ভোপাল : রাসায়নিক দূষণ

ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় কীটনাশক তৈরী হত। এই কারখানা থেকে ২ ও ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তে মেথিল আইসোসায়ানেট গ্যাস বেড়িয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। এই গ্যাস ভূ-অভ্যন্তরস্থ একটি জলাধারে প্রবেশ করেছিল এবং সেখান থেকেই এই বিস্ফোরণ হয়ে যায়। সাত কিলোমিটার পর্যন্ত এই গ্যাস ছড়িয়ে পরে লক্ষেরও বেশী মানুষ অসুস্থ হয়।

3.9.7 পশ্চিমবঙ্গে বন্যা : ২০০০

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গে এক বিধ্বংসী বন্যা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলায় এই বন্যার ফলে প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়।

জেলার নাম	বন্যা কবলিত এলাকা (হেক্টর)	যে এলাকায় শস্য নষ্ট হল (হেক্টর)	জীবনহানি
বর্দ্ধমান	৩৫৯৭৯৬	৩০০৪০০	৭২
বীরভূম	২৮২৫০০	২৪০৩০০	২২৮
মুর্শিদাবাদ	৫২২৬০০	৪৫০৬০০	৬১৪
নদীয়া	৩৭০০০০	৩৩৫০০০	১৩০
হুগলী	২৯০০০০	২৪০১০০	২৭
মেদিনীপুর	১৮০৬০০	৯৯৯০০০	১৩
উত্তর ২৪ পরগণা	২১০৪০০	১৫৫৬০০	৯
হাওড়া	১২৯০০০	৭০০০০	৩
মালদা	৩৯৭৪০	২২০০০	

সেপ্টেম্বর মাসে টানা চারদিন ১০০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। মাসাঞ্জোর বাঁধ ও দামোদর প্রকল্পের মাইতন ও পাথে বাঁধ থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়া হয়। নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকায় নদীখাতগুলি মজে এসেছে অতিরিক্ত পলল জমা হওয়ায়, নদীখাতে কৃষিক্ষেত্র বিস্তারিত হওয়ায়। অনেক জায়গায় নদীর পাশে বন্যা

নিয়ন্ত্রক বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নদী গর্ভে বেশী পলল জমা হয়েছে ও পার্শ্ববর্তী এলাকার তুলনায় নদী গর্ভ বেশী উঁচু হয়ে গিয়েছে। এই সব বিবিধ কারণে বন্যা এমন বিধ্বংসী হয়েছিল।

3.9.8 রাজস্থান খরা (২০০২-৩)

২০০২ তে রাজস্থানে ১০০ বছরের মধ্যে নিকৃষ্টতম খরা হয়। এই নিয়ে পরপর পাঁচ বছর রাজস্থানে খরা হয়। স্বাভাবিক মৌসুমী বৃষ্টিপাত ৫১৮.৬ মিলিমিটারের জায়গায় ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র ২২০.৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। ৩২টি জেলাই ছিল খরা কবলিত। মৃত্তিকায় জলের অভাবের জন্য রবি শস্য চাষের এলাকা কমে আসে। সমগ্র রাজ্যে পানীয় জলের চরম অভাব দেখা যায়। রাজ্যের ১৫০টি জলাধারের মধ্যে মাত্র ৩টি থেকে সেচের জল পাওয়া গিয়েছে। ৬টি জলাধারের জল পানের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন সরকার।

চরম ঘটনাবলী :

প্রশ্নাবলী :

১। 'হ্যাঁ' বা 'না' এ উত্তর দিন :

(ক) মিনামাটা দুর্ঘটনা পারদ দূষণের জন্য হয়েছিল।

(খ) থ্রি মাইল আইল্যাণ্ড দুর্ঘটনা খনিজ তৈল দূষণের উদাহরণ।

(গ) চেরনোবিল বিপর্যয় ১৯৭৭ এ ঘটে।

২। বন্ধনী থেকে সঠিক উত্তর বেছে নিন ও বাক্য সম্পূর্ণ করুন :

(ক) থ্রি মাইল আইল্যাণ্ড দুর্ঘটনায় (Xenon-133/কার্বন মনোঅক্সাইড) বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে যায়।

(খ) ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের (৯টি/১৪টি) জেলায় বন্যা হয়।

উত্তর :

১। (ক) হ্যাঁ (খ) না (গ) না

২। (ক) Xenon-133 (খ) ৯টি

3.10 সংক্ষিপ্তসার

পরিবেশ অবক্ষয় শিল্পায়ন ও পৌরায়ণের পর খুবই দ্রুত ঘটে গেছে। কোনো প্রাকৃতিক বা আর্থ সামাজিক ক্রিয়ার চরম অবস্থায় যদি মনুষ্যজীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়, তবে সেই ক্রিয়া ও তার ফলকে বিপর্যয় বলা চলে।

বিপর্যয় পাঁচটি প্রধান ধরনের। যেমন বায়ুমণ্ডলীয় বিপর্যয়, উদক বিপর্যয়, প্রাণীগত বিপর্যয়, প্রযুক্তিগত বিপর্যয়।

ঝুঁকি হল প্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ।

কোন জনগোষ্ঠীর অসহায়তার মাত্রা হল তার বিপন্নতা।

বন্যা এক উদক বিপর্যয়। নিম্ন অববাহিকা, ক্ষুদ্র নদী অববাহিকা, পলল ব্যজনী এলাকায় বন্যা প্রবণতা বেশী। অভিক্ষেপের আধিক্য, বনবিনাশ, পৌরায়ণ, কৃত্রিম বাঁধ বন্যার সম্ভাবনা বাড়ায়। দীর্ঘ সময় অনাবৃষ্টির অবস্থা বা জলের অভাব হল খরা। কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাতের গড় মান যদি পঁচিশ শতাংশেরও বেশী হ্রাস পায় তাহলে তাকে আবহাওয়া খরা বলে।

যে অবস্থায় মৃত্তিকাস্থিত জল এবং বৃষ্টি উভয়েই শস্যের বৃদ্ধির পক্ষে অপর্যাপ্ত হয়, তবে শস্যের ক্ষতি হয় আর শস্য ঝরে পড়ে, এমন অবস্থাকে কৃষি খরা বলা হয়।

অনেক সময় ধরে আবহাওয়া খরা হলে জলসম্পদ হ্রাস পায় এবং জলাধার শুকিয়ে আসে। এমন অবস্থাকে উদক খরা বলা হয়। এল নিনো অবস্থা দক্ষিণ গোলার্ধের ওয়াকার ব্যবস্থা ভেঙে যায়। এল নিনো অবস্থায় আয়ন বায়ু দুর্বল হয়, ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মেক্সিকোতে খরা দেখা যায়। মৃত্তিকার গুণগত মানের হ্রাস ও পরিমাণ হ্রাসকে মৃত্তিকা অবক্ষয় বলা হয়। মৃত্তিকার গভীরতা হ্রাস, মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদান হ্রাস, মৃত্তিকার লবণায়ন মৃত্তিকা অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক। চাদর ক্ষয়, জলনালিকা ক্ষয় ও সংকীর্ণ নালিকা ক্ষয় হল জলের দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয়ের বিভিন্ন রূপ। এছাড়া বায়ুর দ্বারাও মৃত্তিকা ক্ষয় হয়। বৃষ্টিপাতের ক্ষয় ক্ষমতা, মৃত্তিকার ক্ষয় যোগ্যতা, ঢালের দৈর্ঘ্য ও নতি, ভূমি আচ্ছাদনকারী উদ্ভিদ ও শস্যের পরিমাণ, ভূমিসংরক্ষণকারী পদক্ষেপ মৃত্তিকা ক্ষয়কে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকার মরুকরণ, মৃত্তিকার উপরিস্তর কঠিন হওয়া, লবণায়ন, মৃত্তিকার জৈব পদার্থ হ্রাস, মাটি বসে যাওয়া, দূষণ, অম্লকরণ মৃত্তিকার অবক্ষয়ের অন্যান্য দিক।

বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ও গৃহস্থালীর কাজের ফলে নির্গত যে সব জৈব ও অজৈব পদার্থকে আমরা আর ব্যবহার করতে চাই না, তাদের বর্জ্য বলি। বর্জ্যের মধ্যে কিছু বিপজ্জনক বস্তু থাকে। এগুলি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগতের পক্ষে ক্ষতিকারক। ধাতুশিল্প, যানবাহন মেরামতি কারখানা, পেট্রোল পাম্প, রঙ কারখানা, ছাপাখানা, হাসপাতাল, পশু চিকিৎসাগার, আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিপজ্জনক বর্জ্য নির্গত হয়। গৃহস্থালীর কিছু কিছু বর্জ্য বিপজ্জনক। জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য থেকে জৈব সার তৈরী হয়। কঠিন বর্জ্যকে অনেক সময় ভস্মীভূত করা হয়। মাটিতে বর্জ্য পুঁতে ফেলার পদ্ধতিকে জমি ভরাট বলা হয়। বর্জ্যের পরিমাণ হ্রাস, বর্জ্য পরিবহণ ও সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত কর বসানো, বর্জ্য পৃথকীকরণ, সুস্থায়ী বর্জ্য নিষ্কাশন ও পরিচালন ব্যবস্থার অন্তর্গত।

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে সৃষ্ট কোনো দ্রব্য যদি পরিবেশের ক্ষতি করে তাহলে দূষণ হয়েছে বলা যায়। যদি বায়ুমণ্ডলে কিছু বস্তু এমন ভাবে মেশে যা বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট করে ও মানুষের ক্ষতি করে তাহলে সেই অবস্থাকে বায়ুদূষণ বলা যায়। বায়ুদূষকগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হতে পারে আরবা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলেও সৃষ্ট হতে পারে। প্রকৃতি অনুযায়ী বায়ুদূষক তিন প্রকার যথা—গ্যাসীয় বায়ুদূষণ, বায়ুতে প্রলম্বিত বা ভাসমান কণা জাতীয় পদার্থজনিত বায়ুদূষণ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থজনিত বায়ুদূষণ।

জলে কোনো দ্রব্য মিশে জলের ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন হয়ে মানুষ ও অন্যান্য জীব ও উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক অবস্থা তৈরী হলে জলদূষণ হয়েছে বলা যায়। জলদূষণকারী পদার্থ কৃষিজাত, শিল্পজাত, পৌরায়ণজাত এবং প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রাণী ও উদ্ভিদ ভূমির উৎকর্ষহানি করে। শিল্পকেন্দ্র থেকে নানা দূষক পদার্থ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বর্জ্য, অতিরিক্ত রাসায়নিক কীটনাশক ভূমিদূষণের মূল কারণ। উচ্চগ্রামের শব্দ বহুক্ষণ চললে তা মানুষকে অস্থির করে তোলে। একে শব্দ দূষণ বলা যায়। শব্দের তীব্রতা ব্যবহারিক ভাবে ডেসিবেলের সাহায্যে মাপা হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে বিপর্যয় প্রত্যক্ষকরণের সম্পর্ক আছে। ক্ষতি প্রবণতা জাতিসংঘের 'বিপন্নতা বিচার পদ্ধতি' দ্বারা মূল্যায়ন করা যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় দরিদ্র মানুষ ও মহিলাদের পরিস্থিতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য স্থানীয় মানুষের তৈরী পরিকল্পনাই সর্বাধিক কার্যকরী।

পরিবেশগত বিপর্যয়ের কিছু চরম ঘটনাবলীর কথা এই এককে আলোচিত হয়েছে। যেমন মিনামাটার পারদ দূষণ, এক্সন ভালদেজের খনিজ তৈল দূষণ, সেভেসোর রাসায়নিক দূষণ, থ্রি মাইল আইল্যাণ্ডের তেজস্ক্রিয় দূষণ, চেরনোবিল তেজস্ক্রিয় দূষণ বিপর্যয়, ভোপালের রাসায়নিক দূষণ, পশ্চিমবঙ্গের ২০০০ সালের বন্যা, রাজস্থানের ২০০২-৩ এর খরা।

3.11 প্রান্তিক প্রশ্নাবলী

ক. বিস্তারে লিখুন :

১। বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে পরিবেশ অবক্ষয়ের ধরণ ও কারণগুলি লিখুন।

২। বন্যার প্রাকৃতিক কারণগুলি কি কি?

৩। পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতে বন্যার কারণ ও প্রকোপ সম্বন্ধে লিখুন।

৪। ২০০২-এ ভারতে খরা কোন কোন রাজ্যে কি ধরনের ক্ষতি এনেছিল?

৫। মৃত্তিকার ক্ষয় যোগ্যতা কি? এই ক্ষয় যোগ্যতা কিভাবে মৃত্তিকা ক্ষয়কে প্রভাবিত করে?

৬। বিপর্যয় অসুখ কি?

৭। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতি প্রবণতা কিভাবে বিচার করা যায়?

৮। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়? এক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের ভূমিকা কি?

খ. সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

১। মৃত্তিকার মরুকরণ কি?

২। উৎস অনুসারে বায়ুদূষকের নাম লিখুন।

৩। পি সি বি কি?

৪। বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে কোন কোন ধরনের দূষক ভৌমজলকে দূষিত করে?

৫। সামুদ্রিক জলদূষণ কিভাবে হয়?

৬। উৎস অনুসারে শব্দ দূষণের শ্রেণী বিভাগ করুন।

উত্তরের জন্য ঃ

ক. ১। 3.2.1 অংশ দেখুন

২। 3.3.2.1 অংশ দেখুন

৩। 3.3.4 অংশ দেখুন

৪। 3.4.4 অংশ দেখুন

৫। 3.5.2 অংশ দেখুন

৬। 3.8.3 অংশ দেখুন

৭। 3.8.2 অংশ দেখুন

৮। 3.8.4 অংশ দেখুন

খ. ১। 3.5.3 অংশ দেখুন

২। 3.7.1.2 অংশ দেখুন

৩। 3.7.2.3 অংশ দেখুন

৪। 3.7.2.6 অংশ দেখুন

৫। 3.7.2.7 অংশ দেখুন

৬। 3.7.4.2 অংশ দেখুন

3.12 গ্রন্থপঞ্জী

এই এককের জন্য যে সব বই আপনারা দেখতে পারেন তার একটি তালিকা আপনাদের জন্য দেওয়া হল—

১। পরিবেশ—রথীন্দ্রনারায়ণ বসু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০১

২। পরিবেশ সমীক্ষণ—কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত ও বাসুদেব দে, ওয়ার্ল্ড প্রেস কলকাতা ২০০৮

৩। মৃত্তিকার কথা ও দামোদর উপত্যকার মৃত্তিকা ক্ষয়ের রূপরেখা—পান্নালাল দাস ও স্বপ্না বসু সন্দীপ ২০০১

৪। মৃত্তিকা ভূবিদ্যা—নিখিলকৃষ্ণ দে ও হিমাংশুকুমার সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৯৪

1. Contemporary Environmental Issues in Bangla Basin—S. R. Basu & V. Starhel edited acb publications 2003.

2. Environmental Geography—Savindra Shingh Prayag Pustak Bhawan 2003.

3. Fundamentals of Physical Geography—David Briggs and Peter Smithson Routledge 1993.

4. Geo Hazards—Natural and Manmade edited by GuttMaccav, DJC Laming & S. C. Scott Chapman and Hall 1992.

5. Handbook for Field Assessment of Land Degrabation—Michael Stocking and Niaruh Murganathan EarthScan Publications Limited 2001.

6. The Oxford Companion to the Earth edited by Paul L Hancock and B.ian J Skinner Oxford University Press 2000.

একক 1 □ সাম্প্রতিক পরিবেশ সমস্যা ঃ বিশ্ব প্রকৃতি (Contemporary Environmental Problems : Global Scenario)

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা (Introduction)
1.2 উদ্দেশ্য (Objectives)
1.3 বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও উষ্ণকরণ (Global warming)
1.4 ওজোন গ্যাস ও ওজোন স্তরে ছিদ্র (Ozone gas and ozone hole)
1.5 পরমাণু চুল্লি ও তেজস্ক্রীয় দূষণ (Atomic plant and radioactive pollution)
1.6 আর্সেনিক দূষণ (Arsenic pollution)
1.7 পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ও এললিনো (Climate change and Elnino)
1.8 প্রশ্নাবলী ও উত্তর (Question and Answer)

1.1. ○ প্রস্তাবনা (Introduction)

মানুষ প্রথমে বসতির জন্য গড়ে তুলেছিল ছোট ছোট গ্রাম। তারপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে সেগুলি পরিবর্তিত হল ছোট ছোট শহরে। বড়ো শহরে, নগরে কিংবা মহানগরে। মানুষের হাত পড়লো প্রাকৃতিক পরিবেশে— প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে তৈরী হল মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশে। মানুষকে খাদ্য সংগ্রহ, ঘরবাড়ি নির্মাণ, বস্ত্রের যোগান, কিংবা চালিকা শক্তির প্রয়োজনে কৃষিজসম্পদ, বনজসম্পদ, জ্বালানি কাঠ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য খনিজ পদার্থকে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করতে হল। ফলে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের অব্যবহার ও অপব্যবহার বাড়লো তেমনি টান পড়লো প্রাকৃতিক সম্পদে— মূলত অপুনর্ভব বা সঞ্চিত সম্পদে (non-renewable or fund resources)। তাছাড়া এই প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। রয়েছে প্রতিটি সম্পদের নির্দিষ্ট চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা— যাকে বলা হয় প্রাকৃতিক পরিবেশের বহন ক্ষমতা (Carrying Capacity of Natural Environment)।

মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদায় প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বহন ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং ফলস্বরূপ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয় পরিবেশ।

মনুষ্য সৃষ্ট এই পরিবর্তন বা বিপর্যয়গুলি যে কোনো কারণে শুরু হয় স্থানীয় ভাবে কিন্তু তার প্রভাব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। ফলে শুধুমাত্র কিছু জৈবিক ও অজৈবিক উপাদানের বিনাশ ঘটে তাই নয়

যারা এইসব ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত নয়, তারাও এর ফল ভোগ করে চলেছে সমানভাবে বংশপরম্পরায় ধরে। হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ, বেঁচে থাকার জল, শ্বাস নেওয়া প্রাণ বায়ু।

সাম্প্রতিক কালে এই সব সমস্যা নিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচিও কম হয়নি। কিন্তু খুব একটা এগানো সম্ভব হয়নি—যদিও সমস্যা সমাধানে উদ্যোগও কিছু নেওয়া হয়েছে। এই রকম কয়েকটি বিশ্বপরিবেশ সমস্যা নিয়ে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা হল।

1.2. ○ উদ্দেশ্য (Objectives)

- মানুষের হস্তক্ষেপে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দেওয়া।
- উন্নত কৃষিকাজ, শিল্পায়ন, নগরায়ন, খননকার্য, শক্তি উৎপাদন ইত্যাদির সরাসরি পরিবেশে প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন করা।
- কোন দূষক নিরাপদমাত্রা (Threshold limit) অতিক্রম করলে জীবজগৎ ও বাস্তুতন্ত্রের উপর সেটির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া।
- সাম্প্রতিক কালের বিশ্ব পরিবেশগত প্রধান সমস্যাগুলি এবং সমাধানে গৃহিত ব্যবস্থাগুলির পরিচিতি ঘটানো।
- বিভিন্ন প্রকার দূষণ সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণে প্রথম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের সংঘাত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

1.3. ○ বিশ্ব উষ্ণকরণ (Global Warming)

1.3.1. সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য (Definition and Characteristics)

পৃথিবীর দীর্ঘ ভূত্বাত্তিক ও জলবায়ুগত বিবর্তনে ভূ-পৃষ্টের গড় তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট মানে আসার পরই এখানে প্রাণের স্পন্দন মিলেছে। পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা 15°C। সূর্য পৃথিবীর এই তাপমাত্রার প্রধান এবং একমাত্র উৎস। পৃথিবীর এই স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় অবশ্য পৃথিবীপৃষ্ঠে আগত সৌর কিরণ (Incoming solar radiation) এবং পৃথিবী থেকে বিগত বা প্রতিফলিত সৌর কিরণের (OUtgoing solar radiation) ভারসাম্য দ্বারা। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক গ্যাসীয় উপাদান এই তাপীয় ভারসাম্যে এতকাল কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করে নি।

কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এই স্বাভাবিক ভারসাম্যের বিঘ্নতা বিজ্ঞানী মহলের নজরে আসতে শুরু করে। সারা বিশ্ব জুড়ে ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা সামান্য হারে বাড়তে শুরু করে। 1880 থেকে 1980 এই একশ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় 0.6°C। আশঙ্কা করা যাচ্ছে 2100 সাল নাগাদ এই তাপমাত্রা সর্বনিম্ন আরও 1.4°C এবং সর্বোচ্চ আরও 5.8°C বাড়বে। তার কারণ উষ্ণতা বৃদ্ধির এই হার ক্রমবর্ধমান। সারা পৃথিবীর এই গড় উষ্ণতার ক্রমবর্ধমান অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" (Global Warming)। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা উষ্ণকরণের এই হার নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানামত থাকলেও পৃথিবী যে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে এ নিয়ে দ্বিমত নেই। এবিষয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্য বিজ্ঞানীদের হাতে পৌঁচেছে।

1.3.2. গ্রীন হাউস প্রভাব (Green house effect)

পৃথিবীতে যে সমস্ত সমস্যা বর্তমানে মানুষের স্থায়িত্বকালকে বিপন্ন করে তুলেছে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা "গ্রীন হাউস এফেক্ট" তার মধ্যে অন্যতম। এককথায় এটি মানুষের সৃষ্ট তাপদূষণ সমস্যা। কোটি কোটি বছর ধরে বাতাসের যে কার্বন (কার্বন ডাই-অক্সাইডের) মাটির নিচে জীবাশ্মরূপে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডারের সৃষ্টি করেছিল তা মাত্র কয়েকশ বছরের মধ্যে অতি ব্যাপকভাবে বাতাসে ফিরিয়ে দেবার ফলেই মূলত এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে শীতপ্রধান দেশে যেখানে পরিবেশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি থাকে সেখানে উদ্ভিদ প্রতিপালনের জন্য বাগানে স্বচ্ছ কাঁচের (glass) ছাউনি যুক্ত ঘর ব্যবহার করা হয়। এই ঘরকে সবুজ ঘর বা গ্রীনহাউস বলে। শীতের দিনে পরিবেশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকলেও এই সবুজ ঘরের ভিতর বায়ু-মণ্ডলের তাপমাত্রা 38°C–39°C-র (100 – 120°F) মধ্যে থাকে। ফলে উদ্ভিদের জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদনে কোনো অসুবিধা হয় না। এমনকি প্রবল ঠাণ্ডাতেওফুল, ফল, সব্জীর সমারোহ তৈরী হয়। এখন প্রশ্ন হল এর কারণ কি?

সূর্য থেকে আগত বিকিরণের মধ্যে থাকে দৃশ্যমাণ রশ্মি এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি। সূর্যের আলো অর্থাৎ ঐ সব রশ্মির ক্ষেত্রে কাঁচ (glass) স্বচ্ছ (transparent) বস্তুর মতো কাজ করে অর্থাৎ সূর্যের আলো কাঁচের মধ্যে দিয়ে গ্রীণহাউসে সহজেই প্রবেশ করে। কিন্তু মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ কর্তৃক পরিত্যক্ত তাপীয় বিকিরণের ক্ষেত্রে কাঁচ অসচ্ছ (opaque) বস্তুর ন্যায় আচরণ করে ফলে তাপ কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরের বায়ুমণ্ডলে ফিরে যেতে পারে না। ফলে কাঁচঘরের তাপমাত্রা বাড়ে এবং এই নিয়ন্ত্রিত উষ্ণতায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ফুল, ফল, ভালো হয়।

সমগ্র পৃথিবীর পরিমণ্ডলও এক বড় গ্রীনহাউস। বায়ুমণ্ডলে সামান্য পরিমাণ হলেও বেশ কিছু গ্যাস থাকে (যেমন, CO_2, CH_4, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন CFC, N_2O ইত্যাদি) যাদের তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালী বৈশিষ্ট্য এমনই যে তারা দৃশ্য আলোতে স্বচ্ছ কিন্তু অবলোহিত রশ্মির ক্ষেত্রে অসচ্ছ। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের ঐসব গ্যাস পৃথিবীকে ঢাকনার মতো চেপে রেখে অবলোহিত রশ্মিগুলিকে শোষণ করে আটকে দেয় এবং বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণতর রাখে। এক্ষেত্রে ঐ গ্যাসগুলি পৃথিবীর গ্রীনহাউসের কাঁচ আস্তরক হিসাবে কাজ করে। তাই বায়ুমণ্ডলে ঐসব গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধির দরুন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি জনিত নানান দুর্ঘটনাকে একসঙ্গে গ্রীনহাউস প্রভাব (greenhouse effect) বলা হয়।

1.1.3. গ্রীন হাউস গ্যাস (Green house gas)

গ্রীন হাউস প্রভাব ঘটাতে সক্ষম গ্যাসগুলিকে গ্রীন হাউস গ্যাস বলে। কার্বন ডাই-অক্সাইডকে (CO_2) প্রধান গ্রীন হাউস গ্যাস বলাহয়। তাছাড়া অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাস গুলি হল মিথেন (CH_4), নাইট্রিক অক্সাইড (N_2O), ফ্রেয়ন গ্যাস (CFC), জলীয় বাষ্প এবং ওজোন (O_3)। এ গ্যাসগুলির ঘনত্ব বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় অনেক কম হলেও পৃথিবীর উত্তপ্তকরণে এরা কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। উদাহরণস্বরূপ এক অণু CH_4 এর গ্রীন হাউস *এফেক্ট* এক অণু CO_2 এর চেয়ে 21–23 গুণ অধিক। CFC–11 এর ক্ষেত্রে তা প্রায় 12000 গুণ বেশি *(সারণী 1.1.)*।

সারণী 1.1 প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহ এবং গ্রীনহাউস এফেক্টে ভূমিকা

প্রধান গ্রীন হাউস গ্যাস	গ্রীন হাউস আনুপাতিক অবদান	প্রতি অণু CO_2-এর সাপেক্ষে উষ্মকরণ ক্ষমতা
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	55%	1
মিথেন (CH_4)	15%	23 গুণ বেশি
ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC)	14%	12,000 গুণ বেশি
নাইট্রিক অক্সাইড (N_2O)	06%	270 গুণ বেশি
জলীয় বাষ্প (H_2O)	04%	5 গুণ কম
ওজোন (O_3)	06	10 গুণ বেশি

উৎস : Global warming — The Green Peace Report, 1995

● **(i) কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)**

বিগত বহু কোটি বছর ধরে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণ কার্বন জৈবিক প্রক্রিয়া মূলত সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানীতে (কয়লা ও খনিজ তৈল) পরিণত করেছিল তা শিল্পবিপ্লবের পর মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই মানুষ কতৃক জ্বালিয়ে দেবার ফলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা হয় CO_2 প্রধান গ্রীন হাউস গ্যাস।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের আগে উত্তর গোলার্ধে বাতাসে CO_2 এর ঘনত্ব ছিল মাত্র 0·02% বা 280 ppm, আজ তা দাঁড়িয়েছে 0·035% বা 350 ppm-এ। এই সময়ে জীবাশ্ম জ্বালানীর অবাধ ব্যবহার এবং সিমেন্ট উৎপাদন প্রভৃতি শিল্প প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণ CO_2 বায়ুমণ্ডলে হয়। ফলে 1870 থেকে 1990 -এর মধ্যে CO_2-এর পরিমাণ বেড়েছে 21·5% (290 – 350 ppm)। অধিকাংশ পরিবেশ বিজ্ঞানীর মতে বর্তমান হারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়তে থাকলে আগামী 2030 থেকে 2050 খ্রীঃ-এর মধ্যে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হবে, ফলে দৈনিক গড় তাপমাত্রা বাড়বে 2°C – 5°C।

কার্বন ডাই-অক্সাডের উৎস হলো কার্বন। পৃথিবীতে এই কার্বনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট। কার্বন প্রকৃতিতে কয়েকটি প্রকৃতিক উৎসে অবস্থান করে এবং এক উৎসে থেকে অন্য উৎস চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়। ফলে কার্বনের উৎপাদন ও বিনাশের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে চলেছে। প্রতিবছর প্রায় 100 বিলিয়ান টন কার্বন সমুদ্র থেকে মুক্ত হয়ে বাতাসে মিশছে এবং সম পরিমাণ কার্বন বায়ুমণ্ডল থেকে সমুদ্রে যুক্ত হচ্ছে। স্থলবাসী উদ্ভিদ ও প্রাণীরা শ্বসনক্রিয়ার মাধ্যমে বছরে 100 বিলিয়ান টন কার্বন বাতাসে যোগ করছে এবং সবুজ উদ্ভিদরা ঐ পরিমাণ কার্বন ঐ সময়ের মধ্যে বাতাস থেকে মুক্ত করে জৈবপদার্থে যুক্ত করছে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায়। একে কার্বন চক্র বলে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপে এই ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। মানুষ প্রতিবছর প্রায় 555 মিলিয়ান টন কার্বন জ্বালানী পুড়িয়ে বায়ুমণ্ডলে সংযোজিত করছে। প্রাকৃতিক উদ্ভিদের ধ্বংস সাধনের ফলে আরো প্রায় 1000 মিলিয়ন টন কার্বন বায়ুমণ্ডলে থেকে যায় সালোকসংশ্লেষের পরিমাণ কমে যায়

* ppm : Parts per million.

বলে।'ফলে মোট প্রায় 6666 মিলিয়ন টন কার্বন প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে মিশছে। এর প্রায় অর্ধেক দ্রবীভূত হয় সমুদ্রের জলে। বাকি অর্ধেক বায়ুমণ্ডলে থেকে যাচ্ছে এবং গ্রীন হাউস এফেক্টের জন্ম দিচ্ছে। বর্তমানে গ্রীন হাউস এফেক্টে CO_2-এর ভূমিকা প্রায় 55%।

সারণী 1.2 : পৃথিবীতে মানুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন উৎস থেকে কার্বন নিষ্কমণের মোট পরিমাণ

বৎসর	কার্বন (মিলিয়ান টন)
1950	1639
1955	2050
1960	2586
1965	3154
1970	4090
1975	4628
1980	5249
1985	5338
1990	5430
1995	5616
2000	5017

উৎস : Council of Science and Environment, 2004

● (ii) **মিথেন (CH_4) :** CO_2র পর বায়ুমণ্ডলের অন্যতম গ্রীন হাউস গ্যাস হলো মিথেন। বায়ুমণ্ডলে মিথেনের ঘনত্ব খুবই সামান্য (1.6 ppm) হলেও গ্রীন হাউস এফেক্টের ক্ষেত্রে মিথেন CO_2 এর থেকে 21–25 গুণ বেশি সক্রিয়। বর্তমানে গ্রীন হাউস এফেক্টে মিথেনের অবদান প্রায় 15%। ধানজমি ও জলাভূমি হলো মিথেনের প্রধান উৎস। তাছাড়া গবাদি পশুর গোবর থেকে, পচা জৈব পদার্থ থেকে কয়লা ও খনিজ তৈলের ঘন অঞ্চল থেকে প্রচুর মিথেন গ্যাস নিয়ত বায়ুমণ্ডলে মিশছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশে (ভারত সহ) এখন বছরে 2/3 বার ধান চাষ করার ফলে মিথেনের দায়ভারের অনেকটাই এই সমস্ত দেশের উপর এসে পৌঁচেছে। বর্তমানে প্রতি বছর গড়ে 440 – 600 মিলিয়ান টন মিথেন বায়ুমণ্ডলে এসে মিশছে।

বাতাসে অধিক পরিমাণে কার্বনমনোক্সাইড গ্যাস (CO) বায়ুমণ্ডলে মিথেনের ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করছে। মিথেনের আপনা আপনি বিনষ্ট হবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া CO গ্যাস ব্যাহত করে। তাছাড়া যে লক্ষ লক্ষ টন মিথেন হিমমণ্ডলের তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় আছে তা গ্রীন হাইস এফেক্টের ফলে বরফ গলতে শুরু করায় বাইরে বেরিয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশছে।

● (iii) **ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) :** ক্লোরিণ, ফ্লুরিন এবং কার্বনের যৌগ ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের বাণিজ্যিক নাম ফ্রেয়ন (freon)। এটি একপ্রকার নিষ্ক্রিয়, অদাহ্য এবং সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাসীয় পদার্থ যা গ্রীন হাউস এফেক্টে CO_2 এর চেয়ে প্রায় 10,000 গুণ বেশি সক্রিয়। তবে বায়ুমণ্ডলে এর ঘনত্ব CO_2 কিংবা মিথেনের চেয়ে অনেক কম— মাত্র 0·000225%। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন নির্বুদ্ধিতায় প্রতি বছর এর ঘনত্ব বাড়ছে 4·6% হারে।

প্রধানত রেফ্রিজারেটার, এয়ারকন্ডিসনার, কঠিন প্লাস্টিক, ফোম, স্প্রেক্যাম ইত্যাদির ব্যবহারে প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয় প্রায় 1 মিলিয়ান টন CFCs। CFC সহজে বিক্রিয়া করে না। দৃশ্যমান বা UV রশ্মি দ্বারা বিযোজিতও হয় না। ফলে শতাধিক বছর বায়ুমণ্ডলে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। গ্রীন হাউস এফেক্ট সৃষ্টিতে CFC-র অবদান প্রায় 14%। ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের উন্নত দেশ সমূহে সবচেয়ে বেশি CFCs উৎপন্ন হয় এবং সেই কারণে ওই দেশগুলো বেশি দায়ী। গ্রীন হাউস গ্যাসগুলোর প্রায় 67% শিল্পোন্নত দেশের অবদান এবং এর প্রায় 25%-এর বেশি দায়ী কেবল ঐসমস্ত দেশে উৎপন্ন CFCs গ্যাসগুলি।

● (iv) **নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2) :** নাইট্রোজেন সার থেকে জীবাণুর বিক্রিয়ায়, জৈব পদার্থের জ্বলনে ইত্যাদি নানা কারণে বায়ুমণ্ডলে NO_2 মিশে চলেছে। বায়ুমণ্ডলে এর ঘনত্ব 0·28 – 0·30 ppm এবং বছরে শতকরা 0·3 অংশ হারে বাড়ছে। এভাবে বাড়তে থাকলে 2050 সালে NO_2'র পরিমাণ আনুমানিক প্রায় 0·35 – 0·45 ppm হবে। বর্তমানে গ্রীন হাউস এফেক্ট সৃষ্টিতে এর ভূমিকা প্রায় 6% এবং গ্যাসটি CO_2-এর তুলনায় প্রায় 150 গুণ বেশি সক্রিয় অতিবেগুনি রশ্মি (UV) কিংবা বায়ুমণ্ডলের কসমিক রশ্মির সাথে বিক্রিয়া করে এই গ্যাসটি ভাঙে কিংবা বিলীন হয়। তবে তার জন্য ন্যূনতম 150 বছর সময় লাগে।

● (v) **জলীয় বাষ্প (H_2O) :** জলীয়বাষ্পের ঘনত্ব বাতাসে প্রায় 1·4% হলেও গ্রীন হাউস এফেক্টে এর ভূমিকা প্রচুর। জলীয়বাষ্প সূর্যের ইনফ্রারেড রশ্মি শোষণ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং জলীয়বাষ্প সৃষ্ট মেঘ পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপকে বাধা দেয়।

সারণি 1.3 : বিভিন্ন দেশের বাতাসে নিক্ষিপ্ত গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ

অঞ্চল	সমগ্র বিশ্বে মোট নিক্ষিপ্ত গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণের শতকরা হার (%)
● **শিল্পোন্নত দেশ (66.95%)**	
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	27.44
জাপান	2.51
পশ্চিম ইউরোপ	11.89
পূর্ব ইউরোপ	4.54
সি আই এস	13.08
অস্ট্রেলিয়া	2.00
● **উন্নয়নশীল দেশ (33.05%)**	
ভারত	0.013
চিন	0.57
ব্রাজিল	18.21
এশিয়া (জাপান বাদে)	7.97
আফ্রিকা	3.04
আমেরিকা (USA, কানাডা বাদে)	22.03%

সূত্র : Council of Science and Environment (CSE) ২০০৪

● (v) **ওজোন (O_3) :** বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে O_3 গ্যাসের অবস্থান গ্রীন হাউস গ্যাস হিসাবে কাজ করে। O_3 এর সর্বাধিক গাঢ়ত্ব প্রায় 10 ppm যা ক্রান্তীয় অঞ্চলে 25 কিমি উর্ধ্বে, 21 কিমি উর্ধ্বে মধ্য অক্ষাংশে এবং 18 কিমি উর্ধ্বে মেরু অঞ্চলে দেখা যায়। বায়ুমণ্ডলে O_3 এর গ্রীন হাউস এফেক্টের পরিমাণ নির্ণয় করা খুবই কঠিন কারণ অঞ্চল ভেদে এবং উচ্চতা ভেদে O_3 খুবই পরিবর্তনশীল।

কারা কারা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এ দায়ী

প্রথমে জানা গেছিল CO_2 একমাত্র গ্রীন হাউস গ্যাস, অর্থাৎ CO_2 এর ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। পরে জানা গেছে মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ও ওজন গ্যাসও কম দায়ী নয়। পৃথিবীপৃষ্ঠে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষমতা এদের মধ্যে ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের বেশি, তারপর ক্রমান্বয়ে আসবে নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ওজোন ও সবেশেষে কার্বন ডাই-অক্সাইড।

ক্ষমতা কম হলেও পৃথিবীপৃষ্ঠে উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য মূল দায়ী CO_2। উষ্ণতা বৃদ্ধির 55 শতাংশের জন্য দায়ী CO_2, 15 শতাংশের জন্য দায়ী মিথেন, 14 শতাংশের জন্য দায়ী ক্লোরোফ্লুরো কার্বন, 6 শতাংশের জন্য দায়ী নাইট্রাস অক্সাইড এবং ওজোন ও জলীয় বাষ্প প্রত্যেকে প্রায় 4 শতাংশ করে দায়ী। প্রতিবছর এই গ্যাসগুলির পরিমাণ যেভাবে বাড়ছে তা এই রকম— কার্বন ডাইঅক্সাইড 0·4 শতাংশ; মিথেন 1 শতাংশ; নাইট্রাস অক্সাইড 0·3 শতাংশ ও ক্লোরোফ্লুরোকার্বন 5 শতাংশ।

এখন প্রশ্ন হলো এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি কি হারে হচ্ছে বা আদৌ হচ্ছে কিনা। বিশেষজ্ঞদের মতে এর উত্তর হাঁ। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব ইতিমধ্যে আমরা পাচ্ছি।

1.3.4. বিশ্ব উষ্ণকরণ-এর চিহ্ন বা নজির (Evidences of global warming) :

সারা পৃথিবীতে উষ্ণকরণ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর নেগেটিভ প্রভাব কি কি হয়েছে বা হচ্ছে এই নিয়ে একদল বিজ্ঞানী গবেষণায় রত। এদের গবেষণায় ইতিমধ্যে আমরা যে যে নজির বা চিহ্ন পেয়েছি তা সংক্ষেপে আলোচিত হল।

➪ (1) **বায়ুমণ্ডলে CO_2 বৃদ্ধি :** আমরা আগেই জেনেছি বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর মাত্রা শিল্প বিপ্লবের পর অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। শিল্পবিপ্লবের আগে 280 ppm থেকে বর্তমানে প্রায় 360 ppm এ পৌঁচেছে— অর্থাৎ প্রায় 30% বৃদ্ধি। এই মাত্রা গত 160,000 বছরের মধ্যে সর্বাধিক।

➪ (2) **বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের বৃদ্ধি (Increase of methane gas) :** মিথেন বায়ুমণ্ডলের অন্যতম গ্রীন হাউস গ্যাস। এই গ্যাসও গত 100 বছরে 0·7 ppm থেকে 1·7 ppm-এ তে অর্থাৎ প্রায় 145% বেড়েছে। বর্তমানে প্রতি বছর 540 মিলিয়ান টন মিথেন বায়ুমণ্ডলে মেশে।

➪ (3) **আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তন (Frequent change weather) :** গত দুশো (1800 – 2000) বছরের মধ্যে 1999 ছিল সর্বাধিক তাপীয় বছর এবং এরই মত চরম তাপীয় অবস্থা এই সময়ে 5 বার হয়েছিল। ফলে খরা ও বন্যার প্রকোপও বেড়েছে লক্ষণীয় ভাবে। আমেরিকা ইউরোপে দেখাগেছে গত 50 বছরে মধ্যে শীতলতম শীতকাল। এই সময়ে তুষারপাত, তুষারঝড় ও বন্যার তীব্রতাও বেড়েছে। গত 25 বছরের মধ্যে তীব্রতম তুষার ঝড় হয়েছে জাপান ও কোরিয়ায়। এই সময়ে থাইল্যান্ড শীতলতম শীতকালের মুখোমুখি হয়েছে।

এই ধরনের শীতকাল এসেছে তীব্রতম গ্রীষ্মের পরে। লণ্ডনে দেখা গেছে 300 বছরের মধ্যে শুষ্কতম গ্রীষ্ম। NOAA-র (National Climatic data centre) ডিরেক্টর থমাস কার্ল (Thomas Karl) এর মতে গত দুশো বছরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। গত শেষ শতাব্দীতে (1900 – 2000) পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ 0·6°C। এবং শেষ হিমযুগের পর (18000 – 2000 বছর আগে) বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় 5° – 9° F বেড়েছে।

⇨ (4) হিমবাহের অন্তর্ধান কিংবা পশ্চাদপসরণ (Disappearing or retreat of glaciers) :

বরফের গলন কিংবা হিমবাহের পশ্চাদপসারণ হলো গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর সবচেয়ে বড় এবং নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। পৃথিবীর 6টি মহাদেশেই এই ঘটনা ঘটে চলেছে।

(i) উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে বড় হিমবাহ বেরিং হিমবাহ (Bering glacier) যা প্রায় 11 কিমি দৈর্ঘ্যে কমেছে; অর্থাৎ ইতিমধ্যে সে তার আয়তনের 20 – 25% হারিয়েছে।

(ii) দক্ষিণ পেরুর কুৎরি হিমবাহ (Qori glacier) গত 14 বছরে (1983 – 2000) আগের 100 বছরের চেয়ে প্রায় 3 গুণ বেশি হারে গলতে শুরু করেছে।

(iii) গ্রীনল্যাণ্ডের হিমবাহগুলো সমুদ্রের দিকে বেশি গতিতে এগোতে শুরু করেছে। এটি সম্ভবত হিমবাহের গলন এবং গলনের ফলে উৎপন্ন জল হিমবাহের নিচে পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে কাজ করার জন্য ঘটেছে।

(iv) আমাদের ঘরের কাছে হিমালয়ের হিমবাহেও একই ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ প্রায় প্রতি বছরে 30 মিটার হারে পেছোচ্ছে। এই হার গত 1935 এবং 1990-এর মধ্যে ছিল প্রায় গড়ে 18 মিটার এবং 1842 ও 1935-এর মধ্যে ছিল গড়ে প্রায় 7 মিটার।

এই প্রসঙ্গে নেপাল পর্বতারোহণ সংস্থার (Nepal Mountaineering Association) ডিরেক্টরের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। আজ থেকে 50 বছর আগে এডমন্ড হিলারী ও তেনজিং নোরগে (Edmond Hillary and Tenzing Norgay) যে স্থান দিয়ে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অরোহণ করেছিলেন তা বর্তমানে সরেছে প্রায় 4·8 কিমি অর্থাৎ বেড়েছে অতিরিক্ত প্রায় 2 ঘণ্টার পথ।

⇨ (5) সুমেরু ও কুমেরু সাগরে বরফের গলন (Melting of Arctic and Antarctic ice) : পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণের আর্টিক ও অ্যান্টার্টিকার বিস্তৃত বরফরাশিও গলতে শুরু করেছে অস্বাভাবিক হারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন গত 1958 থেকে 1976-তে যেখানে সুমেরুতে বরফের গড় উচ্চতা ছিল 3 মিটার তা 1993 থেকে 1997-এর গড় হিসাবে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় 1·8 মিটারে। অর্থাৎ গত 30 বছরে সুমেরুর বরফ প্রায় 40% আয়তনে কমেছে—বছরে গড়ে সংকুচিত হয়েছে প্রায় 38,000 বর্গ কি.মি.। বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন যে এভাবে চলতে থাকলে আগামী 50 বছরের পর সুমেরুর গ্রীষ্মে আর কোনো বরফ পাওয়া যাবে না।

কুমেরু অঞ্চলেও প্রায় 5°F হারে গত 50 বছরে প্রায় 5°F তাপমাত্রা বেড়েছে। ফলে বিশাল বিশাল হিমশৈল দক্ষিণ মেরুর মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

⇨ (6) ক্রান্তীয় রোগের প্রাদুর্ভাব (Outbreak of Tropical diseases) : ক্রান্তীয় অঞ্চলে বিভিন্ন নিত্যনতুন রোগের প্রার্দুভাবের কারণও এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি। নিউজিল্যান্ড-এর "ওয়েলিংটন স্কুল অফ

মেডিসিনের" চিকিৎসকরা এ বিষয়ে গবেষণা করেন। তাদের মতে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘন ঘন ডেঙ্গু জ্বরের (Dengue fever) প্রাদুর্ভাবের পিছনে গ্লোবাল ওয়ার্মিংই দায়ী। এই একই কারণে আফ্রিকার নিত্য নতুন দেশে পীতজ্বরের (yellow fever) প্রকোপও দেখা দিচ্ছে। হার্বার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের (Harvard's School of Public Health) চিকিৎসকদের মতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে বর্তমানে এনকেফালাইটিস (encephalitis), ম্যালেরিয়া (malaria) ইত্যাদির মত রোগ সমূহ এশিয়া, লাটিন অ্যামেরিকা কিংবা আফ্রিকা মহাদেশের উচ্চ অংশে দেখা দিচ্ছে যা গত 50 বছরে প্রায় ঘটেনি।

(7) অন্যান্য প্রভাব (Other symptoms) ঃ গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর অন্যান্য প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হল সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের চারিদিকে সমুদ্র জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি (Sea level rise)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউটের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে প্রতি 20 বছরে এক ইঞ্চি করে। পৃথিবীর প্রবাল দ্বীপগুলি তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে দারুন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। গত 2000 অক্টোবরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত "নাইন্থ ইনটারন্যাশনাল কোরাল রীফ সিম্পোজিয়ামে"র তথ্য (9th International Coral Reef Symposium) অনুসারে ইতিমধ্যে পৃথিবীর প্রায় 27% প্রবাল দ্বীপ নষ্ট হয়ে গেছে। আগামী 20 বছরে বাকি দ্বীপগুলোর প্রায় সমস্ত প্রবাল মারা যাবে যদি বর্তমান হারে গ্লোমাল ওয়ার্মিং থাকে। অ্যান্টার্টিকায় আলগির (algae) উপর নির্ভরশীল ক্রিলের (Krill) সংখ্যা ক্রমশ কমা এবং পাখিদের পরিযায়ীয়তার (migratory nature) পরিবর্তনও গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

1.4. ○ বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাস এবং ওজোনস্তরে ছিদ্র (Atmospheric ozone gas and ozone hole in ozonosphere)

1.4.1. ওজোন ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য (Definition and Characteristics of ozone gas)

ওজোন হলো নীলরঙের মৎস গন্ধযুক্ত এক ধরনের গ্যাস— অক্সিজেনের সঙ্গে যার তফাৎ খুব সামান্য। ওজোনকে অক্সিজেন গ্যাসের রূপভেদও বলা যায়। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু পুড়ে তৈরী হয় একটি ওজোন অণু (O_3)। 1840 খ্রিঃ বিজ্ঞানী স্কোজবি (Sconbien) সর্বপ্রথম ওজোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

বায়ুমণ্ডলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উচ্চ অংশে প্রাকৃতিক কারণে অক্সিজেন অণু এবং অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয়। সমগ্র স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও এর ঘনত্ব সর্বাধিক থাকে 15–35 কিমি উচ্চতায়। এই অংশ ওজোনস্তর (Ozone layer) বা ওজোনোস্ফিয়ার (Ozonosphere) নামে পরিচিত। ওজোনোস্ফিয়ারে ওজোনের গাঢ়ত্ব খুবই কম— মাত্র 10 ppm। একে ভূপৃষ্ঠের বায়ুচাপ ও তাপমাত্রায় নিয়ে এলে 3 মিলিমিটার পুরু বাতাসের মত হবে এবং ওজন হবে প্রায় 30 কোটি টনের মত। ওজোনের সর্বাধিক গাঢ়ত্ব ক্রান্তীয় অঞ্চলে 25 কিমি উর্ধ্বে, 21 কিমি উর্ধ্বে মধ্য অক্ষাংশে আর 18 কিমি উর্ধ্বে মেরু অঞ্চলে।

সাধারণত বায়ুমণ্ডলে ওজোনের ঘনত্বকে পিপিত্রম (ppm) এর বদলে ডবসন এককে (Dobson unit) প্রকাশ

করা হয়। এক ডবসন (DB) একক বলতে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 0·001 মিলিমিটার পুরু ওজোনের ঘনত্বকে বোঝায়। ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে ওজোনের ঘনত্ব ক্রমশ বাড়ে। ক্রান্তীয় (0° – 30°) অঞ্চলে এই ঘনত্ব মাত্র **250 DU** । নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের (30° – 60°) বায়ুমণ্ডলে ওজোনোর স্বাভাবিক ঘনত্ব **350 DU** এবং মেরু দেশীয় অঞ্চলে (60°-এর অধিক) প্রায় **450 DU**।

নিম্ন অক্ষাংশ থেকে উচ্চ অক্ষাংশে ওজোনের ঘনত্ব অধিক হওয়ার মূল কারণ স্ট্র্যাটোস্ফিরিক অঞ্চলে নিয়মিত উচ্চ বায়ু প্রবাহের ফলে ক্রান্তীয় অঞ্চলের থেকে উপমেরু অঞ্চলে ওজোন গ্যাসের পরিবহন বা স্থানান্তর।

1.4.2. বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের উৎপত্তি (Origin of O_3 gas in the atmosphere)

সূর্য থেকে অনবরত যে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁচাচ্ছে তার সঙ্গে অতিবেগুনি বা আল্টাভায়োলেট (Ultra violat rays) রশ্মিও আসছে। এই অতিবেগুনি রশ্মিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা—

- (i) ইউ ভি এ (UV-A) — তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 315 – 400 nm*
- (ii) ইউ ভি বি (UV-B) — তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 280 – 315 nm
- (iii) ইউ ভি সি (UV-C) — তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 100 – 280 nm

দেখাগেছে এই অতিবেগুনি রশ্মির মধ্যে সবচেয়ে কম যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ইউ ভি সি এবং খানিকটা ইউ ভি বি বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনকে ভেঙে জয়মান অক্সিজেন তৈরী করে। আর এই জায়মান অক্সিজেন পরমাণু (O) আর একটি অক্সিজেন অণুর (O_2) সঙ্গে মিলে ওজোন তৈরী করে। এই শেষোক্ত বিক্রিয়াটি প্রচণ্ড তাপ উৎপাদক হওয়ায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে বায়বীয় তাপমাত্রা ট্রপোস্ফিয়ারের তুলনায় অনেক বেশি হয়।

$$O_2 \xrightarrow{UV\ C + UV-B} [O] + [O]$$

$$2O_2 + 2\ [O] \rightarrow 2O_3 + \text{তাপ}$$

আবার যেসব আলট্রাভায়োলেট রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব বেশি (মূলত UV – A) তারা ওজোনকে ভেঙে আবার অক্সিজেন অণু (O_2) ও অক্সিজেন পরমাণু (O) সৃষ্টি করে।

$$O_3 \xrightarrow{UV\ A} O_2 + (O)$$

এভাবেই দিবালোকে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্সিজেন থেকে ওজোন উৎপন্ন হয় এবং তার বিযোজন হয় ও পুনরুৎপাদন হয়। প্রতিদিন প্রায় 350,000 মেট্রিকটন ওজোন বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি এবং পাশাপাশি ধ্বংস হচ্ছে। ফলে ওজোনের গাঢ়ত্ব এই গতিশীল সাম্যাবস্থায় প্রায় স্থির থাকে।

তাছাড়া উপরের বিক্রিয়া থেকে আমরা জানতে পারি যে সূর্য থেকে বিকিরিত অতিবেগুনি রশ্মির অধিকাংশই এই ওজোনস্তরে আটকে যাচ্ছে নানা কারণে, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীতে এই অতিবেগুনি রশ্মি আসতে পারছে না। অন্যভাবে বলা যায় ওজোন স্তর একটি ছাতার মতো আমাদের পৃথিবীকে অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। তাই একে বলা হয় পৃথিবীর ছাতা (Umbrella of the earth)।

10^{-9}m = 1 nm (Nanometer)

এখন প্রশ্ন হলো এই ওজোন গ্যাস বায়ুমণ্ডলের অন্যত্র পাওয়া যায় না কেন, কিংবা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সর্বত্র সমান ঘনত্বে বিরাজ করে না কেন?

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের সর্বত্র ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব সমান নয়। নিম্ন ও মধ্য স্তরে (15 – 35 কিমি) ওজোনের ঘনত্ব সর্বাধিক। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের এই অসমবন্টনের মূল কারণ ওজোন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তের তারতম্য। প্রকৃতপক্ষে ওজোনের ঘনত্ব বা পরিমাণ নির্ভর করে ইউভি সি এবং অক্সিজেন অণুর ঘনত্বের উপর। সর্বাধিক ওজোন উৎপন্ন হয় যখন ইউভি সি এবং অক্সিজেন অণুর ঘনত্বের গুনফল সর্বাধিক হয়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উচ্চ স্তরে (35 – 50 কিমি) ইউ ভি সি-এর ঘনত্ব কম থাকে কিন্তু ইউ ভি বি-এর পরিমাণ বেশি থাকে অর্থাৎ বায়ুস্তর পাতলা থাকে। ফলে অক্সিজেনের বিয়োজনে উৎপন্ন অক্সিজেন পরমাণুর ঘনত্ব বেশি থাকে এবং অবিয়োজিত আনবিক অক্সিজেনের (O_2) পরিমাণ কম থাকে। এই আনবিক অক্সিজেনের ঘনত্ব কম হওয়ার কারণে পারমাণবিক এবং আনবিক অক্সিজেনের সঙ্ঘর্ষে উৎপন্ন ওজোনের পরিমাণ এই স্তরে অপেক্ষাকৃত কম হয়।

আবার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যস্তরে (15 – 35 কিমি) ইউ ভি-বি-এর পরিমাণ কম থাকে। ফলে আনবিক অক্সিজেনের পরিমাণ পারমাণবিক অক্সিজেনের চেয়ে বেশি থাকে এবং বিক্রিয়ায় বেশি ওজোন উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ঘনত্ব হয় সর্বাধিক। কিন্তু নিম্নস্তরে (20 – 25 কিমি) ইউ ভি-বি-এর পরিমাণ এতই কম থাকে যে যথেষ্ট সংখ্যক পারমাণবিক অক্সিজেন উৎপন্ন হতে পারে না। ফলে ওজোন গ্যাসও উৎপন্ন হয় খুবই কম।

1.4.3. বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের গুরুত্ব (Importance of ozone layer in the atmosphere)

ভূ-পৃষ্ঠে ওজোন গ্যাস একটি পরিবেশ দূষক পদার্থ হিসাবে কাজ করলেও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের ওজন পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণের রক্ষক হিসাবে কাজ করে। ওজনের একটি পাতলা স্তর সূর্যকিরণ থেকে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির বেশির ভাগ অংশকেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আটকে দেয়। অর্থাৎ ওজোন স্তর পৃথিবীর জীব পরিবেশের প্রাকৃতিক সৌর পর্দা বা ছাতা হিসাবে কাজ করে। কোনো কারণে ওজোনস্তরে ছিদ্র তৈরী হলে পৃথিবীতে ক্ষতিকারক ইউ ভি বি রশ্মির আগম ঘটবে। ফলে জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। মনে রাখা দরকার পৃথিবী সৃষ্টির বহু কোটি বছর পর পৃথিবীতে প্রাণ এসেছিল মূলত অক্সিজেন হীন, ওজোনস্তর হীন বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশের জন্য। অগভীর সাগরের তলদেশে প্রথম প্রাণ এসেছিল, কারণ জল অতিবেগুনী রশ্মি আটকে দেয়। পরবর্তীকালে স্বভোজী সবুজ উদ্ভিদের আবির্ভাবে বাতাসে অক্সিজেন জমে ওজোন স্তর সৃষ্টি করেছিল। তারপরই জৈববিবর্তনে পৃথিবীতে প্রাণের সমারোহ এসেছিল।

সুতরাং সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর ক্ষমতা ভয়ঙ্কর। আর এই ওজোন স্তরের সামান্য এক শতাংশ ক্ষয় ঘটলে পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্ষতিকারক ইউ ভি-বি-র মাত্রা বা তীব্রতা দুই শতাংশ বেড়ে যায়। এখন দেখা যাক এই ইউ ভি-বি রশ্মি জীবজগতের কি কি ক্ষতি করতে পারে।

(1) জীবদেহে কার্বন-কার্বন, কার্বন-হাইড্রোজেন, অক্সিজেন-হাইড্রোজেন ইত্যাদি বন্ধন (Bond) রয়েছে। বেশির ভাগ রাসায়নিক বন্ধন ভাঙতে শক্তি লাগে মোটামুটি $6{\cdot}95 \times 10^{-19}$ জুলের মত। 200 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ চুম্বকীয় (যেখানে UV-B-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় 280 – 315 nm) রশ্মির শক্তিমাত্রা প্রায় $9{\cdot}93 \times 10^{-19}$ জুল প্রতি ফোটনে। সুতরাং অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে জীবদেহের যে কোনো রাসায়নিক বন্ধন সরাসরি ভাঙতে

সক্ষম। ফলে জীবদেহে নানারকম বিপত্তির সৃষ্টি হয়।

➪ (2) অতি অল্পবয়সেই চোখে ছানি (eye cataract) পড়তে পারে। তথ্য বলে ইউ ভি বি রশ্মির তীব্রতা যদি 10 শতাংশ বাড়ে তাহলে 50 বছরের কম বয়সের মানুষের চোখে ছানি পড়ার সম্ভাবনা অন্তত 6 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে অন্ধ হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

➪ (3) ত্বকের উপর নানারূপ ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে এই ইউ ভি-বি রশ্মি। অল্প বয়সেই ত্বক কুঁচকে বয়স্ক মানুষের মতো হতে পারে। কখনো কখনো ত্বক পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে (Suntan)। তাছাড়া ইউ ভি বি রশ্মি ত্বকের ক্যানসার (Cancer) ঘটাতে সক্ষম। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় ম্যালিগনেন্ট ত্বক ক্যানসারের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিজ্ঞানীরা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে দায়ী করছেন।

➪ (4) ইউ ভি বি রশ্মির দীর্ঘকালীন প্রভাবে মানুষের অনাক্রমতা (immunity) কমে। ফলে মানুষ খুব সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়।

➪ (5) গাছের পাতার সালোক-সংশ্লেষ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া ইউ ভি-বি রশ্মির প্রভাবে সরাসরি উদ্ভিদের পাতা, ফল এবং বীজের বৃদ্ধি হ্রাস পায়।

➪ (6) সমুদ্রের এককোষী উদ্ভিদ এবং মাছের একমাত্র খাদ্য ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধি কমে যায়। ফলে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র যেমন নষ্ট হবে তেমনি মাছের উৎপাদনও অস্বাভাবিক কম হবে।

1.4.4. বর্তমান বায়ুমণ্ডলে ওজোনের অবস্থা (Present condition of ozone in the atmosphere) ঃ

আমরা আগেই জেনেছি ওজোন গ্যাস মাপবার জন্যে যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে ডবসন একক (Dobson Unit) বলে। সাতের দশকের প্রথম দিকে ওজোন মণ্ডলে ওজোনের এই পরিমাণ ছিল 220 ডবসন। বিজ্ঞানীরা প্রথম আন্টার্কটিকায় আকাশে ওজোনস্তর পাতলা হয়ে আসছে ধরতে পারেন 1985 তে। ঐ সময় বৃটিশ বিজ্ঞানী ডঃ জে সি ফারমেন এবং তার সহকর্মীরা অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন হোল দেখতে পান। দেখা যায় ঐ অঞ্চলে ওজোনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 120 – 125 ডবসনের মতো। প্রথম দিকে এই নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায়নি। কারণ এসব অঞ্চলে মানুষের বসবাস নেই। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে দক্ষিণ গোলার্ধের মতো উত্তর গোলার্ধের ওজোনস্তরও পাতলা হয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি পৃথিবীর নানাস্থানে কম বেশি ওজোনস্তরের ক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

1.4.4.1 অ্যান্টার্কটিকায় ওজোনছিদ্র (Ozone hole over Antarctica)

1970-এর পর থেকে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে অ্যান্টার্কটিকার ওজোনস্তর অতিদ্রুত পাতলা হচ্ছে। বিজ্ঞানী ফারমেন একে অ্যান্টার্কটিক ওজোন হোল (Antarctic ozone hole) নামে অভিহিত করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রতি বসন্তে (ঐ সময় অ্যান্টার্কটিকায় বসন্তকাল) প্রায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম আয়তনের এক মহাছিদ্র অ্যান্টার্কটিকার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে সৃষ্ট হয় এবং তা আশে পাশের দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। 1993 সালে অক্টোবরের প্রথমে ওজোন ঘনত্ব নেমে আসে সর্বাধিক 90 ডবসনে। বর্তমানে এই মাত্রা আরও কমেছে। অর্থাৎ অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন ক্ষয়ের পরিমাণ গড়ে 50 – 60

শতাংশ। 2000 খ্রিস্টাব্দে NASA-র বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে পাওয়া গেছে যে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের ওপরের ওজোন স্তরে প্রায় 3 কোটি বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে এক বিশাল গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে।

1.4.4.2 ওজোন হোল সৃষ্টির কারণ (Causes of ozone depletion)

বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি ও ধ্বংস একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু কোনো কারণে ওজোনের সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের হার বেশি হলে স্বাভাবিক ভাবে ওজোনস্তর ক্রমশ পাতলা হবে, ফলস্বরূপ তৈরী হবে 'ওজোন হোল' **(Ozone hole)**। কিন্তু এই ওজোন ক্রমশ কমে যাবার কারণ কি? এর কারণ হিসাবে রসায়নবিদরা যে সব তথ্য দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্লোরিন দৃষ্ট পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সবচেয়ে আদর্শ জায়গা অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ।

অ্যান্টার্কটিকায় 6 মাস শীতকাল থাকে। ঐ সময় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শীতকালীন তাপমাত্রা নেমে যায় – 88°C পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মে তা আবার 11°C পর্যন্ত ওঠে। শীতকালে তাই এই নিম্ন তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলীয় সমস্ত দূষক গ্যাস জমাট বেঁধে কেলাসাকারে পোলার স্ট্র্যাটোস্ফিরিক মেঘে (Polar stratospheric clouds – PSC) পরিণত হয়। এই সময় জমাট বাঁধা প্রধান দূষক গ্যাসগুলি হলো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl), জলীয় বাষ্প (H_2O), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_2) এবং ক্লোরিন নাইট্রেট ($ClONO_2$)। এই অবস্থায় HCl এর সঙ্গে $ClONO_2$ এর বিক্রিয়ায় ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং প্রচণ্ড শীতে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিচের দিকে সঞ্চিত হয়।

বসন্তের শুরুতে (সেপ্টেম্বর অক্টোবরে) সূর্য কিরণের আবির্ভাব হয় এবং ক্লোরিন অতিবেগুনি রশ্মির দ্বারা বিযোজিত হয়ে ক্লোরিন পরমাণুতে পরিনত হয় (Cl) যা প্রবল বিক্রমে অনুঘটকীয় ক্রিয়াবিধিতে ওজোন স্তরের ক্ষয় করে চলে। তৈরী হয় 'ওজোন হোল'।

বিক্রিয়া ঃ

(i) বসন্তের বায়ুমণ্ডলে অক্সিক্লোরাইড মূলক উৎপাদন ঃ $Cl^{\bullet} + O_3 \rightarrow ClO^{\bullet} + O_2$

(ii) অক্সিক্লোরাইড মূলক নিস্ক্রিয়করণ ঃ $ClO^{\bullet} + NO_2 + M \rightarrow ClONO_2 + M$ (M = অনুঘটক)

(iii) বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন (HNO_3) ঃ

$$ClONO_2 + H_2O \rightarrow HOCl + HNO_3$$

$$ClONO_2 + HCl \rightarrow Cl_2 + HNO_3$$

(iv) প্রাক বসন্তের আলোয় পারমাণবিক ক্লোরিন উৎপাদন ঃ

$$HOCl \xrightarrow{UV-B} HO^{\bullet} + Cl^{\bullet}$$

$$Cl_2 \xrightarrow{UV-B} Cl^{\bullet} + Cl^{\bullet}$$

(v) বসন্তের শুরুতে ওজোন ক্ষয় শুরু ঃ $O_3 + Cl^{\bullet} \rightarrow ClO + O_2$

(vi) আবার একইভাবে ClO থেকে $ClONO_2$ উৎপন্ন হয় এবং এভাবেই চলে এক শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Chain reaction)।]

1.4.4.3 ওজোনস্তর ক্ষয়ে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন যৌগের ভূমিকা (Role of CFCs in O_3 depletion)

ওজোনস্তর ধ্বংসকারী ক্লোরিন পরমাণুর প্রধান উৎস হচ্ছে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুরোকার্বন বা সি এফ সি (Chloro-fluro carbon – CFC) যৌগ। এই রাসায়নিক পদার্থ ফ্রেয়ন (Freon) গ্যাস নামে পরিচিত, এরা তিন প্রকারের। যথা, ফ্রেয়ন 11 বা $CFCl_3$, ফ্রেয়ন 12 বা CF_2Cl_2 এবং ফ্রেয়ন 113 বা $CF_2Cl - CFCl_2$। এরা বায়ুমণ্ডলের তলার দিকে রাসায়নিক বিক্রিয়া খুব একটা করে না। কিন্তু ওপরের দিকে অতিবেগুনি রশ্মির (UV-Ray) প্রভাবে এরা ভেঙে ক্লোরিন পরমাণু উৎপন্ন করে যা ওজোনস্তর ভাঙতে সক্ষম।

$$CF_2Cl_2 \xrightarrow{UV-C} CF_2Cl^{\bullet} + Cl^{\bullet}$$

$$Cl^{\bullet} + O_3 \rightarrow ClO^{\bullet} + O_2$$

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের বায়ুমণ্ডলে ক্লোরিনের বর্তমান ঘনত্ব 3·5 ppb যা ট্রপোস্ফিয়ারের তুলনায় প্রায় 6 গুন বেশি। এই ভয়ঙ্কর অবস্থার কারণ সাতের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত গড়ে প্রতিবছর বায়ু মণ্ডলে নিক্ষিপ্ত সি এফ সি-র পরিমাণ প্রায় এক মিলিয়ান টন। বিজ্ঞানীরা আরও হিসেব করে দেখেছেন যে সি এফ সি তৈরী হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় 2 কোটি মেট্রিক টন সি এফ সি বায়ুমণ্ডলে মিশেছে। সুতরাং এখন যদি সি এফ সি উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় তাহলেও বর্তমান শতকের শেষপর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ স্বাভাবিক হবে না।

এখন প্রশ্ন হলো এই সি এফ সি কোথা থেকে আসছে? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সি এফ সি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। ফ্রীজ ঠাণ্ডা হবার জন্য সি এফ সি লাগে। এয়ার কন্ডিশনারে আছে সি এফ সি। বিছানার বা সোফার গদির প্লাসটিক ফোম তৈরীতে সি এফ সি ব্যবহৃত হয়। ঘরের বাতাস সুবাসিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্প্রের মূল উপাদান সি এফ সি। এছাড়াও নানা শিল্পে সি এফ সির ব্যবহার আছে (সারণী 1.4)।

সারণী 1.4 : বিভিন্ন সি এফ সি যৌগ ও তাদের ব্যবহার

সি এফ সি	সংকেত	প্রধান ব্যবহার
সি এফ সি – 11	CF_2Cl_3	রেফ্রিজারেটর, গাড়িতে ব্যবহৃত নরম ফোম, স্প্রে ক্যান, নরম কার্পেট
সি এফ সি – 12	CF_2Cl_2	রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, কঠিন প্লাসটিক নির্মাণে, বিভিন্ন সুগন্ধী দ্রব্যে
সি এফ সি – 113	$CF_2Cl - CFCl_2$	গ্রিজ, গ্লু ও বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সারকিট নির্মানে।

1.4.4.4. অন্যান্য ওজোন ধ্বংসকারী যৌগ (Other O_3 destructing elements)

● (i) সি এফ সি ছাড়াও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) ওজোন স্তর হ্রাস করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ধারণ করে।

ঊর্ধ্বাকাশে মিথেন, হাইড্রোজেন পার অক্সাইড ইত্যাদি ভেঙে যায় এবং মিথেন ভেঙে মিথাইল মুক্ত মূলক ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ভেঙে যায় জায়মান অক্সিজেন এবং হাইড্রোক্সিল মুক্তা মূলক তৈরী করে। তাছাড়া জায়মান অক্সিজেন জলীয় বাষ্পের সহিত বিক্রিয়া করেও হাইড্রোক্সিল মুক্ত মূলক গঠন করে। এই হাইড্রোক্সিল আয়ন ওজোন অণুকে ভেঙে তৈরী করে হাইড্রোপার অক্সাইড ও অক্সিজেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রায় 11 শতাংশ ওজোন হ্রাসের এটাই সম্ভাব্য কারণ।

বিক্রিয়া :

(i) $CH_4 \xrightarrow{UV\text{-}B} \dot{C}H_3 + \dot{H}$

মিথেন — মিথাইল মুক্ত মূলক + হাইড্রোজেন মুক্ত মূলক

$\dot{C}H_3 + O_3 \rightarrow CH_3\dot{O} + O_2$

মিথাইল + ওজোন মুক্ত মূলক — মিথক্সি + অক্সিজেন

(ii) $H_2O_2 \xrightarrow{UV\text{-}B} 2H\dot{O}$

হাইড্রোজেন পার অক্সাইড — হাইড্রোক্সিল মুক্ত মূলক

$H_2O_2 \longrightarrow [O] + H_2O$

হাইড্রোজেন পার অক্সাইড — জায়মান অক্সিজেন + জল

$H_2O + [O] \longrightarrow 2H\dot{O}$

হাইড্রোক্সিল মুক্ত মূলক

$H\dot{O} + O_3 \longrightarrow O_2 + HO_2$

হাইড্রোক্সিল মুক্ত + ওজোন মূলক — অক্সিজেন + হাইড্রোপার অক্সাইড মুক্ত মূলক

● (ii) বায়ুমণ্ডলের নাইট্রিক অক্সাইড ওজোনকে অক্সিজেনে ভেঙে দেয়। এখন এই অক্সাইড বিভিন্ন কারণে বায়ুমণ্ডলে আসে। তারমধ্যে অন্যতম হলো বিমানের জ্বালানী তেল পোড়ার ফলে উৎপন্ন হয় এই অক্সাইড যা ভূ-পৃষ্ঠের উপরে প্রায় 9–13 কিমি মধ্যে দীর্ঘ সময় ভেসে থাকতে পারে। এই অক্সাইড যখন আরও উর্ধ্বে ওজোনের সংস্পর্শে আসে তখন বিক্রিয়ায় ওজোন অণু ভেঙে যায়— ফলে পাতলা হতে থাকে ওজোনস্তর।

বর্তমানে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যে সুপার সোনিক ও হাইপারসোনিক প্লেন চালানোর ফলে এই ক্ষতির সম্ভাবনা আরও বাড়ছে।

$$NO_2 \xrightarrow{\text{UV-B}} NO + [O]$$

নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড — নাইট্রিক অক্সাইড + জায়মান অক্সিজেন

$$NO + O_3 \longrightarrow NO_2 + O_2$$

নাইট্রিক অক্সাইড + ওজোন — নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড + অক্সিজেন

1.4.5. ওজোন বিনাশে প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Measures to protect O_3 depletion)

➪ (1) প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যে প্রথম বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ নেওয়ার উদ্যোগে 1970-এ স্টকহোম বৈঠক সি এফ সি উৎপাদন ও ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা শুরু হয়। প্রথম স্ক্যান্ডেনিভিয়ান দেশসমূহ সুগন্ধী অ্যারোসল উৎপাদনে সি এফ সি যৌগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং উত্তর আমেরিকার দেশসমূহে যথারীতি বিশ্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সি এফ সির উৎপাদন কমার বদলে বেড়েই চলল। এর পরে 1987 (মন্ট্রিয়াল), 1990 (লন্ডন) ও 1992 (কোপেন হাগেন)তে আবার উদ্যোগ শুরু হয়, এবং ঠিক হয় 1995 এর মধ্যে সমস্ত উন্নত দেশে সি এফ সি এবং হ্যালোন উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হবে। সেই সঙ্গে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) এবং মিথাইল ক্লোরোফর্ম (CH_3CCl_3) এর উৎপাদন ধারাবাহিক ভাবে কমিয়ে আনতে সকলেই সম্মত হয়। সম্মেলনে আরও বলা হয় এই সমস্ত ব্যবস্থা গৃহীত হলে 1995 – 2005 সাল অবধি বায়ুমণ্ডলে ক্লোরিণের ঘনত্বের কোনো পরিবর্তন হবে না, 2005 সালের পরে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ক্লোরিনের ঘনত্ব হ্রাস পাবে। এবং এই ক্লোরিনের ঘনত্ব 2ppb-এ নেমে না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় 2075 সাল পর্যন্ত নিয়মিত ওজোন হোল দেখা যাবে অ্যান্টার্কটিকায়।

➪ (ii) সারা পৃথিবী জুড়ে অপর যে পদ্ধতির কথা ভাবা হচ্ছে তা হলো সি এফ সি প্রতিস্থাপনযোগ্য বিকল্প পদার্থের সন্ধান। CFC – 11 ও CFC – 12-এর বিকল্প হিসাবে যে সব রাসায়নিক যৌগ পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হলো HCFC – 123, HCFC – 123a, HCFC – 141b, HCFC – 22, HFC – 134a ইত্যাদি। এগুলি ক্লোরিন বিহীন হওয়ায় ওজোন বিনাশের সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে এরা ক্ষনস্থায়ী। সর্বোপরি আরও কতগুলি প্রযুক্তি বা বিকল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলি প্রচলিত হলে বায়ুমণ্ডলে সি এফ সি গ্যাস অবাধে মেশাবার পরিমাণ অনেক কমবে।

➪ (iii) কীটনাশক স্প্রে, ক্লীফ, এজেন্ট প্রভৃতির ক্ষেত্রে এতদিন সি এফ সির বহুল প্রচলন ছিল। বর্তমানে অন্যান্য হাইড্রোকার্বন দিয়ে এই কাজ করার চেষ্টা উন্নত দেশগুলোতে শুরু হয়েছে। ফুড প্যাকেজ তৈরীতে মোমের বদলে পিচবোর্ড বা খড়ের মণ্ড থেকে তৈরী বাক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। তাপনিরোধক পদার্থ হিসাবে সি এফ সির বদলে ফাইবার গ্লাসের আরও প্রচলন বাড়ানো যেতে পারে। তবে এখনও সি এফ সির তুলনায় এই

সমস্ত প্রযুক্তি অনেক বেশি দামী এবং সেই কারণে দরিদ্র্য দেশসমূহের পক্ষে এই সমস্ত প্রস্তাব মানা খানিকটা দুঃসাধ্য।

তাসত্ত্বেও আমাদের এইসব ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করতে হবে। অন্তত পৃথিবী ও তার জীবকূলকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে। বাস্তবিকই অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। কারণ আজই যদি পৃথিবীর সর্বত্র সি এফ সি কিংবা হ্যালন উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলেও ইতিমধ্যে যে বিপুল পরিমাণ ওজোনস্তরের ক্ষয় হয়েছে তা পূরণ করতে অন্তত আরো 100 বছর লেগে যাবে।

1.5. ○ পরমাণু চুল্লী ও তেজস্ক্রিয় দূষণ (Atomic Plants & Radioactive Pollution)

1.5.1. পরমাণু চুল্লি (Atomic Plant)

পরমাণু বিজ্ঞান বয়সে খুব প্রবীন হলেও পরমাণু প্রযুক্তি একেবারেই হাল আমলের। 1938 সালে জার্মান বিজ্ঞানী অটোহান ও স্ট্রাসম্যান গতিশীল নিউট্রন কণা দিয়ে ইউরেনিয়াম 235 (U^{235}) এর পরমাণুকে আঘাত করে এক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করেন। ঘটনাটি হল U^{235} ভেঙে গিয়ে বেরিয়াম ও ক্রিপটন নামে দুটি ভিন্ন মৌলের জন্ম এবং সেই সঙ্গে প্রচুর শক্তি ও তিনটি নিউট্রন কণা তৈরী। এই কণাগুলি আবার নতুনভাবে আঘাত করতে থাকে U^{235} কে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে লাগাতার— একে বলে শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Chain reaction)। এখন প্রতিটি U^{235} ভেঙে যে মৌল কণা ও নিউট্রনের জন্ম হচ্ছে তার মোট ভর বিভাজনের আগের U^{235} এবং নিউট্রনের ভরের চেয়ে কম। অর্থাৎ হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভর, এই ভরই বিজ্ঞানের নিয়মে তৈরী করে শক্তি— এর পরিমাণও কিন্তু খুব কম নয়। প্রায় 1 কেজি ইউরেনিয়াম থেকে এভাবে নিমেষে উৎপন্ন হতে পারে 29×10^{13} ক্যালরি তাপ। এই বিপুল পরিমাণ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহার করা হয় একধরনের ঘর বা চুল্লি যার প্রচলিত নাম পরমাণু চুল্লি বা রিয়াক্টার। পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী এনারিকো ফের্মি এই ধরনের চুল্লি বা রিয়াক্টর আবিষ্কার করেন।

1.5.2. পরমাণু বিদ্যুৎ (Atomic Energy)

পরমাণু চুল্লির ক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম বিভাজিত হয়ে তৈরী করে প্রচুর তাপ শক্তি। সেই তাপে জল ফুটে হয় বাষ্প এবং সেই বাষ্পের চাপে টারবাইন ঘুরে উৎপন্ন করে বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুতের নাম পারমাণবিক বিদ্যুৎ। রিয়াক্টর চালিয়ে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয় USA-এ তে। তারপর শুরু হয় রাশিয়া, UK এবং ফ্রান্সে 1950-এর দশকের প্রথম দিকে। এই কটি দেশ পরবর্তী সময়ে বাণিজ্যিক ভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে রিয়াক্টর বাণিজ্যিক ভাবে রপ্তানী করে। বলাবাহুল্য রপ্তানী তালিকার শীর্ষে USA। বর্তমান বিশ্বে মোট 65টি রিয়াক্টর রপ্তানীর ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে 50টি USA এর।

বর্তমানে (2005) পৃথিবীতে মোট চালু পরমাণু চুল্লির সংখ্যা প্রায় 442টি যার থেকে পৃথিবী পায় প্রায় 17 শতাংশ বিদ্যুৎ। সবচেয়ে বেশি চুল্লি আছে USA-তে। তবে মোট বিদ্যুতের সবচেয়ে বেশি পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপন্ন

করে ফ্রান্স। পরমাণু বিদ্যুতে উন্নত আরও অন্যান্য কয়েকটি দেশ হল কানাডা, রাশিয়া, জার্মানী, ইংল্যান্ড, ইটালী, জাপান, চীন ইত্যাদি। ভারত এই তালিকায় থাকলেও এখন পর্যন্ত ভারত মাত্র 2 শতাংশ (মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের) বিদ্যুৎ পরমাণু ভেঙে পায়। এখন পর্যন্ত প্রায় 42 টি দেশে পরমাণু চুল্লি রয়েছে এবং পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে গুটিকয়েক দেশ ছাড়া বেশিরভাগ দেশ পরমাণু প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর নয়। অর্থাৎ তাদেরকে অন্যদেশ থেকে রিয়াক্টর, ভারী জল ইত্যাদি আমদানি করতে হয়।

সারণী 1.4 : একনজরে পৃথিবীর পরমাণু চুল্লি ও পরমাণু বিদ্যুৎ (2005)

1. বর্তমানে (অক্টোবর, ২০০৫) মোট পরমাণু চুল্লি	442
2. প্রথম পরমাণু চুল্লি (1954)	অবনিস্ক (Obnisk), রাশিয়া
3. বৃহত্তম পরমাণু চুল্লি	চুজ (Chooz), ফ্রান্স, 1455 mw
4. বিশ্বে মোট বিদ্যুতের কত শতাংশ উৎপাদিত হয় এই বিদ্যুৎ থেকে	17%
5. কতগুলি দেশে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে	31
6. বিশ্বের ইতিমধ্যে কতগুলি পারমাণবিক চুল্লি বন্ধ হয়েছে / পরিত্যক্ত হয়েছে	117

উৎস : World-nuclear Org. / Portal / nuclear-power plants.

1.5.3. পরমাণু চুল্লি জনিত সমস্যা (Problems related to Atomic Plants)

1.5.3.1 তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (Radioactive Radiation)

পরমাণু চুল্লিতে বেশ কিছু মৌলিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় এবং বেশ কিছু মৌলিক পদার্থ নতুনকরে উৎপন্ন হয়। এরা সাধারণত অস্থায়ী এবং স্থায়িত্বের জন্য আলফা, বিটা, গামা এই তিন ধরনের রশ্মি বিকিরণ অনবরত করে চলেছে। এদেরকে তেজস্ক্রিয় মৌল এবং এদের রশ্মিকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বলে। এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম অর্থাৎ ভেদন ক্ষমতা (Penetrating power) বেশি, ফলে প্রাণীদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তেজস্ক্রিয় রশ্মি তীব্র বুলেটের মত জীবদেহের কোষে আঘাত করে। ফলে কোষের গঠনের পরিবর্তন হয় এবং তার রাসায়নিক সাম্য বিঘ্নিত হয়। ক্ষতিগ্রস্থ কোষের বিকৃতি ঘটে এবং তার থেকে জন্ম হয় আর এক বিকৃত কোষ; এভাবে দীর্ঘদিন চললে জেনেটিক মিউটেশন তথা ক্যানসার হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি সরাসরি পরিবেশে চলে এলে কি ঘটতে পারে তার প্রমাণ আজও বহন করে চলেছে জাপানের হিরোসীমা ও নাগাসাকি অঞ্চল। 1945 সালের 6 ও 9 আগষ্ট জাপানের এই দুই শহরে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র পর পর দুটি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। অধিক তাপে তাৎক্ষনিক মৃত্যুর হিসেবকে সরিয়ে রাখলেও বাকি চিত্রটাও যথেষ্ট ভয়াবহ। কাছাকাছি অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরণের শিকার হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়। আর দূরবর্তী এলাকার মানুষ যারা কম বিকিরনের শিকার হন তারা পরবর্তীকালে ক্যান্সার ও লিউকোমিয়া ইত্যাদি রোগে মারা যান, যারা আরও কিছুটা দূরের মানুষ তাদের বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ দেখা গেলনা তবে তারা বংশপরম্পরায় আজও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিচ্ছে।

পৃথিবীতে যেখানে পরমাণু চুল্লি রয়েছে তার চারিপাশে অনুসন্ধান করলে এজাতীয় তথ্য নজরে পড়ে। রাশিয়ার চেরনোবিল (1986) কিংবা USA-এর থ্রিমাইল আইল্যান্ড (1979) এর কথা বাদ দিলেও খবরে প্রকাশ USA-এর পেনসেলভেনিয়ার শিপিং পেটি চুল্লি কিংবা ইংল্যান্ডের উইন্ডস্কেল পরমাণু চুল্লি কাছাকাছি অঞ্চলের মানুষজনের বিগত 20–25 বছরে রক্তের ক্যান্সার ও অন্যান্য ক্যান্সারে হার অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। আমাদের ঘরের কাছের যদুগোড়ার ইউরোনিয়াম খনির শ্রমিকদের প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মহার ও ক্যান্সারে আক্রান্তদের সংখ্যা বেড়েছে অনেকগুণ। কেরল ও তামিলনাড়ুর 55 মিমি দীর্ঘ মোমাজাইট সমৃদ্ধ বালু অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় 70 হাজার অধিবাসীর উপর সমীক্ষা চালিয়ে একই তথ্য পাওয়া যায়।

পরমাণু চুল্লির গড় আয়ু 50 বছর। এই সময় ধরে পরমাণু চুল্লি কেবলমাত্র তেজস্ক্রিয় দূষণ ছড়ায় না, এই সময়ের পরে প্রতিটি পরমাণু চুল্লি তেজস্ক্রিয় দূষকে পরিণত হয়। সেইজন্য সেই পরিত্যক্ত চুল্লীকে তখন মোটা শিশার মোড়কে মাটির নীচে কবর দেওয়া হয়। অবশ্য সেটিও নিরাপদ ব্যবস্থা নয়, তাছাড়া তাতে খরচের বহরও অনেকগুন বেড়ে যায়।

1.5.3.2. তেজস্ক্রিয় আবর্জনা (Radioactive disposals)

একটি পরমাণু চুল্লি কেন্দ্রের জীবনকাল সর্বোচ্চ 50 বছর ধরলে মোট যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আবর্জনা তৈরী করে তার পরিমাণ কিছু কম নয়। প্রতিটি কেন্দ্র তাপ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্লুটোনিয়াম সহ প্রায় 200 টি তেজস্ক্রিয় পদার্থ নতুন করে তৈরী করে। দাবী করা হয় গ্যাসীয় আবর্জনাকে পরিশ্রুত করে বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এই পরিস্রাবণ এবং তেজস্ক্রিয়তা নির্মূলকরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তেজস্ক্রিয় তরল আবর্জনা খুব কম মাত্রায় তেজস্ক্রিয় এবং তা কিছুকাল আটকে রেখে নদী নালা বা সাগরে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই সময় অবশ্য তেজস্ক্রিয়তা পরিবেশে মেশে এবং পরিবেশকে তেজস্ক্রিয় করে তোলে। তাছাড়া এই ছেড়ে দেওয়া তরল আবর্জনা 100 শতাংশ তেজস্ক্রিয়তা মুক্ত নয়।

অন্যান্য কঠিন আবর্জনার মধ্যে অন্যতম হল প্লুটোনিয়াম। একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে এই প্লুটেনিয়ামকে পরমাণু বোমা তৈরীর জন্য মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য তেজস্ক্রিয় আবর্জনাগুলি নির্বাহের জন্য কোনো বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। পরমাণু শিল্পের গোড়ার দিকে এদেরকে কার্বন স্টীলের পুরু পাত দিয়ে তৈরী বাক্সের ভিতর পুরে তা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হত। শুধুমাত্র USA প্রায় লক্ষের কাছাকাছি এভাবে তৈরী বাক্স বা কক্ষ সমুদ্রগর্ভে ফেলেছে। পরবর্তীকালে তা জানাজানি হলে এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। তারপর থেকে এইসব বাক্সকে ভূগর্ভে পুরু কংক্রীটের কক্ষে কবর দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

তাছাড়া প্লুটোনিয়াম প্রাকৃতিক মৌল নয়। মানুষ এই প্লুটোনিয়াম পরমাণু চুল্লির দৌলতে কৃত্রিমভাবে তৈরী করে চলেছে। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে কমকরে প্রায় 1·5 লক্ষ কেজি প্লুটোনিয়াম সঞ্চিত হয়ে গেছে। আর এই প্লুটোনিয়াম এক ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয় মৌল। ইঁদুরের উপর পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এর এক গ্রামের 10 লক্ষ ভাগের একভাগই ক্যান্সারের মত মারণ ব্যাধি তৈরী করতে যথেষ্ট। উল্লেখযোগ্য যুক্তরাজ্যের শক্তিমন্ত্রকের প্রধান বিজ্ঞানী ক্যালভিন স্পেনসার বলেছিলেন মানুষ নিরাপদে প্লুটোনিয়াম নিয়ে ঘর করার মতো এখনও যথেষ্ট বড় হয়নি। বিজ্ঞানী জন গফম্যানের মতে মাত্র এক পাউন্ড বা প্রায় আধা কিলো প্লুটোনিয়াম দিয়ে যত কোটি মানুষকে মেরে ফেলা যায় তত মানুষ পৃথিবীতে নেই।

1.5.3.3. পরমাণু চুল্লির দুর্ঘটনা (Accidental effect of Atomic Plants)

অন্যান্য শিল্পের মত পরমাণু শিল্পের দুর্ঘটনা স্বাভাবকি, তবে এই দুর্ঘটনা অন্যান্য শিল্প-দুর্ঘটনার চেয়ে পৃথক। অন্যান্য শিল্পে দুর্ঘটনা হলে তার ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার ধারাবাহিকতা সাধারণত মানুষকে বহন করতে হয় না। কিন্তু একটি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনা ঘটলে তার ফল ধারাবাহিক ভাবে বহন করতে হয় বংশ পরম্পরা ধরে। পরমাণু শিল্পের মাত্র 60 বছরের ইতিহাসে ইতিমধ্যে কমবেশি 100 টি বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিশ্বে প্রথম উল্লেখযোগ্য পরমাণু চুল্লি দুর্ঘটনা ঘটে কানাডার ডকবিভার অঞ্চলে 1952 এর 12 ডিসেম্বর। 1957-এর 8 অক্টোবর ইংল্যান্ডে ঘটে উইন্ডস্কেল রিঅ্যাক্টর দুর্ঘটনা। 3 ডিসেম্বর 1961তে USA এর ইজাহোর চুল্লিতে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে। এর পর 1979 তে USA-এর থ্রিমাইল আইল্যান্ডে এবং 1986-তে রাশিয়ার চেরনোবিলের পরমাণু কেন্দ্রে নজিরবিহীন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। অন্যান্য কেন্দ্রের দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা না গেলেও পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম এবং বৃহত্তম চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার তথ্য আজ সকলেরই জানা। 1986 তে চেরনোবিলের চার নম্বর রিঅ্যাক্টারের পাইল ক্যাপ বিস্ফোরিত হয়ে বিপুল তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপকভাবে আকাশে, বাতাসে, মাটিতে, জলে ছড়িয়ে পড়ে। এই তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ ছিল প্রায় 50 মেগাকুরী। তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যু হয়েছিল 24 জনের। সঙ্গে সঙ্গে শক্তিকেন্দ্র থেকে 30 কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রায় 1 লক্ষ মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তেজস্ক্রিয়তার বিলম্বিত প্রভাব আগামী 50 বছর ধরে এদের বহন করতে হবে।

1908–2000 সাল এই 13 বছরের মধ্যে ভারতের পরমাণু চুল্লি বা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে কমপক্ষে 27 টি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে। ভারী জল লিক, টার্বাইন বিস্ফোরণ সহ বিভিন্ন ছোটখাটো দুর্ঘটনা পায়শই লেগে থাকে আমাদের পরমাণু চুল্লিগুলিতে।

সুতরাং একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় মানুষ পরমাণু চুল্লি নিয়ে নিরাপদে ঘর করার মত যথেষ্ট বড় হয়ে এখনো ওঠেনি। পরমাণু চুল্লির দুর্ঘটনা সভ্যতার পক্ষে যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি তা অন্যান্য শিল্পের দুর্ঘটনা থেকে মৌলিকভাবে পৃথক। তাই সারা পৃথিবী জুড়ে পরমাণু চুল্লি বিরোধী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। পাশাপাশি বিকল্প পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎসগুলি নিয়ে গবেষণা ও সঠিক প্রয়োগের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

1.5.4. তেজস্ক্রিয়তা ও পরিবেশ দূষণ (Radioactivity and Environment Pollution) ঃ

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উভয় কারণে তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণে পরিবেশ দূষিত হয়।

● **প্রাকৃতিক কারণ ঃ** মহাশূন্য থেকে অনবরত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic ray) প্রবেশ ঘটে। ফলে বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় মৌল কার্বন - 4 এবং হাইড্রোজেন - 3 উৎপন্ন হয়। এরা সরাসরি বায়োস্ফিয়ারের বা জীবমণ্ডলের উপর বিরূপ ক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সর্বাধিক উৎস বোধহয় প্রকৃতিতে জমে থাকা (ভূ-ত্বকে) ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম আকরিক। এছাড়া মাটির মধ্যে থাকে পটাসিয়াম - 40 এবং রুবিডিয়াম - 87। এরা বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকাকে দূষিত করে চলেছে অনবরত। পাহাড়ের ঝরনার জলও প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার দূষণে শিকার হতে পারে। ঐ সমস্ত ঝরনার বা প্রস্রবণের জলে রেডন 222 এর উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।

● **মানুষ্যসৃষ্ট কারণ ঃ** পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে পরমাণু চুল্লিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহারই মানুষ্যসৃষ্ট

তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রধান কারণ। এছাড়া পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী এবং তার ব্যবহারেও প্রকৃতি ভয়ানক দূষিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় আকরিকের উত্তোলন এবং পরিশোধন প্রক্রিয়ায় এইসব তেজস্ক্রিয় মৌল বায়ু এবং জলে খুব সহজেই মেশে। তাছাড়া পারমাণবিক চুল্লিতে যে জ্বালানি বর্জ্য পদার্থ নির্গত হয় তাতে থাকে প্লুটোনিয়াম, সিজিয়াম এবং স্ট্রনসিয়ামের মত মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এগুলি পরিবেশের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর— তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্লুটোনিয়ামের অর্ধায়ু 2400 বছর। তাই দীর্ঘদিন প্লুটিনিয়ামকে পরিবেশে সংরক্ষিত করে রাখতে হয়। অন্যথায় পরিবেশের সমস্ত জীবদেহের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

1.5.5. জীবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব (Effects of radiation on organisation)

তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ থেকে কমতরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলফা, (α), বিটা (β) ও গামা (γ) রশ্মি বিকিরিত হয়। এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় ভেদন ক্ষমতা বেশি হয় এবং তাই এরা বেশি ক্ষতিকর হয়। প্রাণীদেহের উপর এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব তিন ভাগে ভাগ করা যায়— (i) বিকিরণের মাত্রা অত্যধিক হলে সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য প্রতিক্রিয়া ঘটে, (ii) মাত্রা কম হলে দেহের মধ্যে তা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অতিদীর্ঘ পরে এমনকি 50 – 60 বছর পরেও তার ক্ষতিকর লক্ষণ ফুটে ওঠে। (iii) প্রাণীদেহে বিকিরণে স্পর্শে তার জীবনকাল কোন বাহ্য প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু জননকোষে ক্ষতি হতে পারে। যার জন্য তার নবজাতকের দেহে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তা জীবনধারণ তথা প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কত গুরুত্বপূর্ণ তা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় সহজভাবে। পৃথিবী সৃষ্টির পর ক্ষুদ্র একটি প্রাণের কোষ তৈরী হতে সময় লেগেছিল প্রায় ২০০ কোটি বছর। তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা। এই তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা কমতে কমতে যখন প্রাণের পক্ষে সহনশীল মাত্রায় নেমে এসেছে তখনই প্রাণ সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা তৈরী হয়েছে।

আর এখন আমরা বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা একটু একটু করে বাড়িয়ে চলেছি। এর পরিনাম কত ভয়ঙ্কর তা জানা যায় তাদের জীবনী পড়লে যারা সরাসরি তেজস্ক্রিয় মৌল নিয়ে কাজ করেছিলেন। যে বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা তেজস্ক্রিয় মৌলের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন তারাও এর মারনবিষ থেকে রেহাই পাননি। উলিয়াম রঞ্জন যিনি 'X' রশ্মির জন্মদাতা, তার প্রিয় সহকারীর দুটি হাতই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে নষ্ট হয়ে যায়। মাদাম কুরী যিনি রেডিয়াম মৌল আবিষ্কার করেন তার মৃত্যু হয়েছিল দীর্ঘকালীন তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে। তার কন্যা ইরিন জুলিও কুরিও মারা যান রক্ত ক্যানসারের কারণে। এখন পরমাণুশক্তি কেন্দ্রের ভেতর কিংবা তেজস্ক্রিয় মৌলের সন্ধানে খনি অঞ্চলে যে সমস্ত শ্রমিকরা কাজ করেন তাদের পেশাগত অসুখ গোপনীয়তার কারণে প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু যদি প্রকাশ করার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে দেখা যেত বহু শ্রমিক ক্যানসার, লিউকোমিয়া চর্মরোগ ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সংস্পর্শে আসার অল্প পরেই একজন মানুষের শরীরে বিভিন্ন ক্রনিক প্রভাব দেখা যায়। এগুলি হল (i) ক্ষুধামন্দ্য, বমিভাব, বমন, আন্ত্রিক, পেটে খিঁচুনি, রক্তপায়খানা, মুখে লালা নিঃসরণ ও ওজন হ্রাস। (ii) স্নায়বিক পেশী ব্যবস্থার উপর প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ যথাক্রমে ক্লান্তি, অনীহা, নিদ্রালুভাব, অতিরিক্ত ঘাম, জ্বর ইত্যাদি। (iii) রক্ত সংবহন কলায় বিকিরনের প্রাথমিক লক্ষণগুলি হল মুখ দিয়ে রক্তপাত, আভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণ

বা রক্তল্পতা। (iv) চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে ফুসফুসে ও যকৃতের ক্ষত, ফ্রাইবেসিস, ত্বক-ক্যানসার কিংবা লিউকেমিয়া (রক্ত ক্যানসার) (v) ক্রমিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত প্রকটে দেহকোষ এবং জননকোষের ক্রমোজোমের অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে পারে। একে জিনমিউটেশন বলে। এর ফলে অস্বাভাবিক এবং অপূর্নাঙ্গ শিশুর জন্ম, গর্ভনিক্ষেপ এবং গর্ভক্রাট, মৃতশিশুর জন্ম, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি দেখা দেয়। বিকিরণের মাত্রা 0.5 – 2.5 গ্রে হলে বিকিরণের পর জন্মানো বাচ্চাদের একাংশের জিনগত ত্রুটি আসার সম্ভাবনা প্রবল।

1.5.6. তেজস্ক্রিয়তার সর্বোচ্চ অনুমোদন যোগ্য সীমা (Safe level of radiation)

বিকিরণের পরিমাপ করা হয় প্রধানত আয়োনি বিকিরণের মাধ্যমে জীবদেহের কলাসমূহ কর্তৃক শোষিত শক্তি র বিচারে। বিকিরণের এককের নাম গ্রে। বর্তমানে অবশ্য রেম (rem) একক ব্যবহার করা হয়। রেম কথাটির অর্থ হল roentogen equivalent man। এক রোয়েন্টজন (r) 'X' রশ্মির বিকিরণের সঙ্গে জৈবিকভাবে তুল্য যে পরিমাণ বিকিরণ মানুষের শরীরে শক্তি ক্ষয় বা অপচয় করতে সমর্থ, সেই পরিমাণ বিকিরণকে রেম বলা হয়। এক রেম শক্তি প্রায় 1000 আর্গ/গ্রামের সমান। 1934 সালে ইন্টারন্যাশানাল কমিশন ফর রেডিয়েশন প্রোটেকশন (ICRP) মতে সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা বছরে 36 রেম। বর্তমানে এই মাত্রা যথেষ্ট কমেছে, গর্ভজভ্রূনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অনুমোদনসীমা 3 রেমের বেশি হবে না এবং 18 বছরের কম বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মাত্রা 5 রেম ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে এর উপরে যে কোন পরিমাণ বিকিরণই মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক।

1.6. ○ আর্সেনিক দূষণ (Arsenic Pollution)

1.6.1. আর্সেনিক মৌল (Arsenic)

জার্মান অ্যালকেমিস্ট অ্যালবার্টাস ম্যাগনাস 1250 AD তে সর্বপ্রথম মৌল আর্সেনিক আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী বার্থলটের (Berthelrt, 1893) একে ধাতুকল্পরূপে পরিচিতি ঘটান। স্বল্প পরিমাণে এই আর্সেনিক (As) প্রকৃতিতে সর্বদাই উপস্থিত থাকে। মৃত্তিকায় বন্টিত আর্সেনিক সালফারের সঙ্গে যুক্ত অজৈব যৌগ হিসাবে (As_2S_2 বা As_2S_3) বা কখনো কখনো লৌহ বা নিকেলের যৌগ (FeAsS বা NiAsS) হিসাবে থাকে। মৃত্তিকায় আর্সেনিকের স্বাভাবিক সংযুক্তি 5ppm – 6 ppm -এর মধ্যে। সুদূর অতীতে আর্য়ুবেদ চিকিৎসায় বিষ রূপে এর ব্যবহার ছিল। বছর পঞ্চাশ আগেও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় এবং এখনো হোমিওপ্যাথিতে এর ব্যবহার হয়। বর্তমানে পেস্টিসাইড, হার্বিসাইড এবং ফাংগিসাইড হিসাবে আর্সেনিক যৌগের অধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

1.6.2. আর্সেনিক দূষণ (Arsenic Pollution)

আর্সেনিক মৃত্তিকাস্থিত একটি উপাদান হওয়ায় উদ্ভিদ মৃত্তিকা স্থিত জলের মাধ্যমে এটি সংগ্রহ করে। পরবর্তী কালে খাদ্য খাদক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রাণীদেহে প্রবেশ করে। তাছাড়া প্রাণীরা পানীয় জলের মাধ্যমেও আর্সেনিক

সংগ্রহ করে। সংগৃহীত আর্সেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ থেকে জৈবিক প্রক্রিয়ায় পরিবেশে মুক্ত হয়। একে আর্সেনিক চক্র বলে। বর্তমানে মানুষ্যসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক উভয় কারণে অজীব ও জীব পারিবেশে আর্সেনিক প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে কোনো কোনো অংশে এর ঘনত্ব বাড়ছে আবার কোথাও কোথাও কমছে। মানুষ সহ অন্যান্য জীবদেহে আর্সেনিকের সঞ্চয় ক্রমশ বাড়ছে এবং ফলস্বরূপ নানাবিধ অনভিপ্রেত পরিবর্তন হচ্ছে। একে আর্সেনিক দূষণ বলে। বিশ্বের সর্বত্র কম বেশি আর্সেনিক দূষণের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ও কাছের দেশ বাংলাদেশে এটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 10 টি জেলায় 78টি ব্লকের 70 লক্ষ লোক (সরকারী হিসাবেই) পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণের শিকার।

1.6.3. আর্সেনিক দূষণ — আন্তর্জাতিক চিত্র (Arsenic Pollution – Global Scenario)

আর্সেনিক দূষণ কেবল ভারত বাংলাদেশের সমস্যা নয়। আজ থেকে 40 বছর আগে তাইওয়ানে 1 লক্ষ মানুষ আর্সেনিক দূষণের প্রকোপে পড়ে। এছাড়া 1938 সালে আর্জেন্টিনার করডোবা অঞ্চলে, 1955 সালে আলাস্কার ফেয়ারব্যাঙ্ক অঞ্চলে, 1958 সালে চিলির অন্তফগোস্তা শহরে, 1963 সালে মেক্সিকোর লাগুনেরা অঞ্চলের পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণ ধরা পড়ে। সময়ে সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং নিউজিল্যান্ডের কোনো কোনো স্থানে আর্সেনিক দূষণের খবর প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পানীয় জল আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়েছে। বাংলাদেশে গত দু-দশক আগে আর্সেনিক দূষণের প্রথম চিত্র ধরা পড়লেও বর্তমান চিত্র যথেষ্ট ভয়াবহতার কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক জনিত রোগে আক্রমণের তথ্য প্রথম উদঘাটিত হয় 1983 সালে। সেইসময় কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এর ডারমাটলজি বিভাগের তৎকালীন প্রধান ডাঃ কে সি সাহা উত্তর 24 পরগণা জেলার কিছু কিছু গ্রামের কয়েকজন রোগীর দেহে আর্সেনিক সংক্রমণের লক্ষণ দেখতে পান। তখন ডাঃ সাহার উদ্যোগে সমীক্ষা শুরু হয় এবং তাতে 6 টি জেলার (মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, দঃ 24 পরগণা ও উঃ 24 পরগণা) কিছু কিছু নলকূপের জলে আর্সেনিক দূষণের চিহ্ন পাওয়া যায়। এরপর 1989-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ-এর অধিকর্তা ডঃ দীপঙ্কর চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে একদল বিজ্ঞানী সমীক্ষা শুরু করে। এই সমীক্ষায় নতুনকরে আরও কয়েকটি এলাকা চিহ্নিত হয়।

1.6.4. আর্সেনিক দূষণের কারণ (Causes of Arsenic Pollution)

আধুনা প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পরিবেশে আর্সেনিকের ঘনত্ব বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মানব খাদ্যশৃঙ্খলে আর্সেনিকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই ঘটনা মানবজাতিকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। প্রধানত ভূগর্ভস্থ জলের মাধ্যমে আর্সেনিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণের তিনটি উৎস বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন।

- কৃষিতে কীটনাশক বা পেস্টিসাইডের ব্যাপক ব্যবহার।
- পরিবেশে নির্গত বিভিন্ন রাসায়নিক বর্জ্যপদার্থ।
- প্রকৃতিতে আর্সেনিক যুক্ত বিভিন্ন শিলার উপস্থিতি।

1.6.4.1. কীটনাশকের ব্যবহার (Uses of Pesticides)

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে সবুজ বিপ্লবের শুরু হয়। ফলে মূলত দানাশস্য উৎপাদনে এবং ফলচাষে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন আর্সেনিক সমৃদ্ধ কীটনাশকের ব্যবহার হয়েছে। লেড, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং জিউক এর বিভিন্ন আর্সেনেট ও আর্সেনাইট পেস্টিসাইড রূপে দীর্ঘদিনরূপে এ সমস্ত চাষে ব্যবহৃত হত। হার্বিসাইড রূপে সোডিয়াম আর্সেনাইটের ব্যবহারও প্রায় 50 বছরের অধিক। এছাড়া সিলভিসাইড ও ডেসিক্যান্ট রূপে জৈব আর্সেনিক ক্যালস দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশে এই সমস্ত যৌগের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। এখনও সমান ভাবে চলছে এই ট্র্যাডিশন।

এই সমস্ত আর্সেনিক যৌগ খুব সহজে মৃত্তিকায় মেশে এবং মৃত্তিকাকে সংক্রামিত করে। মৃত্তিকায় উপস্থিত এইসব যৌগ পরবর্তীকালে বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা জৈব আর্সেনিকে পরিণত হয়। উদ্ভিদ মৃত্তিকার জৈব এবং অজৈব আর্সেনিক সংগ্রহ করে। শোষিত অর্সেনিক উদ্ভিদ কোষে ফসফরাস সংঘটিত বিপাক ক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। পরে উদ্ভিদের মাধ্যমে আর্সেনিক মানব খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে। ইতিমধ্যে বিদেশে কৃষিক্ষেত্রে বহু আর্সেনিক যৌগের (ডাইসোডিয়াম মিথেন আর্সেনিক অ্যাসিড, কোকোডাইলিন অ্যাসিড ইত্যাদি) ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। আমাদের দেশে অবশ্য এদের ব্যবহার অবাধে চলছে।

1.6.4.2. রাসায়নিক বর্জ্যপদার্থ (Chemical disposals)

মানুষ যেদিন খনি থেকে বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হয়েছে সেদিন থেকে পৃথিবীতে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা বেড়েছে। তামা, সোনা, দস্তা, সীসা প্রভৃতি আকরিকের সঙ্গে আর্সেনিক উপস্থিতি থাকে। ধাতব আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনে ঐসমস্ত আর্সেনিক পরিবেশে মুক্ত হয়।

আর্সেনিক আসোনো পাইরাইট রূপে কয়লার উপস্থিত থাকে। লিগমাইট কয়লায় এর পরিমাণ সর্বাধিক। থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে কয়লা পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে কয়লার দহনে যে ফ্লাই অ্যাশ (Fly ash) নির্গত হয় তাতে আর্সেনিক থাকে এবং তা সহজেই বৃষ্টির মাধ্যমে মৃত্তিকায় সংক্রমিত হয়। রেলগাড়ির ইঞ্জিনে কয়লার দহনের ফলেও আর্সেনিক পরিবেশে মুক্ত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন আর্সেনিকযুক্ত ধাতু সংকর উৎপাদনে; কিছু কিছু ওষুধ, রং ও কীটনাশকের উৎপাদন শিল্পে এবং চর্ম সংরক্ষণ শিল্পে আর্সেনিক ধাতুরূপে বা যৌগরূপে ব্যবহৃত হয়। এইসব কারখানা থেকে নির্গত পদার্থেও প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক থাকার সম্ভাবনা থাকে।

1.6.4.3. আর্সেনিক যুক্ত শিলা (Arsenic rocks)

পরিবেশে আর্সেনিক খুব অল্প পরিমাণ পাওয়া গেলেও এর বেশিরভাগটাই থাকে শিলা মধ্যস্থ বিভিন্ন খনিজের মধ্যে। আগ্নেয়, রূপান্তরিত কিংবা পাললিক যে কোনো শিলায় আর্সেনিক থাকতে পারে। তবে পাললিক শিলামধ্যস্থ খনিজে এর উপস্থিতি সর্বাধিক। চুনাপাথর কিংবা বেলেপাথরে আর্সেনিকের গড় ঘনত্ব যথাক্রমে 2·6 এবং 4·4 ppm। আর্সেনিক সমৃদ্ধ বেশ কয়েকটি পরিচিত খনিজ হল রিয়ালগার (As_4S_4), অরপিমেন্ট (As_2S_3), এনার্জাইট (ASS_4), নিকোলাইট (NiAs), আর্সেটো পাইরাইট (FeAsS), স্কোরোডাইট [$Fe(AsO_4)_2, 8H_2O$], প্রুস্টাটি (Ag_2AsS_3) ইরাইথ্রাইট [$CO_3(AsO_4)_2 \times H_2O$] ইত্যাদি। ফলে সেখানকার শিলায় এই আকরিকগুলি থাকে, সেখানে নানা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভূগর্ভের জলে আর্সেনিক রোগ বাহিত হয়ে জমা হতে থাকে। কারণ সবগুলি না হলেও সরাসরি বেশ কয়েকটি খনিজ জলে দ্রাব্য। আবার কয়েকটি বায়ুর অক্সিজেন সহযোগে জারিত

হয়ে দ্রাব্য যৌগে পরিণত হয়। অবশ্য আর্সেনিক যৌগের জলীয় দ্রাব্যতা মৃত্তিকার প্রকৃতি এবং P^H মানের উপর নীর্ভরশীল।

এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় যখন ভূ-গর্ভস্থ জলকে অপরিকল্পিত ও অতিরিক্ত পরিমাণে পানীয় জল ও সেচের জন্য তুলে আনা হয়। এক্ষেত্রে ভৌমজল তুলে নেওয়ার ফলে মাটির নীচের জলস্তর ক্রমশ নেমে যায়। ফলে ভূগর্ভের আর্সেনিক খনিজগুলিতে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় এবং আর্সেনিক জলে দ্রবীভূত হয়ে পড়ে। পরে আমরা আর্সেনিক দ্রবীভূত ঐ জলকে তুলে পানীয় জল হিসাবে সরাসরি গ্রহণ করছি এবং আর্সেনিক দূষণের শিকার হচ্ছি।

সারণি 1.5 : প্রকৃতিতে প্রাপ্ত কয়েকটি আর্সেনিক সমৃদ্ধ খনিজ

নাম	আণবিক সঙ্কেত	আবিষ্কারের বছর
ওরপিমেন্ট	As_2S_3	315 B. C.
রিয়্যালগার	AsS	315 B. C.
নিক্কোলাইট	NiAs	1694
ডোমিকাইট	Cu_3As	1827
আর্সেনোপাইরাইট	FeAsS	1546
কোবালাইট	CoAsS	1758

1.6.5. পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক দূষণ (Arsenic Pollution in WB)

পশ্চিমবঙ্গের 10টি জেলায় (মালদা, মুর্শীদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, উঃ 24পরগণা, দঃ 24 পরগণা, হুগলী, হাওড়া, কলকাতা ও পূর্ব মেদিনীপুর) প্রায় 78টি ব্লকের নলকূপের পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণ আজ এক ভয়াবহ বিপদ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে পানীয় জলে আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা 0·02 মিগ্রা/লিটার থেকে 0·49 মিগ্রা/লিটার এর মধ্যে এবং বিপজ্জনক মাত্রা 0·05 মিগ্রা/লিটার বা এর চেয়ে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে এই 78টি ব্লক সমেত কলকাতার 5টি অঞ্চলের নলকূপের পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা 0·05 মিগ্রা/লিটার এর বেশি। এই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিকযুক্ত জল পান করছেন এবং আর্সেনিকোসিসের শিকার হচ্ছেন। 1982 সালে উঃ 24পরগণার গঙ্গাপুর থেকে আগত দুটি রোগীর লক্ষণ দেখে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের চর্মরোগ বিভাগের প্রদধন ডাঃ কে সি সাহা প্রথম আর্সেনিক রোগী সনাক্ত করেন। পরে এস এস কে এম হাসপাতালের ডাঃ ডি এন গুহমজুমদারও আর্সেনিক রোগীর সন্ধান পান। একই সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এনভারনমেন্টাল স্টাডিজ এর অধিকর্তা ডঃ দীপঙ্কর চক্রবর্তীও এবিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করেন এবং বিপজ্জনক তথ্য পান।

এদের গবেষণায় দেখা গেছে সারণত ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণ 400 ফুটের মধ্যে একটি বিশেষ স্তরেই সীমাবধ্ব — ভূতত্ত্ববিদরা এই স্তরটিকে নবীন বদ্বীপীয় স্তর (younger deltaic plain) বা চিনসূরা স্তর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই স্তরটি পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার দুদিকে বিস্তৃত। এই অঞ্চলের মানুষ এই দূষিত জল পান করে চলেছেন দীর্ঘদিন ধরে। আর্সেনিক সাধারণত কর্দম জাতীয় মৃত্তিকার সাথে অন্তর্বৃতি বা প্রলেপের (adhesive) মতো অবস্থায় থাকে। যেসব স্তরে প্রবেশ্যতা কম অর্থাৎ যে স্তরগুলির নিকাশী ব্যবস্থা/ক্ষমতা কম, সেই সব স্তরে

মোটামুটি 13–40 মিটার গভীরতার কাদামাটির পলিজ স্তরে অবস্থিত নলকূপের জলে আর্সেনিক বিপজ্জনক মাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের নবীন বদ্বীপীয় স্তরের প্রধান আর্সেনিক খনিজগুলি হল এনাজাইট (AsS_4), আর্সেনেট পাইরাইট (FeAsS), ক্লোয়ামসাইট ($NiAs_{3-2}$)। কৃষি এবং পানীয় জলের প্রয়োজনে দীর্ঘদিন থেকে এইসব অঞ্চলে নলকূপের মাধ্যমে জল তুলে নেওয়া হচ্ছে। ফলে জলতলের উপরিঅংশের বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ঐসব আকরিক জারিত হচ্ছে এবং জলে দ্রাব্য বিভিন্ন যৌগে পরিণত করছে। অর্থাৎ ভূগর্ভ জলের ব্যবহার যত বাড়ছে, আর্সেনিক দূষণও তত নিচের দিকে ও পাশের দিকে ছড়াচ্ছে।

আর্সেনিকোসিস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে 15–20 বছর সময় লাগে। আর পশ্চিমবঙ্গে নলকূপ থেকে জলের উত্তোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয় সেই ছয়ের দশকের শেষের দিক থেকে। ফলে বিগত 20–25 বছর ধরে লোকেরা আর্সেনিক যুক্ত পানীয় জল খেয়ে আর্সিনিকোসিসের শিকার হয়েছে এবং এজাতীয় রোগী জনসমক্ষে আসে 1983 – 1984 সাল থেকে।

সারণী 1.6 : পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক কবলিত এলাকাগুলির নাম (2004 পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	জেলা (10 টি জেলা)	ব্লকের নাম (78টি ব্লক)	মোট ব্লক ; অঞ্চলের সংখ্যা
(1)	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	বারুইপুর, সোনারপুর, ভাঙ্গর-1, ভাঙ্গর-2, বিষ্ণুপুর-1, বিষ্ণুপুর-2, ক্যানিং-1 জয়নগর-1, মগরাহাট-2, বজবজ-2, বাসন্তী	11 টি
(2)	উঃ ২৪ পরগণা	বারাসাত-1, বারাসাত-2, হাবরা-1, হাবরা-2, বসিরহাট-1, বসিরহাট-2, বরগসা, বনগাঁ, বারাকপুর-1, গাইঘাটা, হাসনাবাদ, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগর, আমডাঙ্গা, দেগঙ্গা হাড়োয়া, মিনাখাঁ, বারাকপুর-2, সন্দেশখালি-1, রাজারহাট	20 টি
(3)	নদীয়া	শান্তিপুর, চাকদহ, হাঁসখালি, কালিগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, করিমপুর-1, করিমপুর-2, নাকাশিপাড়া, নবদ্বীপ, চাপড়া, তেহট্ট-1, তেহট্ট-2, হরিণঘাটা, রানাঘাট-1, রানাঘাট-2, কৃষ্ণনগর-1, কৃষ্ণনগর-2	15 টি + 2 টি 17 টি
(4)	মালদহ	কালিয়াচক-1, কালিয়াচক-2, কালিয়াচক-3, মানিকচক, ইংলিশবাজার, রতুয়া-1, রতুয়া-2	5টি + 2টি = 7টি
(5)	মুর্শিদাবাদ	বেলডাঙ্গা-1, বেলডাঙ্গা-2, নওদা, হরিহরপাড়া, ডোমকল, বহরমপুর, জলঙ্গি, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ, রানিনগর-1, রানিনগর-2, ভগবানগোলা-1, ভগবানগোলা-2, সুতি-1, সুতি-2, রঘুনাথগঞ্জ-2, ফারাক্কা, সামসেরগঞ্জ	15 টি + 2 টি 17 টি
(6)	বর্ধমান	পূর্বস্থলি-1, পূর্বস্থলি-2	2 টি
(7)	হুগলি	বলাগড়	1 টি
(8)	হাওড়া	বালি-জগাচা, শ্যামপুর-২, উলুবেড়িয়া-2	2টি + 1 টি
(9)	কলকাতা	লেকগার্ডেন্স, যাদবপুর, নাকতলা, আলিপুর, বেহালা..... অঞ্চলগুলির জলে বিপজ্জনক মাত্রায় আর্সেনিক	5 টি অঞ্চল
(10)	পূর্ব মেদিনীপুর	রামনগর	1 টি
মোট 78টি ব্লক ও কলকাতার 5টি অঞ্চল			

উৎস : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (SOES), বিজ্ঞান দরবার (কাঁচড়াপাড়া) এবং নাগরিক মঞ্চ (কলকাতা)

1.6.6. আর্সেনিক বিষক্রিয়া (Poisonous effects of Arsenic)

এখন প্রশ্ন হলে আর্সেনিক এত বিপজ্জনক কেন? কারণ দীর্ঘদীন বিপদসীমার উর্ধ্বের আর্সেনিক মিশ্রিত জল পান করলে শরীরে নানাবিধ বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যেমন —

(1) দীর্ঘদিন ধরে কোষে আর্সেনিক জমতে থাকলে কোষের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। কোষের মাইটোকনড্রিয়ায় অক্সিডেটিভ ফসফেট অন্তর্ভুক্তিকে আর্সেনিক বাধা দেয়। ফসফেটকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়াকে নষ্ট করে কোষের পুষ্টিকে ব্যাঘাত করে।

(2) আর্সেনিক জলের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে প্রথমেই যকৃৎকে (liver) আক্রমণ করে। যকৃৎ থেকে রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে শরীরের বিভিন্ন অংশে কালো ছিট, রুক্ষ ত্বক ও গুটিদানা দেখা যায়। একে মেলানোসিস বলে।

(3) আর্সেনিক রক্ত সংবহন তন্ত্রের কাজে ব্যাঘাত ঘটায়, যার ফলে অ্যানিমিয়া, লিউকোপোনিয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা, অস্থি মজ্জায় পচন সৃষ্টি হয়।

(4) অ্যাকিউট আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় বৃক্কের মূত্র উৎপাদন ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই ঘটনা রেনাল ফেলিওর নামে পরিচিত।

(5) আর্সেনিকের ক্রমিক বিষক্রিয়ায় হাত ও পায়ের কলাকোষে O_2 সরবরাহ কমে যায়। ফলে হাতের চেটো ও পায়ের তলদেশে কালো ক্ষত বা গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হয়। একে ব্ল্যাকফুট ডিজিজ (Black foot disease) বলা হয়। এই রোগে চিলি ও তাইওয়ানে মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক।

(6) এছাড়াও শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দেয় যেমন কাশি, হাঁপানি, পেটের রোগ, জনডিস, যকৃৎ বড় হয়ে যাওয়া, রক্তাল্পতা, পা ফুলে যাওয়া, হাতের বা পায়ের তলা ফেটে যাওয়া ইত্যাদি। এই সব লক্ষণ ফুটে ওঠার পর রোগী ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে যেতে থাকে। চামড়ায় ক্যানসার দেখা যায় এবং দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

1.7. ○ পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ও এললিনো (Climate change and El Nino)

1.7.1. জলবায়ুর পরিবর্তন (Change of climate)

শিল্পবিপ্লবের পর অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে একদিকে যেমন পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বেড়েছে তেমনি আবহাওয়া সংক্রান্ত নানা বিপর্যয়ের সংখ্যা বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। খরা অঞ্চলে হচ্ছে বন্যা কিংবা বন্যা প্রবণ অঞ্চলে হচ্ছে খরা। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়া-কমা ঘটছে প্রায় সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকায়। মোটের উপর আবহাওয়ার ব্যবহার কোনোভাবেই ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে না। চারিদিকে বিজ্ঞানী মহলে দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে— পৃথিবীর জলবায়ুর সত্যি কি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে? গত 1997 সালে জাপানের কিয়োটো শহরে জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে আয়োজিত "ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ" এ বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত হতে পারেননি। তবে সবাই একমত হয়েছেন যে বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাসের

নির্গমণের মাত্রা কমিয়ে আনতে হবে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ অবশ্য বলেছে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রকৃতি নিয়ে আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দরকার। গবেষণা দরকার বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধীয় যেসব অস্বাভাবিক ঘটনা প্রায়শই বারে বারে ফিরে আসছে তাদের চরিত্র, প্রকৃতি এবং অস্বাভাবিকতার হার ইত্যাদি বিশ্লেষণের।

বায়ুমণ্ডল - সমুদ্র - পরিবেশজনিত এই রকম এক বহুল বিতর্কিত অস্বাভাবিকতার নাম এলনিনো-লানিনা।

1.7.2. এলনিনো (El Nino)

স্প্যানিশ ভাষায় এলনিনো শব্দের অর্থ হলো শিশু যীশুখৃষ্ট (Christ Child)। এই বিপর্যয় ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময় (Around Christmas) হয় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের চিলি-পেরু সংলগ্ন উপকূল বরাবর মাঝে মাঝে অস্থির ও অনির্দিষ্ট প্রকৃতির দক্ষিণমুখী উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের আগমনই এলনিনো নামে পরিচিত। এই উষ্ণ স্রোত কখন শুরু হবে, কখন শেষ হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব-পশ্চিমে উষ্ণতা ও স্রোতের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পাপুয়া, নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ার দিকে জল বেশ গরম থাকে, অপর পক্ষে পূর্ব দিকে অর্থাৎ ইকুয়াডরের, পেরু, চিলি প্রভৃতি অঞ্চলের দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের জল বেশ শীতল থাকে। এর কারণ সম্ভবত এই অংশে সারাবছর উত্তরগামী শীতল পেরু স্রোত বয়। ফলস্বরূপ পশ্চিম অংশের তুলনায় পূর্বঅংশে তাপমাত্রা অন্তত 5^0 সেঃ কম থাকে। স্বাভাবিকভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চল বরাবর উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠেও উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে দুটি স্রোত নিরক্ষরেখার দুদিকে বহিঃস্রোত (Surface current) রূপে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। একই সঙ্গে ফাঁকা স্থানের কারণে পূর্বদিকের সমুদ্রের গভীর থেকে ঠাণ্ডা জল উপরিতলে উঠে আসে। এই নিচ থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে থাকে প্রচুর পরিমাণে প্ল্যাংটন— যা মাছের একমাত্র খাদ্য। তাই এই উপকূলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। পেরু, চিলি প্রভৃতি দেশ তাই সামুদ্রিক মৎস্য বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নত।

এই স্বাভাবিক ঘটনার পরিবর্তন হলে এলনিনো বিপর্যয় দেখা যায়। কোনো কোনা বছর পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে বয়ে যাওয়া আয়ন বায়ুর গতি কমে আসে। এবং প্রচণ্ড গতিতে উল্টোদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকের উষ্ণ জল পূর্বদিকে বইতে শুরু করে। ফলে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলের জল শীতল হওয়ার বদলে বেশ গরম হয়ে উঠে। এই স্রোতের তাপমাত্রা বেশি থাকে বলে তখন আর প্ল্যাংটন সহ পুষ্টিকর পদার্থ নিচ থেকে উপরে আসে না ফলে জলজ বাস্তুতন্ত্রে দেখা যায় গভীর বিপর্যয় এবং অধিক তাপমাত্রা ও খাদ্যের অভাবে প্রচুর পরিমাণ মাছ মারা যায়। কখনো কখনো এই ঘটনা একবৎসর কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এই অঞ্চলের মৎসচাষ কেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়।

গরম এই সমুদ্রস্রোত নিম্ন বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রারও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায় এবং অস্থায়ী নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি করে। ফলে উপকূল অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়ার গতি বেড়েই চলে যা উত্তর আমেরিকার উপকূল অঞ্চলকেও আঘাত করে। এর সাথে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বাড়ে। এই ঘটনা বায়ুমণ্ডলীয় আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায় বলে বিজ্ঞানীরা একে এলনিনো-দক্ষিণী ওঠাপড়া (El Nino - Southern oscillation বা ENSO) বলেন। দক্ষিনী ওঠানামা বা ENSO হলেই ইন্দোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে বায়ুচাপ বাড়ে এবং বৃষ্টিপাত কমে। কখনো কখনো এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এতই কমে যে উত্তর অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ায় অস্বাভাবিক খরা সৃষ্টি হয়। ভারতের মৌসুমী বায়ু প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বৃষ্টিপাত কমে। তবে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের উর্ধ্বাকাশের জেট বায়ুপ্রবাহ শক্তিশালী হয়। সেই কারণে ENSO অবস্থায় সারা পৃথিবী জুড়ে আবহাওয়ার (বিশেষত বৃষ্টিপাতের) এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

সাম্প্রতিক কালে 1982–83, 1986–87 এবং 1997–98 সালে প্রবলভাবে এলাবিনো দেখা দিয়েছিল। ঠিক কত বছর অন্তর এই স্রোত দেখা যায় তা সঠিক ভাবে বিজ্ঞানীরা বলতে পারেননি, তবে তথ্য অনুসারে প্রতি 3–10 বছরে এক একটি ভয়াবহ ENSO অবস্থা আসে। গত 1979-তে ENSO শুরু হয়েছিল এপ্রিল-মে মাসে এবং জুন মাসে সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থায় পৌঁচেছিল। এটি প্রায় 1998-এর এপ্রিল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তবে 1982-83 এর ENSO অবস্থা বিশ্ব শতাব্দীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল।

1.7.3. লা নিনা (La Nina)

এলনিনোর ঠিক বিপরীত অবস্থাকে বলে লানিনা। স্প্যানিশ শব্দ লা নিনার অর্থ হলো ছোট্ট বালিকা (young girl)। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে শীতল বায়ুপ্রবাহ হবার ঘটনা লা নিনা নামে পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলে আয়ন বায়ু শক্তিশালী হলে পেরু ও ইকুয়েডর উপকূলে নিচ থেকে শীতল প্ল্যাংটন সমুদ্র জলস্রোত উপরে আসে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। এই ঘটনাকে ENSO শীতল অবস্থা (Cold phase) বলে। লানিনা হলে উল্টোভাবে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল তথা ইন্দোনেশিয়া, উত্তর অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ভালো বৃষ্টি হয়। ভারতের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহও স্বাভাবিক থাকে।

প্রকৃতপক্ষে এলনিনো - লানিনা হল ENSO চক্রের দুটি চরম অবস্থা। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বিকিরণ জনিত তাপ সমতার বিঘ্ন ঘটালে (Variation of radiational heat budget) এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী গিলবার্ট ওয়াকার (Gilbert Walker) প্রথম এই পেণ্ডুলিয়ামের দোলনসম তাপমাত্রার চরম অবস্থার চক্রাকার প্রবাহের পরিচিতি ঘটান। তাই একে ওয়াকার প্রবহন (Walker circulation) বলে।

1.8. ○ প্রশ্নাবলী ও উত্তর (Question and Answer)

I. দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

1. গ্রীন হাউস এফেক্ট কাকে বলে? গ্রীন হাউস এফেক্টে CO_2-এর ভূমিকা আলোচনা কর।
   [উত্তর ঃ 1.1.2 এবং 1.1.3]
2. গ্লোবাল ওয়ার্মিং কাকে বলে? পরিবেশে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর উল্লেখযোগ্য প্রভাবগুলি লেখ
   [উত্তর ঃ 1.1.1 এবং 1.1.4]
3. গ্রীন হাউস গ্যাসগুলি কি কি? এদের তুলনামূলক আলোচনা কর।
   [উত্তর ঃ 1.1.3]
4. বায়ুমণ্ডলের O_3 স্তরের অবস্থান বল। বর্তমানে এই স্তর পাতলা হয়ে যাওয়ার কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।
   [উত্তর ঃ 1.2.1 এবং 1.2.3]
5. বায়ুমণ্ডলের O_3 গ্যাস ধ্বংসকারী উপাদানগুলি কি কি? O_3 স্তর ক্ষয়ে এদের ভূমিকা লেখ।
   [উত্তর ঃ 1.2.3 এবং 1.2.4.3 ও 1.2.4.9]

6. পরমাণু চুল্লি ও পরমাণু বিদ্যুৎ বলতে কি বোঝ? পরমাণু বিদ্যুৎ জনিত প্রধান পরিবেশগত সমসাগুলি লেখ।

[উত্তর ঃ প্রথম অংশ 1.3.1 এবং 1.3.2 দ্বিতীয় অংশ 1.3.3. এবং 1.3.4]

7. আর্সেনিকোসিস কাকে বলে? পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিক দূষণের প্রধান কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

[উত্তর ঃ দীর্ঘদিন আর্সেনিক দূষিত জল পান করলে শরীরে আর্সেনিকদূষণ সংক্রান্ত বেশকিছু রোগ দেখা যায়। একে আর্সেনিকোসিস বলে। দ্বিতীয় অংশ 1.4.5]

8. আবহাওয়া তথা মৌসুমী বায়ুর চরিত্র বিশ্লেষণে এললিনো ও লানিনার ভূমিকা বল।

[উত্তর ঃ 1.7.]

II. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

1. গ্রীন হাউস এফেক্টে CO_2 এর ভূমিকা লেখ।

[উত্তর ঃ 1.1.3 এর কার্বন ডাই-অক্সাইড অংশ দেখ]

2. গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর প্রধান নেগেটিভ প্রভাবগুলি কি কি যা ইতিমধ্যে নজরে এসেছে?

[উত্তর 1.1.4]

3. গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলস্বরূপ হিমবাহের পশ্চাদপসরণ-এর কতগুলি উদাহরণ দাও।

[উত্তর ঃ 1.1.4 এর 4 নম্ব পয়েন্ট]

4. বায়ুমণ্ডলে O_3 স্তরের গুরুত্ব বল।

[উত্তর ঃ 1.2.3]

5. বসন্তকালে অ্যান্টার্কাটিকায় ওজোন হোল সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা কর।

[উত্তর ঃ 1.2.4.1]

6. ওজোনস্তর ক্ষয়রোধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে?

[উত্তর 1.2.5.]

7. তেজস্ক্রিয় আবর্জনা বলতে কি বোঝ? এগুলির ক্ষতিকারক প্রভাব আলোচনা কর।

[উত্তর ঃ 1.3.4.]

8. প্রধান আর্সেনিক বিষক্রিয়াগুলি কি কি? সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও।

[উত্তর ঃ 1.4.6]

9. পারমাণবিক বিদ্যুৎ কি সস্তা? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

[উত্তর ঃ পারমাণবিক বিদ্যুৎ অন্য প্রচলিত বিদ্যুৎগুলির মধ্যে মোটেও সস্তা নয়। কারণ এই বিদ্যুৎ উৎপাদনে কম কাঁচামাল লাগলেও এগুলি সর্বত্র কিংবা সবদেশে পাওয়া যায় না। তাছাড়া এগুলি তেজস্ক্রিয় বলে খুব সাবধানে নিরাপদ ব্যবস্থার মাধ্যমে খনি থেকে তুলতে হয়। ফলে খনিজ পদার্থ সংগ্রহ ও পরিশোধন খরচ যথেষ্ট বেশি।

এছাড়া এই বিদ্যুৎ প্রকল্প প্লুটোনিয়াম সহ বেশকিছু তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপন্ন করে, এগুলি পরিবেশে সংরক্ষণ করা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এই সমস্ত খরচকে উৎপাদন খরচের মধ্যে ধরলে ইউনিট প্রতি উৎপাদন খরচ অন্যান্য প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বিদ্যুতের চেয়ে বেশি হবে।

III. অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

1. গ্লোবাল-ওয়ার্মিং কাকে বলে?
   [উত্তর : 1.1.1]
2. শীতপ্রধান দেশে কাঁচের ঘরে ফল-ফুলের চাষ করা হয় কেন?
   [উত্তর : 1.2.4.]
3. বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের পরিমাণ কত?
   [উত্তর 1.2.4]
4. ওজোন হোল কি?
   [উত্তর : 12.4.1.]
5. সি এফ সি কয়প্রকার ওঁ কি কি?
   [উত্তর : 1.2.4.3]
6. কৃষিতে ব্যবহৃত আর্সেনিকযুক্ত কীটনাশকগুলি কি কি?
   [উত্তর : 1.4.4.1]
7. আর্সেনিক সমৃদ্ধ কয়েকটি খনিজের নাম বল।
   [উত্তর : 1.4.4.3]
8. আর্সেনিকোসিস কাকে বলে?
   [উত্তর : 1.4.5.]
9. মেলানোসিস রোগ কি?
   [উত্তর : 1.4.6.]
10. এল নিনো ও লা নিনা কাকে বলে?
    [উত্তর : 1.7.2 & 1.7.3]

একক 2 □ পরিবেশ সংরক্ষণ বনাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Environmental Conservation Vs Economic Development)

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা (Introduction)
2.2 উদ্দেশ্য (Objectives)
2.3 অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)
2.4 পরিবেশের অবনমণ (Environmental depletion)ও
2.5 পরিবেশ উন্নয়ন (Eco-development)
2.6 সম্প্রসারণের সীমা (Limits to growth)
2.7 পরিবেশ অবনমন এবং সামাজিক সাম্য (Environmental degradation and social equity)
2.8 ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণা (Concept of Sustainable development)
2.9 প্রশ্নাবলী ও উত্তর (Question and Answer)

2.1. ○ প্রস্তাবনা (Introduction)

সভ্যতার অবাধ জয়যাত্রা আর নিষ্কলুষ পরিবেশ এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো বিরোধ আছে? সাধারণ উত্তর অবশ্যই না। কৃষিবিপ্লবের ফলে পৃথিবী থেকে অনেকাংশে নিবারিত হয়েছে ক্ষুধা, শিল্পবিপ্লবে মানুষের বেড়েছে স্বাচ্ছন্দ, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অতুলনীয় উন্নতিতে মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে অনেক। কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রকৃতি দ্রুত রিক্ত ও নিঃশেষিত হচ্ছে কেন? কেন দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির তাগিদে কয়লা - খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো গচ্ছিত ও ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের ভাণ্ডার পুরিয়ে যাচ্ছে? কেন বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল আজ ফর্সা হয়ে গেছে, ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে বেশ কয়েকগুণ, বায়ু ও জল দূষণ ভয়াবহ আকার নিয়েছে?

অর্থাৎ উন্নয়নের তথাকথিত মডেলের সঙ্গে পরিবেশগত ভারসাম্যের বিরোধ ঘটে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এতকাল উন্নয়ন বলতে মানুষের ধারণা ছিল শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশ সচেতন মানুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা পরিবেশের গুনগতমান বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। পরিবেশের উন্নয়ন করতে হলে সমগ্র মানব সমাজের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা জরুরী। যেমন জরুরী প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান, বস্ত্র প্রভৃতি নিশ্চিত করা।

তাই পরিবেশ ও সম্পদ সম্বন্ধে নবজাগ্রত চেতনার ফলে বর্তমানে মানুষ এমন এক পথ খুঁজে নিতে চাইছে যে পদ্ধতিতে পৃথিবীর মানুষ সহ জীববৈচিত্র্য অটুট থাকবে, থাকবে পরিবেশের সার্বিক গুণগত মাণ, সংরক্ষিত থাকবে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সম্পদের ভাণ্ডার। অতি আধুনিক কালে এই চিন্তাধারার উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখাকে স্থিতিশীল বা সুস্থায়ী উন্নয়ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জল, মাটি, উদ্ভিদ, খনিজদ্রব্য প্রভৃতি প্রকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে ভবিষ্যতের মানুষও যেগুলি ব্যবহারের সুযোগ পায়। উন্নতির গতি অব্যাহত রাখার জন্য ভবিষ্যতের নিরাপত্তা এবং আগামী প্রজন্মের মানুষের উন্নতি সুনিশ্চিত করতে সুস্থায়ী উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই (i) পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়ন করলে, (ii) প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় নিবারণ করে বিচার বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করলে ও (iii) মানব সম্পদের ক্রমাগত উন্নয়নের প্রচেষ্টা বজায় রাখলেই উন্নয়নের গতি অব্যাহত থাকবে।

2.2. ○ উদ্দেশ্য (Objectives)

- উন্নয়ন সম্বন্ধে প্রকৃত ধারনার সৃষ্টি করা।
- পরিবেশের গুনগতমান ও সম্পদের ব্যবস্থাপনার চিত্র হাজির করা।
- দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন বনাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন— প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা।
- দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত ক্ষেত্রসমূহের চরিত্র সম্বন্ধে আলোকপাত করা।
- বিভিন্ন পরিবেশবিরোধী কার্যকলাপ ও নীতি এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের আলোকে সম্ভাব্য প্রতিকার বিষয়ে জনগনকে সচেতন করা।
- স্থিতিশীল বা দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের নির্দেশকসমূহের পরিচিতি ঘটানো।

2.3. ○ অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development)

বিশ্ব শতাব্দীতে বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুধের পর থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির বিকাশ হতে শুরু করে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত দেশে আধুনিক শিল্প ব্যবস্থার প্রচলন, উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগ, মাঝারি ও ভারী শিল্পসমূহে নতুন প্রযুক্তির আনয়ন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি হতে শুরু করে। ফলে একদিকে যেমন গড় জাতীয় আয় (National Income) বা জনপ্রতি আয় (Per-capita income) বেড়েছে তেমনি সমস্ত দেশে মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product বা GNP) বছরে গড়ে 8–10 শতাংশ হারে বৃধ্বি পেয়েছে। অবশ্য বিশ্বে এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে শুরু হয়েছে।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডব্লিউ ডব্লিউ রোস্টো (W. W. Rostow) অর্থনৈতিক উন্নতির বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছেন। তার মতে বৃটেনে প্রথম (1783 – 1802) অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ফ্রান্স (1830 – 1860), জার্মানী (1850 – 1873), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (1843 – 1860), জাপান (1878 – 1900), কানাডা (1896 – 1914) ইত্যাদি দেশে শিল্পবিপ্লব শুরু হয় এবং ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

ভারত, চীন প্রভৃতি এশিয়ার বৃহৎ দেশসমূহে শিল্প ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবশ্য হাল আমলে শুরু হয়েছে।

পাশ্চাত্যের মডেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে এই সমস্ত উন্নয়নশীল দেশেও আগের চেয়ে বেশি প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যবহার করে তাদের জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে। আর প্রকৃতির উপর যত চাপ বাড়ছে বা প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশি বেশি করে ব্যবহৃত হচ্ছে তত প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনমন ঘটছে। এই অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কোথাও কোথাও প্রবল বিরোধিতায় উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়েছে।

2.4. ○ পরিবেশের অবনমন (Environment degradation)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা মানুষের উৎপাদন ও ভোগক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি তথা পরিবেশের অবক্ষয় ঘটে চলেছে। এখানে প্রকৃতি বলতে এমন সব সম্পদের কথা বলা হয়-যেগুলি মানুষের সৃষ্টি নয়। যেমন আমাদের চারপাশের পরিবেশ, জল, আলো, বাতাস, মাটি, বন-জঙ্গল, প্রাণীজসম্পদ ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই প্রকৃতি। মানুষ সৃষ্টির পর থেকে এই প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভর করে এগিয়ে এসেছে। বর্তমানে উৎপাদন ও ভোগের প্রাচুর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে এই প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে অস্বাভাবিক হারে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের গুণাগুণ তথা ধর্মের পরিবর্তন হয়েছে তেমনি পরিবেশে বর্জ্য ও ক্ষতিকারক পদার্থ সৃষ্টির পরিমাণও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

উন্নয়নের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদের সবগুলির যোগান পরিবেশে অফুরন্ত নয়। এগুলি সাধারণত অপূর্ণভব (Non-renewable) সম্পদ নামে পরিচিত। ইতিমধ্যে অধিক ব্যবহারে এগুলির সঞ্চয় ক্ষীয়মান। তাছাড়া এটাও আজ সর্বজন স্বীকৃত যে উন্নয়নের নামে ক্রমাগত বৃক্ষচ্ছেদন, কৃষিতে অত্যাধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ, কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের জলাশয়ে নিক্ষেপ, অনিয়মিতভাবে জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন ইত্যাদির ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য ক্রমশ নষ্ট হচ্ছে। মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে। তাই আজ সর্বত্র পরিবেশ বনাম উন্নয়নের প্রশ্নটি সর্বাগ্রে উঠে এসেছে। সীমাবদ্ধ প্রাকৃতিক উপকরণের ক্ষয় এবং পরিবেশের অবনমনের মাধ্যমে যে উন্নয়ন সেই উন্নয়ন আমাদের কাম্য কিনা? অর্থাৎ আমরা কাকে অগ্রাধিকার দেবো— পরিবেশ সংরক্ষণ না উন্নয়নকে? তৃতীয় বিশ্বের কাছে এই সমস্যা আরও প্রকট। অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য এখানকার প্রধান দুটি সমস্যা। কিন্তু কর্মনিযুক্তির প্রসার ও দরিদ্র-সংকোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষন একই সঙ্গে চলতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ উন্নয়ন (Eco-development) ও উন্নয়নের সীমা (Limits to growth) এই দুটি ধারণার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে এই দুই ধারার মধ্যে সমন্বয় খোঁজার এক যান্ত্রিক প্রচেষ্টা বিশ্বজুড়ে শুরু হয়।

2.5. ○ পরিবেশ উন্নয়ন (Eco-development)

পরিবেশ সহায়ক উন্নয়ন বা পরিবেশ উন্নয়নের ধারণা বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমে আমাদের পরিবেশ অবনমনের চিত্রটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানা দরকার। আমরা আগেই জেনেছি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলির একটি নিজস্ব ও স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। একে হোমিওস্ট্যাটিক ব্যবস্থা (Homeostatic mechanism) বলে। এই ব্যবস্থার ফলে বিগত কয়েক শতক ধরে আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের স্থিতিশীলতা বা ভারসাম্য বজায় রয়েছে।

কিন্তু গত দুই শতাব্দীতে একদিকে যেমন পৃথিবীতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি অপরদিকে প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন ও ব্যবহার অস্বাভাবিক দ্রুত হারে বেড়েছে। বেড়েছে কলকারখানার সংখ্যা, বাতাসে বেড়েছে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত গ্যাস ও অন্যান্য উপকরনের পরিমাণ। অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপে এমনকি প্রবহমান সম্পদও (Flow resources) রূপান্তরিত হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু সম্পদে। এর ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে যে পরিবর্তনগুলি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে তা স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মাধ্যমে আর সাম্য অবস্থায় থাকছে না। অর্থাৎ পরিবেশ অবনমিত হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য। বিজ্ঞানীদের মতে এই ভারসাম্য নষ্টের প্রাধান কারণগুলি হল—

- (1) প্রাকৃতিক অনবীকরণযোগ্য সম্পদের দ্রুত উত্তোলন ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার।
- (2) শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণকারী প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ব্যবহার।
- (3) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর জোর না দেওয়া এর পৃথিবীর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি।
- (4) দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহৎ ও তাৎক্ষনিক পরিকল্পনা গ্রহণ।
- (5) অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে কৃষির প্রসার ও দ্রুত কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি।
- (6) পরিবেশগত শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের অভাব।
- (7) আয়-ব্যায়ের প্রকৃত ও দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়ন না করে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি।

তাই পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশের অবনমন না ঘটিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়িত্বের বা প্রবাহমানতার ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একে পরিবেশ উন্নয়ন বা পরিবেশ সহায়ক (Eco-friendly) উন্নয়ন বলে। পরবর্তীকালে এই উন্নয়নই স্থিতিশীল বা টেকসই উন্নয়ন (Sustainable development) নামে পরিচিত হয়।

2.6. ○ সম্প্রসারনের সীমা (Limit to growth)

প্রকৃতি থেকে মানুষ যেমন উৎপাদন এবং ভোগের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে তেমনি, ফলস্বরূপ, প্রকৃতিতে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ এবং আবর্জনা উৎপন্ন এবং জমা হয়। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে এই বর্জ্য পদার্থের যুষ্ঠু সংরক্ষণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতিতে দুইভাবে এই বর্জ্যপদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়।

● (1) **উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ :** এই বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন ছোট ও ভারী শিল্প পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বর্জ্য তৈরী করে। শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থের প্রধান দুটি বিষয় হলো তাপ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ। প্রধানত শক্তির উৎপাদনে তাপ ও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সমূহ এজাতীয় বর্জ্য পৃথিবীতে তৈরী করে চলছে। যে সমস্ত দেশসমূহ এইসব প্রচলিত বিদ্যুৎ শক্তিতে যত বেশি উন্নত তারা এইসব বর্জ্য প্রকতিতে তত বেশি পরিমাণে সঞ্চয় করে চলেছে। এছাড়াও রাসায়নিক শিল্প, চর্মশিল্প, কাগজ শিল্প, রং শিল্প, লৌহ ইস্পাত শিল্প এবং পেট্রোরসায়ন শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচুর বর্জ্য তৈরী করছে। এই সব বর্জ্য পদার্থের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন, ধাতব কণা, অ্যাসিড, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, ইত্যাদি। এরা প্রাকৃতিক পরিবেশকে অনবরত দূষিত করে চলছে।

● (2) **ভোগক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ :** অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভোগ বেড়েছে। উন্নত দেশসমূহে এই ভোগের পরিমাণ গত 30–40 বছরে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া শহরাঞ্চল এবং শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভোগের ধরনের পরিবর্তনও ঘটেছে। যেমন মানুষ ভোগের প্রয়োজনে পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যাগ, প্লাস্টিক বোতল, ডিটারজেন্ট, এসি যন্ত্র, ইউজ ও থ্রো উপকরণ (use and throw), কসমেটিকস ইত্যাদি ব্যবহার করছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে। এর ফলেও প্রকৃতিতে বিপুল পরিমাণে বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে। এরাও বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটিয়ে চলেছে।

কিন্তু সারা পৃথিবীর পরিবেশতো একটাই। তাই যারা দূষণ কিংবা বর্জ্যের সৃষ্টি করছে কেবল তাদের পরিবেশটাই নষ্ট হচ্ছে তাই নয়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং অন্যান্য জীবকূল এর প্রত্যক্ষ স্বীকার হচ্ছে। ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাত্রা এবং বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ এই দুটি ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা দরকার— যে সীমারেখার মধ্যে উৎপন্ন বর্জ্য পৃথিবী তথা মাটি - জল - বায়ু ধারণ করতে পারবে। এই চিন্তাভাবনা থেকে 1968 সালে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতি 'দা ক্লাব অব রোম' (The club of Rome) নামে এক গবেষণা সংস্থা স্থাপন করেন। 1972 সালে এই সংস্থার প্রথম গবেষণাপত্র "দা লিমিটস টু গ্রোথ" (The limits to growth) বা "সম্প্রসারণের সীমা" প্রকাশিত হয় এবং সারা পৃথিবীতে তোলপাড় তোলে। পরিবেশবিদ মিডোস (Meadows) এবং, তার কয়েকজন সহযোগী এই প্রতিবেদনটি তৈরী করেন। এই প্রতিবেদনে বলা হয় পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার সীমিত। অথচ ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ এবং ব্যবহার অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে এক চরম সংকটময় অবস্থার উদ্ভব হবে এবং তখন সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয় সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের বৃদ্ধি 'সূচক হারে' (exponential rate) হবে এবং তার সাথে সাথে উৎপাদন ও শিল্পায়ন দ্রুত গতিতে হবে। ফলস্বরূপ আগামী একশ বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ এক নিঃস্ব অবস্থায় পৌঁছবে। তখন পরিবেশ দূষণের মাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাবে এবং মাথাপিছু খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা হ্রাস পাওয়ায় জনসংখ্যার আকস্মিক হ্রাস ঘটবে (চিত্র 2.1)।

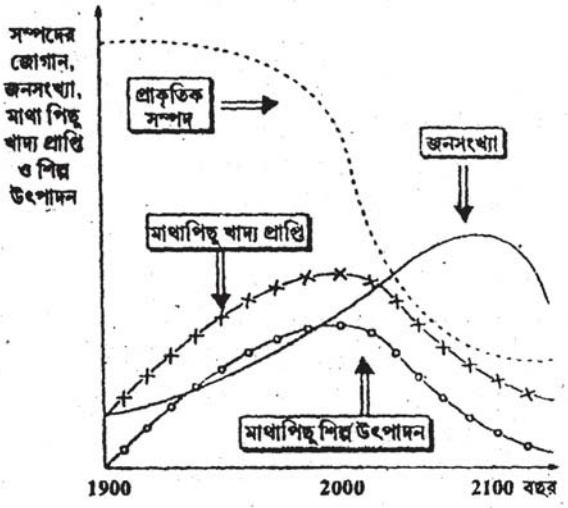

চিত্র 2.1

কোন কোন বিজ্ঞানী অবশ্য বলবেন যে উৎপাদন ও ভোগপ্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থের আধার হিসাবে প্রকৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বর্জ্য পদার্থ পুনরাবর্তন (recycling) পদ্ধতির দ্বারা নতুন সম্পদে পরিণত হতে পারে। এক্ষেত্রেও প্রকৃতির বর্জ্যপদার্থ ধারণ ক্ষমতা অসীম (unlimited) নয় কিংবা সব বর্জ্য পুনরাবর্তন প্রক্রিয়ায় সম্পদে রূপান্তরিত হয় না। বিশেষত জৈব পচনবিমুখ (bio-nondegradable) পদার্থ সমূহ (মূলত প্লাস্টিক) পরিবেশে না বিশ্লিষ্ট হয়ে দীর্ঘদিন দূষণ ঘটিয়ে চলে।

সুতরাং যে কোনো সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার একদিকে যেমন প্রকৃতির সমর্থন ক্ষমতার

(Support capacity) উপর নির্ভরশীল তেমনি অন্যদিকে বর্জ্য পদার্থের বিয়োজনের মাধ্যমে সম্পদে পুনরাবর্তনের ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ (চিত্র 2.2)

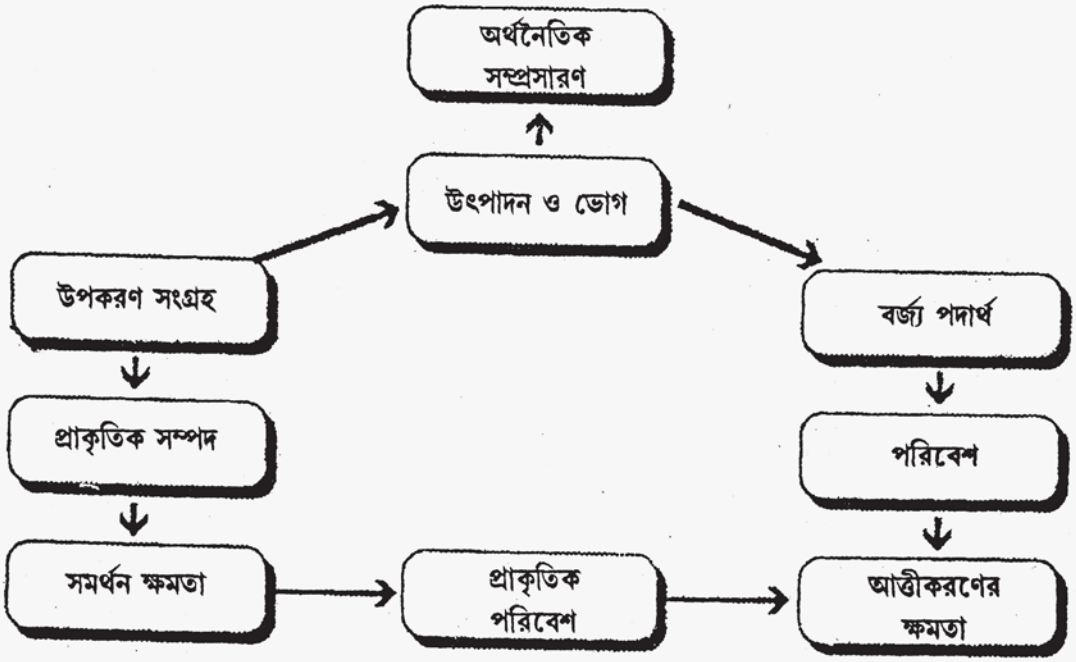

চিত্র 2.2

2.7. ○ পরিবেশ অবনমন এবং সামাজিক সাম্য (Environmental degradation and social equity)

বিগত দুশো বছরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ফলে পরিবেশের অবনমন এখন মোটামুটি প্রামাণিক সত্যে এসে পৌঁচেছে। ফলে বিগত প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর ধরে সূর্যের আলো, বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় উপাদান, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক্য গড়ে তুলেছে এবং তার মধ্যে যে একটা অন্তর্নিহিত ভারসাম্য রয়েছে তাও বিঘ্নিত হতে চলেছে। অথচ পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, কিংবা অশিক্ষার মত অপরিহায্য বিষয়গুলি এখনো তাড়ানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। এখনও এশিয়া আফ্রিকার দেশসমূহে দারিদ্র্য একটা বড় সমস্যা। উন্নয়শীল দেশহিসাবে ভারতের এখনও প্রায় 34 কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে। উন্নয়ন এই সমস্ত দেশে সামাজিক সাম্য দিতে পারেনি। দূর করতে পারেনি ধনী দরিদ্র্যের বৈষম্য।

তাই এখন যে প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে তা হল পরিবেশ বিনাশ বা অবনমন ঘটিয়ে যে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটেছে তাতে কি মানবজাতি উন্নয়নের পথে এগোতে পেরেছে।

কিছু দেশের হয়তো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে কিন্তু পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তা খুব সামান্য।

পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত উন্নত ধনী দেশগুলির অধিবাসীরা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র 25 শতাংশ অধিকার করে অথচ পৃথিবীর মোট শক্তির প্রায় 60 শতাংশ ভোগ করে। পৃথিবীর মোট ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রায় 80 শতাংশ এই মাত্র 25 শতাংশের দখলে। এবং এরা পৃথিবীতে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থের প্রায় 70 শতাংশের জন্য দায়ী। আজ যে সকল গ্রীনহাউস গ্যাস, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কিংবা ক্ষতিকারক রাসায়নিক বর্জ্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে ক্রমশ নষ্ট করে চলেছে তার সিংহভাগই এই সমস্ত দেশ থেকেই উৎসারিত হচ্ছে।

এই সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সুফল কিন্তু আজও তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশে এসে পৌঁছায়নি। তাইতো তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এখনো লড়াই চলছে সকলের জন্য শিক্ষা, নিরাপদ পানীয় জলের যোগান কিংবা ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য।

সুতরাং পরিবেশের অবনমন কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে সাম্যের প্রশ্নটিকে অগ্রাহ্য করা চলে না। তাই আজ চাই একদিকে বিশ্বের ধনী ও গরীব দেশগুলের অসাম্য দূরকরার লক্ষ্যে উন্নয়ন এবং অপরদিকে পরিবেশের অবনমন না ঘটিয়ে উন্নয়ন। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দীর্ঘস্থায়ী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এই ধারাকে ধারণযোগ্য উন্নয়ন (Sustainable development) বলা হয়। সারা পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীরা এই ধারণার ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন।

2.8. ○ ধারণযোগ্য উন্নয়নের ধারণা (Concept of sustainable development)

আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার প্রথম সফল উদ্যোগ শুরু হয় 1972 সালে। এই বছর সুইডেনের রাজধানী স্টকহেমে রাষ্ট্রসংঘের মানব পরিবেশ (Human Environment) শীর্ষক সম্মেলনে পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের সব দেশকে আহ্বান করা হয়। এতে পরিবেশের মূল সমস্যাগুলি এবং দূষণ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা হয়, এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কে 109টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর 1980 সালে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সংঘ (International Union for the conservation of Nature and Natural Resources) ধারণযোগ্য বা স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনাটির উপর গুরুত্ব দেয়। এরও কয়েকবছর পর 1987 সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে স্থাপিত হয় পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব কমিশন (World commission on the Environment and development)। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী ব্রান্টল্যান্ড (Brundtland) এবং তার নাম অনুসারে এই কমিশন ব্রান্টল্যান্ড কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিশন "আমাদের সাধারণ ভবিষ্যৎ" বা "Our Common Future" শীর্ষক প্রতিবেদনে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের দুটি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে— (i) পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রকে অক্ষুন্ন রাখা এবং (ii) পরিবেশের গুনগত মান অপরিবর্তিত রেখে মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নয়নে যত্নশীল হওয়া। এই দুটি বিষয়কে মাথায় রেখে ব্রান্টল্যান্ড কমিশন স্থিতিশীল উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংজ্ঞা দেন ঃ স্থিতিশীল উন্নয়ন হল বর্তমানের সমস্ত প্রয়োজনগুলিকে এমনভাবে মেটানো যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাগুলি মেটানোর ক্ষমতা নষ্ট না হয়। (Sustainable devolopemnt is the development that meets the needs and aspirations of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs.)। স্থিতিশীল উন্নয়নের সম্পর্কে ব্রান্টল্যান্ডের এই বক্তব্য পরবর্তীকালে প্রচুর বিতর্কের জন্ম দিলেও এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরে অবশ্য 1991 তে IUCN Report 'কেয়ারিং ফর দি আর্থ' (Caring

for the Earth) এবং 1992-র সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বসুন্ধরা সম্মেলনের 'এজেন্ডা 21'-ও (Agenda 21 of Earth Summit) উন্নয়ন সম্বন্ধে একই কথা বলে। অর্থাৎ স্থিতিশীল উন্নয়ন হল—

- (1) যা টিকিয়ে রাখা যায় কয়েক প্রজন্ম ধরে।
- (2) যার একটি সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি আছে।
- (3) যা বর্তমানের জন্য হলেও ভবিষ্যতের কোন ক্ষতি করে না।
- (4) যা বিশেষ করে পৃথিবীর গরীব মানুষের চাহিদা পূরণের দিকে বেশি নজর রাখে।
- (5) সাংস্কৃতিক ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করে।

2.8.1. নীতি নির্দেশিকা (Guidelines)

স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পেয়েছি, তাতে এটা স্পষ্ট যে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই ধরনের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রধান নীতি নির্দেশিকাগুলি হল—

- [1] উন্নয়নমূলক যে-কোনো কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় জনসাধারণকে অংশীদার করতে হবে।
- [2] বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক মতবাদ ও রীতিনীতি প্রচলিত আছে। সুতরাং পরিবেশ ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রয়োজন।
- [3] স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন। সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন—
  - [a] সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।
  - [b] কোনো বিশেষ সম্পদ সেইসব কাজে ব্যবহার করতে হবে, যেসব কাজের পক্ষে ওই সম্পদটি বিশেষভাবে উপযোগী এবং আর কোনো সম্পদ পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। খনিজ তেল উত্তাপ সৃষ্টির কাজে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু উত্তাপ সৃষ্টি কয়লা, কাঠ বা প্রাকৃতিক গ্যাসের দ্বারাও হতে পারে। বিদ্যুৎ, কয়লা পুড়িয়ে অথবা জলপ্রবাহ থেকেও উৎপাদিত হতে পারে। খনিজ তেল পরিশোধন করে যে পেট্রোল বা গ্যাসোলিন পাওয়া যায় তা মোটরগাড়ি ও বিমানপোত চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মোটরগাড়ি ও বিমানপোত চালানোর কাজ কয়লা, কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস বা জলবিদ্যুতের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং সংরক্ষণের জন্য খনিজ তেল উত্তাপ সৃষ্টি বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার না করে মোটরগাড়ি ও বিমানপোত চালানোর জন্য এবং আরও যেসব কাজ তেল ছাড়া আর অন্য কোনো জিনিসের দ্বারা সম্ভব নয় সেইসব কাজের জন্য ব্যবহার করতে হবে।
  - [c] প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেলের মতো যেগুলি সঞ্চিত বা গচ্ছিত সম্পদ সেগুলির প্রবিবর্তে যথাসম্ভব জলপ্রবাহ, সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ ও বনভূমির মতো পুনর্ভব সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। সংরক্ষণের জন্য শক্তি উৎপাদনের কাজে কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে জলস্রোতে, সূর্যকিরণ, বায়ুপ্রবাহ ও অন্যান্য অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
  - [d] সম্পদের উৎপাদন বিজ্ঞানসম্মতভাবে করতে হবে। এমনভাবে উৎপাদন করতে হবে যাতে কোনো অপচয় না ঘটে এবং সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন করা যায়।
  - [e] কোনো জিনিসের উৎপাদন শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে না। একটি বিশেষ অনুপাতে প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয়ের দ্বারাই উৎপাদন সংঘটিত হয়। এই কারণে সম্পদ সংরক্ষণ করতে

হলে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বিবেচনা করলে চলবে না, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানগুলি নিয়েও বিবেচনা করতে হবে। ব্যাপক কৃষিপদ্ধতিতে বেশি জমিতে কম শ্রমিক ও কম মূলধন নিয়োগ করে যে পরিমাণ ফসল ফলানো হয়, প্রগাঢ় কৃষিপদ্ধতিতে কম জমিতে বেশি মূলধন ও বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে সেই একই পরিমাণ ফসল ফলানো যায়। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের অনুপাত কমিয়ে এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের অনুপাত বাড়িয়ে আমরা একই পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করতে পারি। এইভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ হতে পারে।

♦ [f] গচ্ছিত সম্পদের মধ্যে কতগুলি সম্পদ প্রকৃতি থেকে আহরণের পর বারবার ব্যবহার করা (Recycling) যায়। যেমন আকরিক লোহা গচ্ছিত বা সঞ্চিত সম্পদ; একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে পৃথিবীতে সঞ্চিত আছে এবং খনি থেকে উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ স্থায়ীভাবে কমে যাচ্ছে। কিন্তু, লোহা ও ইস্পাতের তৈরি জিনিস ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেলে সেগুলি গলিয়ে আবার নতুন ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করা যায়। লোহার মতো আরও বহু ধাতু এভিাবে বার বার ব্যবহার করা যায়। এর জন্য অব্যবহার্য ধাতব দ্রব্য সযত্নে সংগ্রহ করে পুনরায় ব্যবহারে উপযোগী করে তুলতে হবে।

♦ [g] ভূমি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সম্পদ। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভূমিকে আশ্রয় করেই মানুষ বেঁচে আছে। কৃষিকার্য, পশুপালন, অরণ্য ভূমির ওপরেই গড়ে ওঠে। ভূমির ওপরেই বাসগৃহ, কলকারখানা, শিক্ষায়তন, প্রমোদকেন্দ্র, ধর্মস্থান, শহর, নগর, রেলপথ, সড়ক, বিমানবন্দর, নৌবন্দর প্রভৃতি নির্মিত হয়। এখনও মানবসভ্যতার অগ্রগতি বহুলাংশে ভূমির ওপর নির্ভরশীল। সেই কারণেই ভূমির সংরক্ষণ এবং দূরদর্শিতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহার বিশেষভাবে জরুরি।

♦ [h] সবরকম সম্পদ সংরক্ষণের জন্য একই নিয়ম ও পদ্ধতি অবলম্বন করা চলে না। সম্পদের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অনুযায়ী সংরক্ষণের নীতি, নিয়ম ও পদ্ধতি স্থির করতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বিভিন্ন সম্পদের গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটছে। সঙ্গে সঙ্গে এদের সংরক্ষণের প্রায়াজনীয়তারও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে। খনিজ নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত সার তৈরি করা হয়। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে সার উৎপাদনের কাজে লাগানোর পদ্ধতি আবিষ্কারে ফলে খনিজ নাইট্রেটের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই সম্পদ সংরক্ষণের তাগিদও কমে গেছে। সহজে, সস্তায় ও নিরাপদে আণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হলে অথবা সৌরশক্তি থেকে সস্তায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেলে কয়লা ও খনিজ তেল সংরক্ষণের জন্য এখনকার মতো এত উদ্‌বেগ ও দুশ্চিন্তা থাকবে কি?

♦ [i] পৃথিবীতে সম্পদের সর্বাধিক অপচয় ঘটে যুদ্ধের ফলে। আধুনিক সর্বাত্মক মহাযুদ্ধ অপরিমেয় সম্পদের ধ্বংসসাধন করে। এর সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসবাদ। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পদের ধ্বংসসাধন করছে। যুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ এবং পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে সম্পদ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থাই পুরোপুরি ফলপ্রসু হবে না।

♦ [j] সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টি স্বার্থের মধ্যে যে মূল দ্বন্দ্ব রয়েছে তা দূর করতে হবে। এর জন্য সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে জনগণের চেতনা বৃদ্ধি এবং যেসব সম্পদের সংরক্ষণ জরুরি সেগুলির ওপর সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো না কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। জাগ্রত জনমানস ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রই সমষ্টিস্বার্থের সর্বপ্রধান রক্ষক।

● [4] **বসুন্ধরার বহনক্ষমতা অনুযায়ী উন্নয়ন :** পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের [Ecosystem] বহনক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করলে পরিবেশ দূষিত হয় ও বাস্তুতন্ত্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সব অঞ্চলের

বাস্তুতন্ত্রের বহনক্ষমতা সমান নয়। কোনো অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের বহনক্ষমতা অনুযায়ী সেই অঞ্চলের জনসংখ্যা ও জীবনযাপন প্রণালীর সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। তবেই উন্নয়ন স্থিতিশীল হবে। এর জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তি ও কর্মপন্থা প্রয়োগ করা দরকার।

● [5] **পরিবেশের গুণগত মান বজায় রেখে উন্নয়ন :** উন্নয়নের যেসব পন্থা ও পদ্ধতি পরিবেশের গুণগত মানের হ্রাস ঘটায়, বাস্তুতন্ত্রের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করে সেগুলি বাদ দিতে হবে। স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখা দরকার। কারণ পরিবেশের গুণগত মান বজায় থাকলেই বাস্তুতন্ত্রের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

● [6] **অসাম্য দূরীকরণ :** পৃথিবীতে অল্প কয়েকটি দেশ ধনী। বেশিরভাগ দেশ দরিদ্র। একটি দেশের মধ্যেও অঞ্চলে-অঞ্চলে বৈষম্য রয়েছে। পাঞ্জাবের তুলনায় বিহার বা ওড়িশা অনেক পিছিয়ে আছে। একটি অঞ্চলের মধ্যেও ধনী দরিদ্রে বিরাট বৈষম্য দেখা যায়। এই সর্বব্যাপী অসাম্য নানাভাবে সম্পদের অপচয়, বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় এবং পরিবেশের নিদারুণ ক্ষতি করছে। স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য দেশে-দেশে, অঞ্চলে-অঞ্চলে, মানুষে-মানুষে বৈষম্য দূর করে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

● [7] **দূষণ নিয়ন্ত্রণ :** পরিবেশ দূষিত হলে সম্পদের ধ্বংসসাধ ঘটে, বাস্তুতন্ত্র বিপর্যস্ত হয়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়। শেষ পর্যন্ত শুধু যে উন্নয়ন ব্যাহত হয় তাই নয়, মানুষের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়।

● [8] **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা 600 কোটিরও বেশি। আগামী 50 বছরে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে 650 কোটি। লোকসংখ্যা এই হারে বাড়তে থাকলে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশের ওপর নিদারুণ চাপ পড়বে। বর্তমান ও ববিষ্যতে সম্পদের জোগান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে, ক্ষন্নয়ন সুস্থায়ী করতে হলে, জন্মহার নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

2.8.2. স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ (Measures) :

স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেগুলিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় : [ক] সাধারণ ব্যবস্থাসমূহ অর্থাৎ যেসব ব্যবস্থা উন্নত উন্নয়নশীল নির্বিশেষে সব দেশের পক্ষে প্রযোজ্য এবং [খ] ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ।

2.8.2.1 সাধারণ ব্যবস্থাসমূহ—যেগুলি সব দেশের পক্ষে গ্রহণীয় (Common measures)

- [1] প্রচলিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবর্তে সুস্থায়ী উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ।
- [2] পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলসম্পদ, অরণ্য ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ।
- [3] পরিবেশের প্রতি বন্ধুসুলভ প্রযুক্তি (eco-friendly technology) প্রয়োগ।
- [4] জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ। ধীরে ধীরে এই বৃদ্ধি শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে।
- [5] সঞ্চিত ও ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ব্যবহার কমিয়ে প্রবহমান ও পুনর্ভব সম্পদের ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- [6] শক্তি সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি ও অপচয় নিবারণ অবশ্য প্রয়োজন। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতির মতো অপ্রচলিত শক্তির উৎসগুলি ক্রমেই বেশি করে ব্যবহার করতে হবে।

- [7] পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কিত গবেষণার উন্নতিসাধন।
- [8] উৎপাদনমুখী কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- [9] যাবতীয় সম্পদের যথাযথ মূল্যায়ন।
- [10] বিশ্বের সল দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন।
- [11] হিংসাবর্জিত বিশ্ব স্থাপনের লক্ষ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ত্রাসবাদের চিরতরে সমাপ্তি ঘটাতে হবে।
- [12] প্রচলিত উন্নয়ন ও স্থিতিশীল উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জনচেতনার উন্মেষ ও বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রচারাভিযান চালাতে হবে।
- [13] আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী জীবনদর্শনের পরিবর্তন।

2.8.3. স্থিতিশীল উন্নয়নের নির্দেশক (Sustainable indicators) ঃ

I. পরিবেশগত নির্দেশক (Environmental indicators)

[1] ভৌমজলের সম্ভাবতা (ground water potential)
[2] ভৌমজল সম্পদ (ground water resources)
[3] শহরের নোংরাজল সংগ্রহ ও পরিশুধ্দিকরণ (Waste water generation, collection and treatment in urban areas).
[4] ধৃত সামুদ্রিক মাছের পরিমাণ (marine fish catch)
[5] ভূমি-ব্যবহার বিন্যাস (land use pattern)
[6] বনভূমির পরিমাণ (forest coverage)
[7] সংরক্ষিত অঞ্চল (protected areas)
[8] শক্তি সম্পদরূপে কাঠ জ্বালানীর ব্যবহার (wood energy resources)
[9] অরণ্য থেকে প্রাপ্ত কাঠের পরিমাণ (total wood collection from forest)
[10] গৃহপালিত পশুর সংখ্যা (livestock population)
[11] সারের ব্যবহার (use of fertilizer)
[12] কীটনাশকের ব্যবহার (use of pesticides)
[13] জনপ্রতি কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ (arable land per capita)
[14] অরণ্য ধ্বংসের হার (deforestation rate)
[15] বিপন্ন বন্যপ্রাণী (threatened animal species)
[16] সংরক্ষিত জীবজগতের নিঃশেষ হবার হার (rate of extinction of protected living organism)
[17] বায়ুমণ্ডলে অন্যান্য দূষকের (SO_x, NO_x, SPM) পরিমাণ (Other pollutants in the atmosphere)
[18] বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমন (per capita CO_2 emmision)
[19] O_3 স্তরের সংকোচনের জন্য দায়ী পদার্থসমূহের ব্যবহার (production and consumption of O_3 depleting substances)
[20] আবর্জনা উৎপাদন (waste generation)

[21] পুরসভার উৎপন্ন কঠিন আবর্জনা ও তার পরিশোধন (generation of municipal solid waste and its management)

[22] পরিবেশে ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ (generation of hazardous waste)

II. অর্থনৈতিক নির্দেশক (Environmental Indicators)

[1] GDP বৃদ্ধির হার (GDP growth rate)

[2] মোট আমদানি ও রপ্তানি (gross amount of exports and imports)

[3] প্রাকৃতিক সম্পদ—যেমন খনিজ তেল, কয়লা কিংবা অন্যান্য খনিজ পদার্থের সঞ্চয় (reserves of natural mineral resources)

[4] বাৎসরিক গড়ে জন প্রতি শক্তির ব্যবহার (per capita annual energy consumption)

III. সামাজিক নির্দেশক (Social Indicators)

[1] দরিদ্র্যতা (poverty level)

[2] কর্মসংস্থানের হার (employment rate)

[3] জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (population growth rate)

[4] জন ঘনত্ব (population density)

[5] প্রজনন হার (fertility rate)

[6] সাক্ষরতার হার (literacy rate)

[7] শিক্ষায় ব্যয়— GDP-এর কত ভাগ (% of GDP spent on health)

[8] নিরাপদ পানীয় জলের আওতায় জনসংখ্যা (% of people having safe drinking water)

[9] গড় আয় (life expectancy)

[10] শিশু মৃত্যুর হার (infant mortality rate)

[11] স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়—GDP এর কতভাগ (% of GDP spent on health)

[12] পরিবেশগত রোগের প্রার্দুভাব—(environmental diseases)

[13] শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার—(% growth of urban population)

[14] জনপ্রতি শক্তি গ্রহণ—(calorie intake per capita)

[15] যানবাহন ব্যবহারের সংখ্যা—(motor vehicles in use)

2.8.4. ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ (Measures in Indian content)

1986 খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসর 73 তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বিখ্যাত পরিবেশবিজ্ঞানী ড. টি. এন. খোশু [Dr. T. N. Khoshool] 'Environmental Priorities in India and Sustainable Development' বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন তার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। এছাড়া 1992 খ্রিস্টাব্দের ম্যানিটোবা সম্মেলন, [কানাডার ম্যানিটোবায়

অনুষ্ঠিত] রিও সম্মেলনের [রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে ব্রেজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলন] কার্যবিবরণীর মধ্যেও আমরা স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সে সম্পর্কে প্রায়াজনীয় তথ্য পাই। নীচে গ্রহণীয় ব্যবস্থাগুলি দেওয়া হল ঃ

- [1] জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ; জনসংখ্যা বৃদ্ধি ধীরে ধীরে বন্ধ করা।
- [2] জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার উন্নতি ঘটিয়ে মানবসম্পদের উন্নয়ন।
- [3] পুষ্টি, শিক্ষা, জীবিকা ও অন্যান্য সামাজিক সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের (নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের) বিলোপসাধন।

❑ বসুন্ধরা সম্মেলন ❑

রাষ্ট্রসংঘের (UNO) তত্ত্বাবধানে 1992 খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে (3–14 জুন) ব্রেজিলের রিও ডি জেনিরোতে বিশ্ব পরিবেশসংক্রান্ত এক আলোচনা সভা হয়। একে বসুন্ধরা সম্মেলন (Earth Summit) বলে। ভারসহ এই সম্মেলনে বিশ্বের 178টি দেশের সরকার অংশগ্রহণ করে। 12 দিন ব্যাপী এই সভায় আন্তর্জাতিক পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়গুলির গভীরভাবে পর্যালোচনা হয়। পাঁচটি পৃথক চুক্তিতে প্রায় সব অংশগ্রহণকারী দেশ সই করেন। পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা এবং তার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এটি এজেন্ডা-21 নামে পরিচিত। স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি উচ্চারিত হয় এখানে। প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে সুস্থ ও উৎপাদনশীল উন্নয়নের উপর জোর দেয় এই সম্মেলন যা রিও ডিক্লারেশন (Rio Declaration) নামে পরিচিত।

- [4] দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা।
- [5] ঘনবসতির পরিবর্তে ফাঁকা ফাঁকা বসতি স্থাপন ও বস্তি এলাকার উন্নয়ন।
- [6] স্কুল পর্যায় থেকে ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষাদান।
- [7] পরিবেশ সম্পর্কে গণচেতনা সৃষ্টি ও গণ আন্দোলন গড়ে তোলা।
- [8] পরিবেশসংক্রান্ত আইনের সংশোধন।
- [9] উন্নত দেশগুলির ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং ভোগবাদী জীবনদর্শনের পরিবর্তে মানবতাবাদী ও সংযত ভোগের আদর্শ গ্রহণ।

2.8.5. স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা

2.8.5.1. বায়ুমণ্ডলের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ (Measures for Atmosphere)

মানুষ, মনুষ্যেতর জীবজগৎ ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বায়ু অপরিহার্য। সেই কারণে বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা অব্যাহত রাখা উন্নয়নের প্রথম বিবেচ্য বিষয়। বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষার জন্য অনতিবিলম্বে নীচের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন—

- [1] বিশ্বের ওজোনস্তর অটুট রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য ওজোনস্তরের ক্ষতিসাধনকারী ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC) গ্যাসের উৎপাদন বন্ধ করা দরকার।

- [2] বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। এজন্য জীবাশ্ম জ্বালানির [কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস] ব্যবহার যতদূর সম্ভব কমিয়ে জলবিদ্যুৎ এবং সৌরশক্তির মতো অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। জলবিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলি পুরোপুরি পরিবেশবন্ধু [Eco-friendly]।
- [3] যানবাহন ও কলকারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- [4] বায়ুদূষণ প্রতিরোধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অবিরাম প্রচারাভিযান চালাতে হবে।
- [5] বায়ুপ্রবাহ রাজনৈতিক বিভাগের গণ্ডি অতিক্রম করে যায়। সেই কারণে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন জাতীয় স্তরে সতর্কতা দরকার তেমনি আন্তর্জাতিক স্তরে আইন প্রণয়ন ও সেই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা দরকার।
- [6] বনভূমির পরিমাণ যতদূর সম্ভব বাড়াতে হবে। বায়ু নির্মল রাখার পক্ষে উদ্ভিদ উৎকৃষ্ট উপায়।

2.8.5.2. জলসম্পদের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ (Measures for water resources)

- [1] জলের জোগান বণ্টন ও ব্যবহার সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- [2] কৃষির কাজে জলসেচের সময় প্রচুর জলের অপচয় ঘটে। এব্যাপারে নজর দেওয়া দরকার।
- [3] জলের যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপচয় নিবারণ করার জন্য প্রয়োজনে আইন করে জলকর বসানো যেতে পারে।
- [4] যেসব জায়গায় জলের জোগান যথেষ্ট নয়, সেখানে জোগান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।
- [5] প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ন্যূনতম পরিমাণ বিশুদ্ধ পানীয় জলের জোগান সুনিশ্চিত করতে হবে।
- [6] কলকারখানা ও পয়ঃপ্রণালী নির্গত ময়লা ও বিষাক্ত আবর্জনা যাতে জল দূষিত না করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
- [7] চাষের কাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে যাতে জলদূষণ না ঘটে সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- [8] দূষিত জল শোধন করার জন্য শোধনকেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।

2.8.5.3. জীববৈচিত্র্য (Bio-diversity) রক্ষার জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ

আগেই বলা হয়েছে মানুষের অবিমৃশ্যকারিতা ও সচেতনতার অভাবের জন্য বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী লুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ, জৈববৈচিত্র্য বজায় না থাকলে, উন্নয়ন অব্যাহত রাখা যাবে না। এজন্য নীচের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন—

- [1] আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও চুক্তি ছাড়া উপযুক্তভাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্ভব নয়। অনগ্রসর দেশগুলিতে জীববৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্য ধনী দেশগুলিকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য দিতে হবে।

- [2] কোন্ দেশে কোন্ কোন্ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বর্তমান সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও বিস্তারিত তালিকার প্রণয়ন প্রয়োজন। যেসব প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ লুপ্তপ্রায়, সেগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে সংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।
- [3] জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন এবং সেই আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা দরকার।
- [4] জীববৈচিত্র্য ও তা সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।
- [5] জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের সঙ্গে অরণ্যসম্পদের সংরক্ষণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোনো দেশের মোট আয়তনের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বনভূমি থাকা দরকার এবং ওই বনভূমির এক-তৃতীয়াংশ অভয়ারণ্য হিসাবে সংরক্ষিত রাখতে হবে।

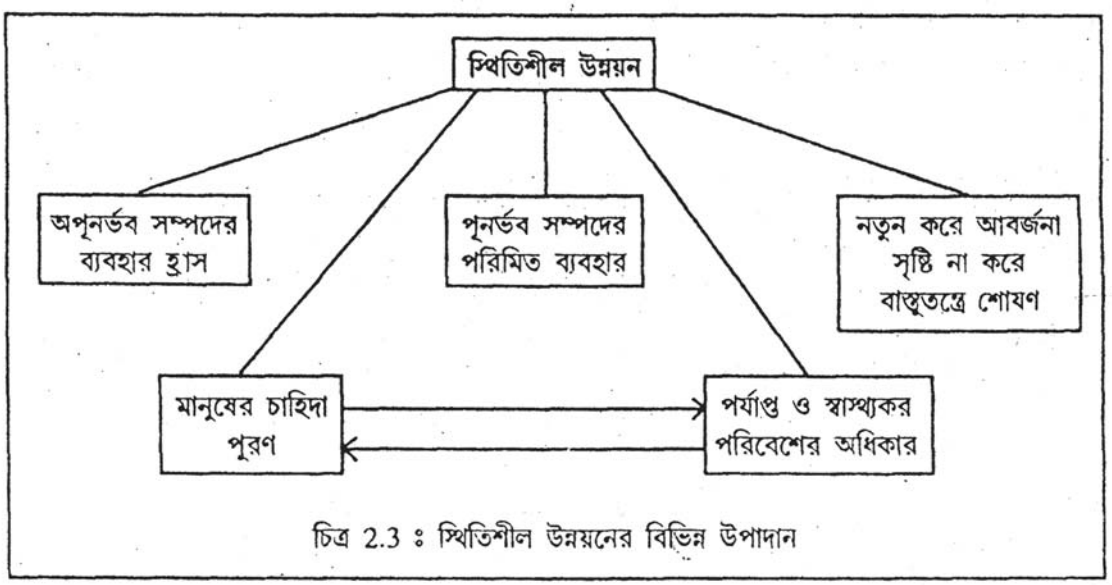

চিত্র 2.3 ঃ স্থিতিশীল উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান

2.8.5.4. ভূমির জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ (Measures for land protection)

অরণ্যের মতো ভূমিও মানুষের অন্যতম মৌলিক সম্পদ। ভূমিকে আশ্রয় করেই মানুষের জীবন ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ গড়ে ওঠে। উন্নয়ন অব্যাহত রাখার জন্য ভূমির সম্পর্কে নীচের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন—

- [1] কোনো দেশ বা অঞ্চলের ভূমির ব্যবহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। এরজন্য উপযুক্তভাবে ভূমির সমীক্ষা করতে হবে।
- [2] কৃষিকার্যে খুব বেশি রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ভূমি যাতে দূষিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। শহর ও নগর, কলকারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রভৃতি থেকে নির্গত নানারকম কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ ভূমিদূষণ সৃষ্টি করে। ওইসব বর্জ্য পদার্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য ও কিছুকিছু বর্জ্য পদার্থকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে।

- [3] মাটিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়। এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় ভূগর্ভস্থ জলের পরিবর্তে নদী, হ্রদ প্রভৃতি ভূপৃষ্ঠস্থ জলের বেশি ব্যবহার।
- [4] মরুভূমির চারদিকে বনভূমি সৃষ্টি করে মরুভূমির প্রসার রোধ করতে হবে।
- [5] কৃষিজমির চারদিকে, পাহাড়ের ঢালু গায়ে, নদীর উৎপত্তিস্থল ও ঊর্ধ্বগতিপথে, প্রবল বায়ুপ্রবাহের গতিপথে এবং সমুদ্রের তীরে গাছ লাগিয়ে অরণ্যবলয় রচনা করতে হবে। বাতাস ও জলস্রোতের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করার পক্ষে বনভূমি সবচেয়ে ভালো উপায়।
- [6] ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভূমির সুরক্ষার বিষয়ে জনসাধারণকে বিশেষ করে, কৃষককুলকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

2.8.5.5. অরণ্যসম্পদের জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ (Measures for forest conservation)

অরণ্য মানুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সম্পদ এবং পরিবেশের অন্যতম প্রধান উপাদান। পরিবেশ সুরক্ষা এবং উন্নয়ন অব্যাহত রাখার একটি প্রধান শর্ত হল অরণ্য সংরক্ষণ। অরণ্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য নীচের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন—

- [1] বন থেকে গাছ কাটার সঙ্গে তাল রেখে নতুন গাছ লাগাতে হবে।
- [2] কৃষি বনসৃজন, সামাজিক বনসৃজন, যেখানে যথেচ্ছভাবে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে বনভূমি হ্রাস পেয়েছে সেখানে নতুন গাছ লাগানো এবং মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের চারদিকে অরণ্যবলয় রচনা করতে হবে।
- [3] কেবলমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত গাছই কাটতে হবে। দুর্বল ও রোগাক্রান্ত গাছও কেটে ফেলতে হবে।
- [4] আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বন থেকে এমনভাবে গাছ কাটতে হবে যাতে আশপাশের গাছের ক্ষতি না হয়।
- [5] দাবানলের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য বন কে শুকনো ডালপালা ও গাছ নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। বনের মধ্যে আগুন লাগলে যাতে শীঘ্র জানা যায় তার জন্য মধ্যে মধ্যে পর্যবেক্ষণমঞ্চ নির্মাণ ও বিমান থেকে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা খুব ফলপ্রসূ। আগুন নেভানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই।
- [6] গাছে পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে।
- [7] অনিয়মিত পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- [8] জ্বালানির কাজে কঠোর পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানির ওপর জোর দিতে হবে। কাঠের অন্যান্য ব্যবহারেও বিকল্প উদ্ভাবন করতে হবে।
- [9] প্রত্যেক দেশের মোট আয়তনের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি দ্বারা ঢাকা থাকা দরকার। এর এক-তৃতীয়াংশ বন্য প্রাণীদের জন্য অভয়ারণ্য হিসাবে সংরক্ষিত রাখতে হবে।
- [10] উদ্ভিদ ছাড়া মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এই চেতনা প্রতিটি মানুষের মধ্যে সঞ্চার করার জন্য এবং অরণ্য সংরক্ষণের জন্য অবিরাম প্রচার চালাতে হবে।

❑ বসুন্ধরা সম্মেলনের এজেন্ডা 21 (বা 21-এর কর্মসূচি) ❑

1992 খ্রিস্টাব্দে 3-14ই জুন রিও ডি জেনিরো শহরে অনুষ্ঠিত "বসুন্ধরা সম্মেলনে" গৃহীত 21 শতকের কর্মসূচিকে "এজেন্ডা - 21" বলে।

এই কর্মসূচিগুলি সংক্ষেপে হল—

(1) বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা (2) অরণ্যের বিলোপ স্থগিত করা; (3) জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ; (4) স্বাস্থ্য সুরক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ; (5) জনবসতি উন্নয়নের স্থিতিশীল বা স্থায়ী বন্দোবস্ত; (6) দারিদ্র্য দূরীকরণ; (7) উন্নয়নশীল দেশগুলির স্থায়ী উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সহযোগিতা; (8) জনসংখ্যা সম্পর্কিত স্থায়ী উন্নয়ন; (9) ভূমি সম্পদের সার্বিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা; (10) পরিবেশের সাথে সাযুজ্য বজায় রেখে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার; (11) ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা ঃ মরুভূমির সম্প্রসারণ ও খরার প্রতিরোধ; (12) পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ; (13) গ্রামীণ উন্নয়ন ও স্থিতিশীল প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি; (14) সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের সুরক্ষা; (15) জলসম্পদ উন্নয়ন; (16) মানুষের ভোগের পরিবর্তন; (17) পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পরিকল্পনামাফিক উন্নয়ন; (18) বিষাক্ত বর্জ্যের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা; (19) বিপজ্জনক রাসায়নিক বর্জ্যের আন্তর্জাতিক পাচার বন্ধ করা; (20) তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের নিরাপদ ও পরিবেশ সম্মত বন্দোবস্ত করা; (21) দূষিত জল ও কঠিন বর্জ্যের নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা।

2.8.5.6. খনিজ সম্পদের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ (Measures for conservation of mineral resources)

খনিজ দ্রব্য সঞ্চিত ও ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ। অথচ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খনিজ সম্পদের জন্য নীচের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন—

1. উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এমনভাবে খনি থেকে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করতে হবে যাতে কোনোরকম অপচয় না ঘটে।
2. খনিজদ্রব্য ব্যবহারের সময়ও যথাসাধ্য অপচয় নিবারণ করতে হবে।
3. অবহেলা না করে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে নিম্নমানের আকরিকও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে হবে।
4. খনিজ দ্রব্যের পরিবর্ত সামগ্রীর ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। যেমন— টিনের কৌটোর পরিবর্তে প্লাস্টিকের কৌটো, স্টিলের আসবাবপত্রের পরিবর্তে পলিথিনের আসবাবপত্র প্রভৃতি পরিবর্ত সামগ্রীর আবিষ্কার উৎপাদন ও ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে।
5. যেসব খনিজদ্রব্য বারবার ব্যবহার করা যায় সেগুলির পুনর্ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। যেমন— লোহার ছাঁট ও ভাঙাচোরা লোহা ও ইস্পাতের সামগ্রী গলিয়ে আবার ইস্পাত উৎপাদন করা। তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুও এইভাবে বারবার ব্যবহার করা যায়।

6. অবিরাম জরিপ ও অনুসন্ধান চালিয়ে নতুন নতুন খনিজ দ্রব্যের ভাণ্ডার আবিষ্কার করতে হবে। বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এখনও প্রচুর অনাবিষ্কৃত খনিজসম্পদের ভাণ্ডার আছে বলে অনুমান করা হয়।
7. সমুদ্রগর্ভে যে বিপুল পরিমাণ খনিজসম্পদ সঞ্চিত আছে তা এখনও পর্যন্ত অতি সামান্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই সম্পদ আহরণের জন্য প্রযুক্তিগত উন্নতি ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার প্রয়োজন।
8. পরিত্যক্ত খনি অঞ্চলগুলিতে বনসৃজন করলে ও ভ্রমণকেন্দ্র গড়ে তুললে পরিবেশের ও অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হবে।

2.8.5.7. শক্তিসম্পদের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থাসমূহ (Measures for power resources)

গোটা বিশ্ব জুড়ে অহর্নিশি যে কর্মযজ্ঞ চলছে কোনো না কোনোরকম শক্তি ছাড়া তা সম্ভব নয়। শক্তিসম্পদ মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পবিপ্লব এবং বিশ্বজুড়ে মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতি, উৎপাদন ও পরিবহনের কাজে কয়লা ও খনিজ তেলের মতো জড়শক্তির ব্যবহার শুরু হবার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানে মানুষ যেসব শক্তিসম্পদ ব্যবহার করে তার বেশিরভাগ সঞ্চিত, ক্ষয়িষ্ণু ও অপুনর্ভব। শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশের গতিবেগ যত বাড়ছে এদের পরিমাণ ততই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে। সেই কারণে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে নীচের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন—

1. উৎপাদন ও ব্যবহারের সময় শক্তিসম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে কয়লার কথা বলা যায়। অবৈজ্ঞানিক ও অসতর্কভাবে খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের ফলে, অনেকসময় খনির মধ্যে অনেক কয়লা চিরকালের মতো অব্যবহার্য থেকে যায়।
2. উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ করে শক্তিসম্পদের ব্যবহারে ক্রমেই দক্ষতা বৃধি করতে হবে।
3. নতুন নতুন শক্তিসম্পদের ভাণ্ডার আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অবিরাম ভূতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।
4. কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো ক্ষয়িষ্ণু সঞ্চিত সম্পদের ব্যবহার যতটা সম্ভব কমিয়ে, জলবিদ্যুৎ, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জোয়ারভাটা শক্তি, ভূতাপশক্তি প্রভৃতি প্রবহমান শক্তির ব্যবহার বাড়তে হবে। এইসব প্রবহমান শক্তিসম্পদের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।
5. সঞ্চিত শক্তিসম্পদ ব্যবহারর ক্ষেত্রে যে কাজে যে সম্পদ অপরিহার্য, সেই কাজেই সেই সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। অন্য কাজে বিকল্পের সুযোগ থাকলে সেই সম্পদ ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। মোটরগাড়ি ও বিমানপোত খনিজতেল ছাড়া চলে না। কিন্তু কয়লা, খনিজতেল ও জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খনিজ তেলের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
6. জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, খনিজতেল, প্রাকৃতিক গ্যাস) ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হয়। দূষণরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।
7. শক্তিসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনচেতনা জাগাতে হবে।

2.8.5.9. সামুদ্রিক সম্পদের জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাসমূহ (Measures for conservation of Marine resources)

ভূপৃষ্ঠের মাত্র 30 শতাংশ স্থলভাগ; বাদবাকি 70 শতাংশ জলভাগ। সাগর-মহাসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি ভূপৃষ্ঠের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে মানুষ তার প্রয়োজনীয় সম্পদের অধিকাংশই ভূপৃষ্ঠ থেকে সংগ্রহ করে। জলভাগ থেকে পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় সম্পদের সামান্য অংশ। ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভের সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। প্রযুক্তিগত বাধা অতিক্রম করতে পারলে আগামী দিনে সমুদ্রের জল ও সমুদ্রগর্ভই হয়ে উঠবে মানুষের সম্পদের প্রধান উৎস। নানাভাবে সমুদ্র দূষিত হচ্ছে। এই দূষণরোধ এবং সমুদ্রের জৈব ও অজৈব সম্পদের বিকাশের জন্য স্থিতিশীল উন্নয়নের স্বার্থে নীচের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে—

1. সমুদ্রজলের দূষণরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
2. সমুদ্রের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিভিন্ন প্রাণীর যথোপযুক্ত ব্যবহার ও বিকাশের জন্য তাদের জীবন-ইতিহাস, খাদ্যাভ্যাস, প্রজনন ঋতু, প্রজননকালীন ব্যবহার, আয়ুষ্কাল প্রভৃতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করা দরকার। এইসব বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অনেক কিছু আমাদের অজানা থেকে গেছে।
3. মাছ, তিমি, সিল, কচ্ছপ প্রভৃতির নির্বিচার শিকার বন্ধ করতে হবে। সামুদ্রিক প্রাণী রাষ্ট্রীয় সীমানা মানে না। তাই এদের সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কঠোর আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োজন।
4. সমুদ্রে নানাবিধ উদ্ভিদ জন্মায়। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে এবং ভেষজ গুণের জন্য ওইসব উদ্ভিদ গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রের জলে এদের চাষের (Aqua-Culture) ব্যবস্থা করতে হবে।
5. সমুদ্রতীরবর্তী দেশগুলি, নিজ নিজ দেশের সংলগ্ন সমুদ্রে, সামুদ্রিক সম্পদ উন্নয়নের জন্য যাতে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে পারে, সেজন্য 'সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল' [Exclusive Economic Zone] উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
6. সামুদ্রিক সম্পদের (জৈব ও অজৈব) অপচয় রোধে সার্বিক আন্তর্জাতিক চুক্তি করতে হবে।

2.9. ○ প্রশ্নাবলী ও উত্তর (Question and Answer)

I. দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী :

1. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক্য উদাহরণ সহ আলোচনা কর।
   [উত্তর 2.3 এবং 2.5]
2. উন্নয়নের সীমা বলতে কি বোঝ? অবৈজ্ঞানিক উন্নয়নে পরিবেশ অবনমন কিভাবে ঘটে ব্যাখ্যা সহ উত্তর দাও।
   [উত্তর 2.6 এবং 2.4 ও 2.7]
3. ধারণযোগ্য উন্নয়ন কি? এক্ষেত্রে প্রধান নির্দেশকগুলি কি কি?
   [উত্তর 2.8 এবং 2.8.3]
4. ধারণযোগ্য উন্নয়নের নীতি নির্দেশিকাগুলির ব্যাখ্যা দাও।
   [উত্তর 2.8.1]
5. স্থিতিশীল উন্নয়নের আলোকে জল-বায়ু-মাটি সংরক্ষণের পদক্ষেপগুলি আলোচনা কর।
   [উত্তর 2.8.5.1, 2.8.5.2 ও 2.8.5.4]

6. স্থিতিশীল উন্নয়নের আলোকে অরণ্য সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ব্যাখ্যা কর।
[উত্তর 2.8.5.5 ও 2.8.5.3]

II. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী :

1. অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরগুলির ব্যাখ্যা কর।
[উত্তর 2.3]
2. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক্য লেখ।
[উত্তর 2.7]
3. বসুন্ধরা সম্মেলনের একুশ শতকের কর্মসূচী কি?
[উত্তর 2.8.8.5 এবং Box এর লেখা]
4. সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থাগুলি কি কি?
[উত্তর 2.8.5.9]
5. স্থিতিশীল উন্নয়নের সামাজিক নির্দেশকগুলি কি কি?
[উত্তর 2.8.3]
6. পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ কি?
[উত্তর 2.5]

III. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী :

1. বসুন্ধরা সম্মেলন কি? কোথায় কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
[উত্তর 2.8.4 এর মধ্যে Box এর লেখা]
2. পরিবেশবন্ধু শক্তিসম্পদ বলতে কি বোঝ?
[উত্তর 2.8.5.1 এর মধ্যে 2 নম্বর পয়েন্ট]
3. স্থিতিশীল উন্নয়ন কাকে বলে?
[উত্তর 2.8]
4. "সম্প্রসারণের সীমা" কথাটির অর্থ কি?
[উত্তর 2.6]
5. বস্তুতন্ত্রের বহনক্ষমতা বলতে কি বোঝায়?
[উত্তর 2.8.1 এর 4 নম্বর পয়েন্ট]
6. স্থিতিশীল উন্নয়নের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?
[উত্তর 2.8 এর শেষের অংশ]

একক 3 □ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (Environmental Management)

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা (Introduction)
3.2 উদ্দেশ্য (Objective)
3.3 পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (Environment Management)
3.4 পৃথিবীর "স্পেসসীপ" অবস্থা (Spaceship Earth)
3.5 বাস্তুতান্ত্রিক সাম্যতা (Ecological balance)
3.6 সম্পদের পুনচক্রীকরণ (Recycling of Resource)
3.7 জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (Population control)
3.8 পুনর্নবীকরন শক্তি (Renewal Energy)
3.9 অরণ্যায়ন (Afforestation)
3.10 জীব বৈচিত্র্য (Bio-Diversity)
3.11 প্রশ্নাবলী ও উত্তর

3.1. ○ প্রস্তাবনা (Introduction)

সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ আর পূর্বের অবস্থায় নেই। মানুষের অপরিমান লোভ ও আধিপত্য প্রাকৃতিক পরিবেশের গুণাবলীকে ক্রমশ নষ্ট করছে। এই অবস্থায় পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যতকে নিরাপদ করার জন্য পরিবেশের সুষ্ঠু পরিচালন অপরিহার্য্য। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মূল কথা হল সম্পদের সুষ্ঠু ও ন্যুনতম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের উপর মানুষের ক্ষতিকর প্রভাবকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা এবং পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখা। অর্থাৎ একদিকে মানবসমাজের উন্নয়ন ও বিকাশ এবং অন্যদিকে পরিবেশের গুণাবলী রক্ষণ পরিবেশ পরিচালনের দুটি প্রধান অংশ। কাজেই মানুষের সঙ্গে পরিবেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবেশের গুণগতমান বজায় রাখা পরিবেশ পরিচালনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই ব্যবস্থাপনা পরিবেশ পরিকল্পনা (Environmental plans) পরিবেশের অবস্থার মূল্যায়ন (Environmental Status evolution), পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন (Environmental Impact Assesment) এবং পরিবেশ আইন প্রনয়ন ও প্রশাসন (Enviromental legislation and administration) ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে অনুসরণ করা হয়। সম্পদের ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণেরই একটি অংশ। সংরক্ষণ বলতে সামগ্রিকভাবে

কোনো সম্পদের ব্যবহার, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। কাজেই পরিবেশ সংরক্ষণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহ বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে ব্যবহার করা যায় এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও নিয়ন্ত্রিত থাকে। প্রাকৃতিক উপকরণসমূহের ধারনযোগ্য ব্যবহার, পরিবেশে বর্জ্যপদার্থ কমানো এবং সঠিকভাবে ফেলা কিংবা পুনর্চক্রীকরণ শক্তির সুপরিকল্পিত ব্যবহার ও অপচয়রোধ ইত্যাদির মাধ্যমে এই সংরক্ষণ সম্ভব।

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সুরক্ষার সম্পর্কে সচেতনতা বৃধ্বির লক্ষে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন আইন প্রনয়নও করা হচ্ছে।

3.2. ○ উদ্দেশ্য (Objectives)

- প্রাকৃতিক সম্পদের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং তা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া।
- পরিবেশ দূষণের উৎস নিয়ন্ত্রণ।
- পূণর্ভব (Renewable) সম্পদের ব্যবহার বাড়ানো এবং অপূণর্ভব (Non renewable) সম্পদের ব্যাবহর কমানো।
- সম্পদের পুনঃব্যবহার ধারণার জন্ম এবং অপূনর্ভব সম্পদের পুনর্চক্রীকরণ (recycling) ব্যবহার।
- পরিবেশে জীব অবিশ্লেষ্য (non-biodegrable material) পদার্থসমূহের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা এবং এজাতীয় পদার্থসমূহের উপর নির্ভরশীলতা কমানো।
- কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করার আগে পরিবেশগত পরিকল্পনা (environmental planning) এবং আয়-ব্যয় (Cost benefit) পর্যালোচনা করা বাধ্যতামূলক করা।
- পরিবেশকে প্রভাবিত করে এমন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করার আগে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সেই কারণে পরিবেশগত অভিঘাত মূল্যায়ন (Enviromental Impact Assessment) বাধ্যতামূলক করা।
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রণয়ণ ও রূপায়ণ।

3.3. ○ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (Environment Management)

পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি ব্যাপ্তি পাওয়ার পর সেই সমস্যা সমাধানে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ চিন্তাভাবনা শুরু করে। কারণ পরিবেশ সমস্যার সুস্থ সমাধান কারুর একার কিংবা একটি দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সরকারগুলিও কেবল মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদাকরে চিন্তাভাবনা করলে কোনো সুরাহা হবার পথ বের হবে না। তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্তরে সরকারি ও বেসরকারী সংস্থা নিচু স্তরে এই ভাবনাচিন্তা শুরু করে। অন্যদিকে বিভিন্ন দেশগুলি আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির সহযোগিতায় পরিবেশ সম্মেলন আহ্বান করে। এবিষয়ে অনেকগুলি সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হলেও দুটি বিশ্ব শির্য বৈঠকের (1992, 1997) ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিশ্বপরিবেশকে তার আগের সুন্দর সার্বিক জায়গায় ফিরিয়ে না আনতে পারলেও নতুন করে বিশ্ব পরিবেশ অবনমনকে রোধ করা যায়। কিংবা অবনমনের হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এবিষয়ে একাধিক ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক

স্তরে কিংবা দেশীয়স্তরে নেওয়া যেতে পারে। পরিবেশ সংক্রান্ত প্রথম শীর্ষবৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1992 এর 3–14 জুন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে। রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত এ শীর্ষবৈঠকে যে ব্যবস্থাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হল (1) পৃথিবী ব্যাপী উষ্ণতাবৃদ্ধি বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং রোধ, (2) বন সংরক্ষণ, (3) জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, (4) কর্মসূচী 21 বা এজেন্ডা 21 রূপায়ণ ইত্যাদি। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যবস্থার সার্বিক আলোচনা করা হল। এই ব্যবস্থাগুলি না নিলে এই পৃথিবী অদূর ভবিষ্যতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের বাসযোগ্যতা হারাবে। সুতরাং মানুষের সঙ্গে পরিবেশের একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক হওয়া প্রয়োজন। এই কারণে পরিবেশের সুষ্ঠু পরিচালন অপরিহার্য্য।

অর্থাৎ আর্থ সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী (Suistatable) ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের গুণাবলীর উৎকর্ষসাধন পদ্ধতিকে এককথায় পরিবেশ পরিচালনা (Environment management) বলা হয়।

3.3.1. পরিবেশ পরিচালনের অনুশীলন (Approach of Environment Management) ঃ

● **নিরাপত্তাকর উপায় (Preservative Approach) ঃ** পরিবেশ পরিচালন অধ্যয়নের সবচেয়ে ধ্রুপদী উপায় হলো নিরাপত্তাকর উপায়। এই উপায়ের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে পরিবেশের অপূনর্ভর সম্পদ কিংবা বিপন্ন প্রাণী-উদ্ভিদকে রক্ষা করা। পরিবেশ পরিচালনের এই উপায়টি নিয়ে অর্থনীতিবিদ ও পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক বিতর্ক আছে।

● **দীর্ঘস্থায়ী উপায় (Sustainable Approach) ঃ** পৃথিবীর সম্পদসমূহের স্থিতিশীল বা দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারে মাধ্যমে (Sustainable use) সম্পদ সংরক্ষণ এবং সম্পদের অপচয় রোধ করার উপায়কে সংরক্ষণকর (Conservative) বা দীর্ঘস্থায়ী (Sustainable) উপায় বলে। সারা পৃথিবী জুড়ে বর্তমানে এই পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হয়েছে এবং এতে সুফলও পাওয়া যাচ্ছে।

3.4. ○ পৃথিবীর "স্পেসসীপ" অবস্থা (Spaceship Earth)

Spaceship Earth শব্দটি সম্ভবত Henry Georgo's-এর "Progress and Poverty (1879) বই থেকে নেওয়া। Space Ship Earth কথাটির অর্থ হল পৃথিবীর নিদিস্ট ও সীমিত সম্পদ ব্যবহার সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনা। মনে করা হয় পৃথিবী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটি চলন্ত যান যার জন্মগতভাবে নির্দিষ্ট রসদ বা জ্বালানী রয়েছে। এই যানের যাত্রীদের সংখ্যা কিন্তু নির্দিষ্ট নয়, তা ক্রমশ বাড়ছে — মানে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেই চলেছে। কিন্তু যাত্রীদের পৃথিবীর সীমিত খাদ্য, জল কিংবা শক্তি সম্পদকে নির্ভর করে বাঁচতে হবে। শুধু তাই নয় জঞ্জাল, দূষণ প্রভৃতি দিনকে দিন যেভাবে বাড়ছে তাতে Spaceship-এর যাত্রী হিসাবে বেঁচে থাকার O_2 নিয়ে টানাটানি পড়ছে। এ প্রসঙ্গে Raumschiff Erde তাঁর Spaceship Earth বইতে বলেছেন প্রতি মিনিটে পৃথিবীর বয়স কমছে এবং পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এই হারে ঃ

- 38000 টন CO_2 বায়ুতে মিশছে;
- মানুষ 3·5 বর্গ কিমি বনভূমি নষ্ট করছে;

- মানুষ 15000 টন জঞ্জাল জমা করছে;
- 90টি নতুন গাড়ী পরিবেশ নষ্টের তালিকায় যোগ হচ্ছে;
- 60,000 টন মাটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ধুয়ে মুছে চলে যাচ্ছে;
- পৃথিবীতে 165 জন লোক বাড়ছে;
- 90 জন মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মরছে।

এর থেকে পরি' আমাদের পৃথিবী যা প্রাণের একমাত্র আধার তা আজ আর খুব ভালো অবস্থায় নেই। একদিকে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জ্বালানী যেমন কমছে, তেমনি মানুষ সহ সমস্ত জীবকূলের নিরাপদ বসবাসের পরিবেশটা নষ্ট হচ্ছে। তাই আজ বোধহয় সময় এসেছে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার দায়িত্ব সবাইয়ের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার।

3.5. ○ বস্তুতান্ত্রিক সাম্যতা (Ecological balance)

পৃথিবীর সমস্ত রকমের জীবের ধারক ও বাহক হল জীবমণ্ডল। এই জীবমণ্ডলে সমস্ত ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীরা সহাবস্থান করে। এদের মধ্যে যখন উৎপাদক স্তর থেকে শুরু করে প্রত্যেক স্তরের খাদকের অস্তিত্ব স্বাভাবিক নিয়মে বজায় থাকে তখন তাকে বলে বাস্তুতান্ত্রিক সাম্যতা বা পরিবেশগত ভারসাম্য। অবশ্য মনে রাখা দরকার বাস্তুতন্ত্রে সজীব ও জড় উপাদানের অনবরত পরিবর্তন ঘটে এবং সেই কারণে সমস্ত বাস্তুতন্ত্রই গতিশীল। কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ এবং বিভিন্ন পুষ্টি পদার্থের চক্রাকার আবর্তন যদি অপরিবর্তিত থাকে তখন তাকে বাস্তুতন্ত্রের গতিশীল সাম্য অবস্থা (Dynamic equilibrium) বলে।

3.5.1. ভারসাম্যের শর্ত (Balancing factors)

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের প্রধান শর্তগুলিকে জড় উপাদান ও সজীব উপাদানে ভাগ করা যায়। প্রধান জড় উপাদানগুলি হল আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি। প্রধান সজীব উপাদানগুলি হল খাদ্য সরবরাহ, পরিপোষক বস্তুর উপস্থিতি, জীবের বংশবৃদ্ধির হার ইত্যাদি। এই উপাদানগুলির কোনো একটির অনুপস্থিতি বা পরিবর্তনে জীবের স্বাভাবিক জীবনচক্র ব্যাহত হয়। ফলে পরিবেশে যে সমস্ত জীব অভিযোজনে ব্যর্থ হয় তারা ক্রমশ হারিয়ে যায় বা তাদের বিলুপ্তি ঘটে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি সহায়ক ও জনসংখ্যা হ্রাস সহায়ক বিষয়গুলি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন (চিত্র 3.1)।

3.5.2. ফিড ব্যাক পদ্ধতি (Feed back mechanism)

যে প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বস্তুই নিজের উৎপাদককে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ফিড ব্যাক পদ্ধতি বলে। বাস্তুতন্ত্রে সুস্থিরতা ফিডব্যাক পদ্ধতির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। বাস্তুতন্ত্রে দুই প্রকার ফিড ব্যাক কাজ করে। যথা— পজিটিভ ফিডব্যাক ও নেগেটিভ ফিডব্যাক।

● **পজিটিভ ফিডব্যাক পদ্ধতি (Positive feed back mechanism) :** যে ফিডব্যাক পদ্ধতিতে কোনো বাস্তুতন্ত্রে জীবের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে তাকে পজিটিভ ফিড ব্যাক বলে। এক্ষেত্রে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যহায়ক বিষয়গুলি বাড়তে থাকে এবং অধিক সংখ্যক জীব উৎপন্ন হয়। পপুলেশনের আকৃতি প্রারম্ভিক পপুলেশন অপেক্ষা বেশি হয়। জনসংখ্যা বা পপুলেশন বৃদ্ধি সহায়ক প্রধান শর্তগুলি হল বংশবৃদ্ধির হার, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন ক্ষমতা, নতুন বাসস্থানে পরিযান করার ক্ষমতা, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা, জীবের প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি।

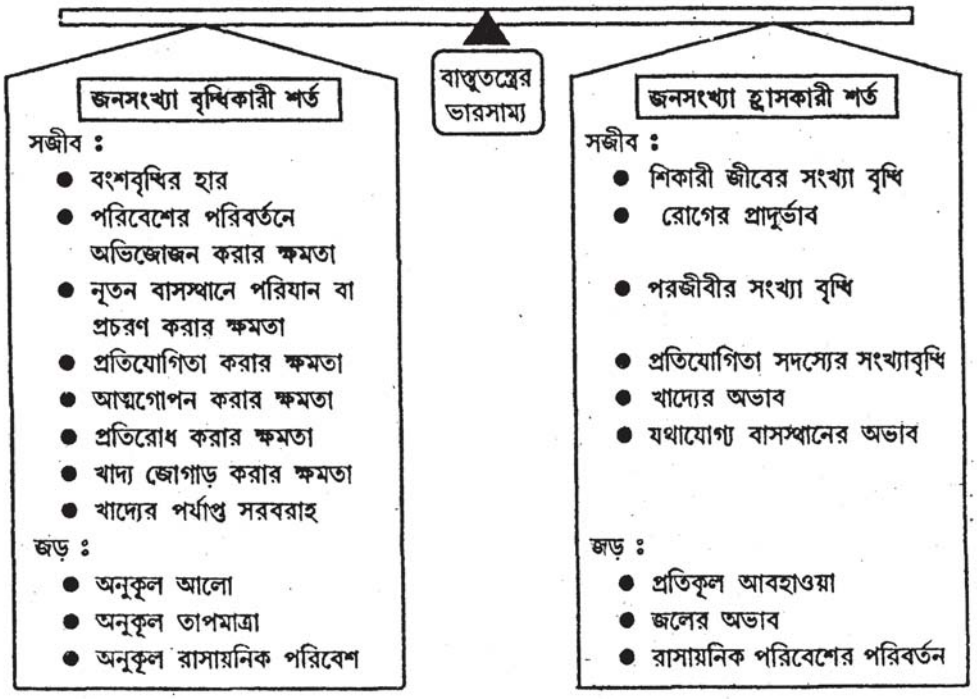

চিত্র 3.1 : বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী (বর্ধনকারী এবং হ্রাসকারী) শর্ত

● **নেগেটিভ ফিডব্যাক পদ্ধতি :** অপরদিকে, নানাকারণে কখনো কখনো পপুলেশন যথেষ্ট কমে যায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্তগুলি হল শিকারী জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি, রোগের প্রাদুর্ভাব, পরজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যের অভাব, অনুকূল বাসস্থানের অভাব ইত্যাদি। এই সমস্ত কারণে বাস্তুতন্ত্রের প্রারম্ভিক পপুলেশন হতে পপুলেশনের আকার কমে যায়।

নেগেটিভ ফিডব্যাক পদ্ধতিতে পপুলেশনের মৃত্যুর হার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বা কম হয়। এক্ষেত্রে পপুলেশনের আকৃতি বাস্তুতন্ত্রিক শর্ত যথা খাদ্য সংস্থান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পপুলেশনের আকার বৃদ্ধি পেলে খাদ্যাভাব এবং অনাহার জনিত সমস্যা বাড়ে এবং স্বাভাবিকের চেয়ে মৃত্যু হার বেশি হয়। আবার পপুলেশন কমলে খাদ্যের প্রাচুর্য্য হয় ও পুষ্টি বাড়ে, ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে মৃত্যু হার কমে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে পপুলেশনের আকৃতির ভারসাম্য রক্ষিত হয়। একে পপুলেশনের হোমিওস্টেটিক (Homeo static) অবস্থা বলা হয়।

3.5.3. ভারসাম্য হ্রাসের কারণ (Causes of unbalance)

বাস্তুসংস্থান পরিবেশে তখনই সকল জীব সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকে যদি জীব ও অজৈব সমস্ত উপাদান বা শর্তগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে উপস্থিত থাকে। কিন্তু পৃথিবীর জীবমণ্ডল সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। আবার অতীতের অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের অবলুপ্ত ঘটেছে। অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য হ্রাস পায়, যার পরিণতিতে ঘটে জীবের বিলুপ্তি। ভারসাম্য হ্রাসের কারণগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— (i) প্রাকৃতিক কারণ ও (ii) অপ্রাকৃতিক কারণ।

● **প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes) :** প্রকৃতি পদত্ত কিছু কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে যাদের প্রভাবে বাস্তুসংস্থানগত বিভিন্ন শর্তের পরিবর্তন ঘটেটে। যেমন—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বায়ুতে CO_2, SO_3, CO, H_2S প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাসের নির্গমণ। জলাভূমির ধান চাষ, পাট চাষ, মাছ চাষ কিংবা বিভিন্ন জৈব পদার্থের পচনের ফলে অনবরত CH_4 গ্যাসের সৃষ্টি এবং বায়ুতে মিশ্রণ। বিভিন্ন কারণে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফার্ন গ্যাস, ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নিত্যনতুন জন্ম, দাবানলে বনাঞ্চলের ধ্বংস ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা নষ্ট হতে পারে।

● **অপ্রাকৃতিক কারণ (Anthropogneic Causes) :** বর্তমানে বিভিন্ন অপ্রাকৃতিক মনুষ্যসৃষ্ট কারণেও বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে। যেমন— জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, বনাঞ্চল ধ্বংস, অপূণর্ভব সম্পদের দ্রুত হ্রাস, কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও ওষুধের ব্যবহার, জীবাশ্ম জ্বালানীর অতিরিক্ত ব্যবহারে বাতাসে CO_2 গ্যাসের নির্গমন, পারমাণবিক চুল্লি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রকৃতিতে সঞ্চয়, ইত্যাদি কারণে বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্য হ্রাস পায়।

3.6. ○ সম্পদের পুনচক্রীকরণ ব্যবহার (Recycling of resource

3.6.1. পুনচক্রীকরণ পদ্ধতি (Recycling method)

সম্পদকে কোনো একটি বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করার পর তাকে ফেলে না দিয়ে কিংবা বাতিল না করে অন্য কোন কাজে লাগানোর পদ্ধতিকে পুনর্চক্রকীকরণ (Recycling) বলে। এই তত্ত্বে প্রকৃতপক্ষে কোন বর্জ্যই অপ্রয়োজনীয় নয়। সমস্ত বর্জ্য থেকেই নানাপ্রকার সম্পদ উদ্ধার করা যায় এবং তা পুনর্ব্যবহার করে সম্পদের সাশ্রয় করা হয়। অজৈব বর্জ্যের মধ্যে কাগজ, ধাতু, কাঁচ ইত্যাদি সাধারণত পুনর্ব্যবহৃত হয়। জৈব বর্জ্যের সবচেয়ে ভালো ব্যবহার হল **'বায়ো গ্যাস প্ল্যান্ট'** যার থেকে রান্নার গ্যাস ও আলা জ্বালার গ্যাস উদ্ধার করা যায়। তাছাড়া বর্তমানে জৈব বর্জ্য থেকে জৈব সার প্রস্তুত করে জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

3.6.2. কয়েকটি বিশেষ বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার (Recycling of some wastes)

● **ফ্ল্যাই অ্যাশ :** ফ্ল্যাই আশ সাধারণত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানী পুড়ে উৎপন্ন হয়। বর্তমানে এই ফ্ল্যাই অ্যাশকে সংগ্রহ করে ইট বানানো হচ্ছে যা বাড়ি তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া ফ্লাই অ্যাশ সিমেন্টের বিকল্প হিসেবেও বহুল ব্যবহৃত।

● **কাগজ :** পরিত্যক্ত কাগজ থেকে অবাঞ্ছিত পদার্থ আলাদা করে কাগজের মণ্ড বানানো হয়। এই মণ্ড থেকে পরে কাগজের বোর্ড, কাগজের ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী করা হয়।

● **ধানের ভূষি ও আখের ছিবড়ে :** ধানকলগুলিতে প্রচুর ধানের ভূষি এবং চিনিকলগুলিতে আখের ছিবড়ে বর্জ্য পদার্থ হিসাবে উৎপন্ন হয়। ধানের ভূষি থেকে বর্তমানে ভোজ্য তেল উৎপন্ন হচ্ছে। আর আখের ছিবড়েকে কাগজের মণ্ড তৈরীতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

● **প্লাস্টিক :** বর্তমানে প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশের এক ভয়াবহ সমস্যা। কারণ প্লাস্টিকের কোন পচন হয় না। মাটিতেও মেশে না। তাই বর্জ্য প্লাস্টিককে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চলছে।

● **ময়লা জল :** ময়লা জল পরিশোধন করে তাকে ব্যবহারের উপযোগী করাও অন্যতম পুনর্চক্রীকরণ পদ্ধতি। বর্তমানে সারা পৃথিবী ব্যাপি ময়লা জল পরিশোধন করে মাছ চাষ ও সেচের কাজে লাগানো হচ্ছে। কলকাতা শহরের ময়লা জল এভাবে সল্টলেক সংলগ্ন জলাভূমির ভেড়িতে ফেলে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে।

3.7. ○ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (Population Control)

বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় 650 কোটি (2004)। আগামী 50 বছরে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে প্রায় 950 কোটি। জনসংখ্যা এই হারে বাড়তে থাকলে খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসের চাহিদাও অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবেশের উপর নিদারুণ চাপ পড়বে। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পদের জোগান অক্ষুন্ন রাখতে হলে ও উন্নয়ন সুস্থায়ী করতে হলে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য্য।

3.7.1. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের উপায় (Measures of population control)

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলিকে ঘনত্ব নিরপেক্ষ (Density independents) এবং ঘনত্ব নির্ভর (Density dependent) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ঘনত্ব নিরপেক্ষ প্রধান কারণগুলি হল দূষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং জলবায়ুগত Hazards ইত্যাদি। এগুলির ফলে বহু মানুষের মৃত্যু ও জনসংখ্যা হ্রাস পায়। এই বিষয়গুলি জনসংখ্যার আকার বা জনঘনত্বের কম-বেশির উপর নির্ভর করে না। প্রধান ঘনত্ব নির্ভর বিষয়গুলি হল শিকার, রোগের প্রাদুর্ভাব, আন্তঃ প্রজাতি সংগ্রাম, আপমন-বর্হিগমন কিংবা প্রজননক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী কোনো নিয়ন্ত্রক। এদের মধ্যে একমাত্র প্রজননক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ন্ত্রকগুলি বাদ দিলে বাকিগুলি সরাসরি জনসংখ্যার সঙ্গে অন্যকোনো প্রজাতির বা জীবের আন্তঃক্রিয়ার ফল। এগুলি খুব একটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সুতরাং মানুষের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র গ্রহণযোগ্য উপায় হলো প্রজননক্রিয়ায় প্রভাববিস্তারকারী বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হল মহিলাদের গর্ভনিরোধক বড়ি (Contraceptive Pill) খাওয়া ও পুরুষদের কন্ডোম (Condom) ব্যবহার। এছাড়াও আরও কতগুলি গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলির তুলনামূলক আলোচনা এখানে করা হল।

সারণী 3.2 : জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা

পদ্ধতি	উপবিভাগ	সাফল্যের হার	মন্তব্য
1. যান্ত্রিক (Mechanical)	(a) কনডোম ব্যবহার	95%	পুরুষদের ব্যবহৃত সহজতম পদ্ধতি, সর্বাধিক প্রচলিত।
	(b) ডায়ফ্রাম ব্যবহার	98%	মহিলার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য, ব্যবহার জনপ্রিয় নয়।
	(c) IUD ব্যবহার (Intrauterine Device)	95–99%	মহিলাদের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ব্যবহার করতে হয়, খুব একটা প্রচলিত নয়।
2. রাসায়নিক (Chemical)	(a) গর্ভনিরোধক বড়ি (Pill)	98–99%	মহিলাদের খেতে হয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যুক্ত, সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়।
	(b) শুক্রাণুনাশক জেলি	90%	যৌনমিলনের আগে নারীর যোনিপথে প্রয়োগ, প্রভাব স্বল্পস্থায়ী।
3. অস্ত্রপ্রচার (Surgical)	(a) ভ্যাসেক্টমি	100%	পুরুষের শুক্রনালীতে ছোট অস্ত্রপ্রচার করতে হয়, জনপ্রিয় নয়।
	(b) টিউবেকটমি বা লাইগেশম	100%	মহিলাদের ডিম্বনালীতে ছোট অস্ত্রপ্রচার, বহুল প্রচলিত নয়।

3.8. ○ পুনর্নবীকরণ শক্তি (Renewal Energy)

যে সমস্ত শক্তির উৎসকে বার বার ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ যাদের উৎস অফুরন্ত সেইসব শক্তির উৎসকে পুনর্নবীকরণ যোগ্য (renewable) শক্তি উৎস বলা হয়। যেমন জলবিদ্যুৎ শক্তি, সৌর শক্তি, বায়ু শক্তি, জোয়ার ভাটা শক্তি, সমুদ্রের স্রোত ও ঢেউ থেকে প্রাপ্ত শক্তি, ভূতাপশক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে এই সব শক্তির উৎসের কথা বেশি বেশি করে ভাবা হচ্ছে। কারণ—

- এগুলি প্রবহমান শক্তি। এদের উৎস কখনো ফুরিয়ে যাবে না, চিরকাল থাকবে।
- বৃহদাকারে কিংবা ক্ষুদ্রাকারে ব্যবহার করা যায়। ফলে সর্বদা উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্য প্রচুর মূলধনের দরকার হয় না।

3.8.1. জলবিদ্যুৎ (Hydel Power)

কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জলপ্রবাহ শক্তির অন্যতম উৎস। সূর্যের তাপে সাগর-মহাসাগরের জল বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে ও সেখান থেকে আবার ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি অথবা তুষার রূপে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। অসংখ্য নদীনালার ভিতর দিয়ে বৃষ্টির জল ও তুষারগলা জল সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। জলপ্রবাহের এই গতিশক্তি থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তাকে জলবিদ্যুৎ বলে।

3.8.1.1. ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Uses and Economic importance)

(i) পৃথিবীতে কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইউরেনিয়াম প্রভৃতির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এদের পরিমাণ স্থায়ীভাবে কমে যাচ্ছে এবং একদিন এরা একেবারেই ফুরিয়ে যাবে। এইগুলি সঞ্চিত সম্পদ ও ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু জলপ্রাবাহ চিরকাল পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে বয়ে যাবে এবং ওই প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎও উৎপাদন করা যাবে। অর্থাৎ জলবিদ্যুৎ প্রবহমান ও মানুষের একটি স্থায়ী শক্তিসম্পদ।

(ii) পৃথিবীতে উৎপাদিত অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা ও শিল্প কলকারখানায় ব্যবহৃত হয়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জলবিদ্যুৎ পরিবহনের খরচ খনিজ তেল ও কয়লা পরিবহনের তুলনায় কম। আধুনিক গ্রিড ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বহু দূরে সহজে ও সস্তায় বিদ্যুৎ পাঠানো সম্ভব। এই কারণে জলবিদ্যুতের সাহায্যে কোনো দেশের সকল অংশে সমানভাবে অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নতি সম্ভব।

(iii) জলবিদ্যুৎ আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে **শিল্পের বিকেন্দ্রীভবন** (Decentraiisation) সহজসাধ্য হচ্ছে।

(iv) অন্যান্য শক্তিসম্পদের তুলনায় জলবিদ্যুৎকে ব্যবহারযোগ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট বা অংশে ভাগ করা যায়। ফলে অতি আধুনিক নানাবিধ শিল্পে জলবিদ্যুতের চাহিদা বেশি।

(v) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও পৌনঃপুনিক ব্যয় অনেক কম। তাই কয়লা বা খনিজ তেল পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেই বিদ্যুতের সাহায্যে কলকারখানা চালালে শিল্পদ্রব্যের যা উৎপাদন খরচ পড়ে, জলবিদ্যুতের সাহায্যে কারখানা চালালে উৎপাদন খরচ তার থেকে কম পড়ে। অর্থাৎ, জলবিদ্যুতের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সস্তায় শিল্পসামগ্রী উৎপাদন করা যায়।

(vi) কতকগুলি শিল্পে খুব বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়। যেমন— অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি। জলবিদ্যুৎ অপেক্ষাকৃত সস্তা বলে ওইসব শিল্পের উন্নতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(vii) সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের মতো কোনো কোনো দেশে কয়লা ও খনিজ তেলের অভাব আছে। কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা আছে। ওই সব দেশের পক্ষে জলবিদ্যুৎই শক্তির প্রধান উৎস এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি। কয়লার অভাব পূরণ করে বলে জলবিদ্যুৎকে সাদা কয়লা (White Coal) বলা হয়।

(viii) কয়লা ও খনিজ তেল খনি থেকে তোলা, তারপর তার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, এই সম্পূর্ণ কাজের জন্য যত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সেই তুলনায় কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

(x) কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে যে রকম ধোঁয়া ও বয়লার সৃষ্টি হয়, পরিবেশ দূষিত হয়, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে তা হয় না। জলবিদ্যুৎ **পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত**। ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মতো পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা থাকে জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেইরকম কোনো বিপদের ঝুঁকি নেই।

3.8.1.2. জলবিদ্যুতের অসুবিধা (Disadvantages of hydroelectricity)

অন্যান্য শক্তিসম্পদের তুলনায় জলবিদ্যুতের কয়েকটি অসুবিধা আছে। যেমন—

(i) কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি সঞ্চয় করা যায়। কিন্তু জলবিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখা যায় না। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।

(ii) জলের গতিশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। তাই, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গতিবেগসম্পন্ন জলপ্রবাহ চাই। গতিবেগ যত বেশি হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনও তত বেশি হয়। এই কারণে জলপ্রপাত, অথবা পার্বত্য অঞ্চলের খরস্রোতা নদীর কাছেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা সুবিধাজনক। কিন্তু কয়লা ও খনিজ তেল খনি থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে শক্তি উৎপাদন করা যায়।

(iii) কয়লা ও খনিজ তেল শক্তিসম্পদ ছাড়া শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। জলবিদ্যুৎ কেবল শক্তি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

(iv) কয়লা ও খনিজ তেল থেকে নানারকম উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। কিন্তু জলবিদ্যুৎ থেকে কোনো উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় না।

(v) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধন ও উচ্চ শ্রেণির কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সেই কারণে বিশ্বের বহু অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও পুঁজি ও দক্ষতার অভাবে সেই সম্ভাবনা কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি।

3.8.1.3. জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Favourable conditions for hydel power)

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কতকগুলি প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকূল থাকা দরকার।

● **(ক) প্রাকৃতিক অবস্থাসমূহ (Physical conditions) :** জলস্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। জলের গতিশক্তিকে ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। কী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে তা নির্ভর করে কী পরিমাণ জল কতটা বেগে প্রবাহিত হচ্ছে তার উপর। সুতরাং জলবিদ্যুতের উৎপাদন মূলত তিনটি উপাদানের উপর নির্ভর করে—

(i) **বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত :** জলের পরিমাণ নির্ভর করে বৃষ্টিপাত ও তুষারপাতের পরিমাণের উপর। যেসব নদী বৃষ্টির জলের দ্বারা পুষ্ট, সেইসব নদী থেকে কতটা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে তা অনেকখানি নির্ভর করে ওই নদীর উৎপত্তিস্থলে ও অববাহিকা অঞ্চলে **বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের** পরিমাণ কতটা তার উপর। এইভাবে তুষারগলা জলে পুষ্ট নদী থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ নির্ভর করে **তুষারপাতের পরিমাণের** উপর। নদীস্রোত থেকে সারা বছর সমানভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হলে নদীতে **সারা বছর সমান জল থাকা দরকার।** সাধারণত যেসব নদী তুষারগলা জলে পুষ্ট সেগুলি থেকে সারা বছর জল থাকে। উত্তর ভারতের নদীগুলি এইরকম। যেসর নদী বৃষ্টির জলে পুষ্ট সেগুলি থেকে সারা বছর স্বাভাবিকবাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে কিনা তা নির্ভর করে বৃষ্টিপাতের প্রকৃতির উপর। বৃষ্টিপাত নিরক্ষীয় জলবায়ুর মতো সারা বছর ধরে হলে নদীতে বছরের সকল সময়েই জল থাকে।

যেমন— দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী ও মধ্য আফ্রিকার কঙ্গো (জাইরে) নদী। কিন্তু ক্রান্তীয় মৌসুমি, ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে বৃষ্টিপাত বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ। ফলে ওই বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদীতে সারা বছর জল থাকে না। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ওইসব নদী থেকে নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হলে বহু অর্থব্যয়ে জলাধার নির্মাণ করে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

(ii) **হ্রদ, জলাভূমি প্রভৃতি :** নদী কোনো বড়ো হ্রদ থেকে উৎপন্ন হলে, কিংবা বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, ছিদ্রবহুল আগ্নেয় মৃত্তিকা এবং হ্রদ ও জলাভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সারা বছর জল থাকে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা হয়।

(iii) **জমির ঢাল :** জলের গতিবেগ নির্ভর করে যে জমির উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে তার ঢালের উপর। এই কারণে ঢালু জমি বা পাহাড়ের গায়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদী বা জলপ্রপাত থেকে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। বন্ধুর ভূপ্রকৃতি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক। অন্যদিকে সমতল ভূপ্রকৃতি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল নয়। উপরের উপাদানগুলি ছাড়া, জলবিদ্যুতের উৎপাদন আরও কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদানের উপর নির্ভর করে। যেমন—

(iv) **তাপমাত্রা :** তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গেলে জল জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যায়। ফলে ওই সময় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত নায়েগ্রা জলপ্রপাত শীতকালে জমে যায় বলে ওই সময়ে ওই জলপ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় না। এইভাবে শীতপ্রধান জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে সারা বছর ধরে সমানভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না।

(v) **অরণ্য :** জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যে অরণ্য অন্যতম। বিস্তীর্ণ বনভূমি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। নদীর উৎপত্তিস্থলে বনভূমি থাকলে ওই বনভূমি জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে নদীতে সারা বছর জল থাকতে সাহায্য করে। অরণ্য ভূমিক্ষয় রোধ করে। অত্যধিক ভূমিক্ষয় নদীর জলে **পলির পরিমাণ** বৃদ্ধি করে। এর ফলে, নদীগর্ভ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্মিত জলাধার দ্রুত ভরাট হয়ে যায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়।

(vi) **ভূতাত্ত্বিক গঠন :** ভূমিকম্পপ্রবণ ও দুর্বল ভূতাত্ত্বিক গঠনযুক্ত এলাকায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বড়ো বাঁধ বা জলাধার নির্মাণ করা যায় না। কারণ জলের চাপে ধস নামতে পারে, ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফলে নদীর গতিপথের পরিবর্তন ও জলবিদ্যুৎ ভূতাত্ত্বিক গঠন মজবুত কিনা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

● **(খ) অপ্রাকৃতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ (Non-physical or Economic conditions) :** কোন্ অঞ্চলে কী পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে তা উপরে যেসব প্রাকৃতিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলি উপর নির্ভর করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ক পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে তা নির্ভর করে কতকগুলি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। যেমন—

(i) **বিদ্যুতের চাহিদা :** কোন্ অঞ্চলে কতটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে তা নির্ভর করে বিদ্যুতের চাহিদার ওপর। আর, বিদ্যুতের চাহিদা নির্ভর করে **জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান** এবং **শিল্প ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ওপর।** জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যত উন্নত হবে, আলো, পাখা, রেডিয়ো, টেলিভিশন, রান্না, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গৃহস্থালির প্রয়োজনে বিদ্যুতের চাহিদা তত বৃদ্ধি পাবে।

ওইভাবে যে দেশ যত শিল্পোন্নত এবং যেখানে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যত প্রসার ঘটেছে সেকানে বিদ্যুতের চাহিদা তত বেশি।

(ii) **বিকল্প শক্তিসম্পদের অভাব :** জলবিদ্যুৎ ছাড়া কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে শক্তি পাওয়া যায়। যেখানে কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় না অথবা ওইসব শক্তিসম্পদের দাম বেশি, সেখানে সস্তায় জলবিদ্যুৎ পাওয়ার সুবিধা থাকলে স্বভাবত তার চাহিদা বেশি হয়। এই কারণে সুইডেন, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার বেশি।

(iii) **মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যা** জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রচুর স্থায়ী মূলধন ও উচ্চশ্রেণির প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজন হয়। বিশাল বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ, ওই কাজের জন্য জমির দখল নেওয়া এবং ওই জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের পুনর্বাসন, পাওয়ার হাউস নির্মাণ, দামি যন্ত্রপাতি কেনা ও বসানো এবং বিদ্যুৎ পরিবহনের ব্যবস্থা করার জন্য ওই মূলধন দরকার হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাকৃতিক সুবিধা থাকলেও, ওইসব দেশ অনুন্নত অথবা স্বল্পোন্নত বলে এবং ওইসব দেশে মূলধন ও উচ্চ শ্রেণির কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ারের অভাব থাকায় জলবিদ্যুতের প্রকৃত উৎপাদন সামান্য। অন্যদিকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলির প্রাকৃতিক অবস্থা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে ততটা অনুকূল না হলেও ওইসব দেশ শিল্পোন্নত হওয়ায় এবং ওদের মূলধন ও প্রযুক্তিবিদের অভাব না থাকায় প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

(iv) **বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্প (Multi-purpose River valley Project) :** কোনো নদীকে উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে শুধু যে সম্ভাব্য বন্যা রোধ করা যায় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ওই নদীর জলের সাহায্যে কৃষিভূমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়, জলস্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, নদীর বাঁধ ও জলাধারে মাছ চাষের ব্যবস্থা হয় এবং অরণ্যসম্পদ বৃদ্ধি, ভূমিক্ষয় নিবারণ, স্বাস্থ্যনিবাস ও পর্যটনকেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি বহু উপকার একসঙ্গে লাভ করা যায়। এইভাবে একটা নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে তার থেকে একসঙ্গে বহু উপকার লাভ করার ব্যবস্থা হলে তাকে বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্প বলে। আমাদের দেশে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প, ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প প্রভৃতি এর উদাহরণ। জলস্রোত থেকে শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে উৎপাদন খরচ যা পড়বে, বহুমুখী নদী প্রকল্পে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু উপকার পাওয়া যায় বলে অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ অপেক্ষাকৃত কম পড়বে।

3.8.1.4. বিশ্বের সুপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তি ও জলবিদ্যুতের প্রকৃত উৎপাদন (Potential hydel energy and actual generation of hydroelectricity)

আগেই বলা হয়েছে, কোথায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কতটা সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ সুপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তি কতটা তা নির্ভর করে কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থার উপর। কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেই যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে তা নয়। কারণ প্রকৃত উৎপাদন নির্ভর করে কতকগুলি অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থার উপর। পৃথিবীতে সুপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি আফ্রিকা মহাদেশে, বিশেষ করে মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকায়, তারপর এশিয়া, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। কিন্তু আফ্রিকায় জলবিদ্যুতের প্রকৃত উৎপাদন খুবই সামান্য। প্রধানত উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলিতেই সুপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নতি

ঘটানো হয়েছে। এশিয়ায় জাপান সুপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারে অগ্রগণ্য। নীচে সুপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তি ও প্রকৃত উৎপাদনের একটা তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হল।

সারণী 3.2 : বিশ্বে জলবিদ্যুতের সম্ভাব্য ও প্রকৃত উৎপাদনের শতকরা হিসাব

মহাদেশ	বিশ্বের সম্ভাব্য উৎপাদনের শতাংশ	বিশ্বের প্রকৃত উৎপাদনের শতাংশ
1. আফ্রিকা	41·4	3·0
2. এশিয়া	23·0	16·0
3. উত্তর আমেরিকা	13·2	35·0
4. ইউরোপ	10·5	32·0
5. দক্ষিণ আমেরিকা	8·4	12·0
6. অস্ট্রেলিয়া	3·5	2·0
পৃথিবী	100·0	100·0

উৎস : অর্থনৈতিক ভূগোল, বসু ও দাস (2005), Page-186

3.8.1.5. উৎপাদক অঞ্চল (Producing regions)

❑ **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র :** বিশ্বে এই দেশে সবচেয়ে বেশি জলবিদুৎ উৎপাদিত হয়। অনুকূল পরিবেশ, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নতি, বিদ্যুতের চাহিদা এবং পুঁজির সহজ সরবরাহ যুক্তরাষ্ট্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নতির কারণ। এই দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অংশে অনেকগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। (i) নায়েগ্রা জলপ্রপাত ও সেন্ট লরেন্স নদী থেকে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। কর্নওয়াল, কিংসটন, বারসিমিস, প্রেসকট প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র। হ্রদ অঞ্চল ও সেন্ট লরেন্স নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের কলকারখানায় এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। (ii) হাডসন নদীর জলপ্রপাতগুলি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। (iii) অ্যাপালেশিয়ান পর্বতের পূর্বদিকে পর্বত ও উপকূলবর্তী সমভূমির মাঝখানে অবস্থিত সারিবদ্ধ জলপ্রপাতগুলি (প্রপাতরেখা) থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে ক্লার্ক হিল, হার্ট ওয়েল, কোটসবিল, রাডফোর্ড, জন কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। (iv) টেনেসি নদীর উপত্যকায় **টেনেসি উপত্যকা প্রকল্প** অনুযায়ী জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উইলসন, কাটারস্ জোকাস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র। (v) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে মিসিসিপি ও মিসৌরি নদীর উপর অনেকগুলি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ওই কেন্দ্রগুলির মধ্যে মিনিয়াপোলিসে মিসিসিপি নদীর উপর **সেন্ট অ্যান্থনি ফলস**-এর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার জলবিদ্যুৎ এই অঞ্চলে ময়দাশিল্প, মাংসশিল্প, ফলশিল্প প্রভৃতি স্থাপনে সাহায্য করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল এর রকি পার্বত্য অঞ্চলে শক্তিসম্পদ হিসাবে জলবিদ্যুতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। (vi) কলাম্বিয়া নদীর উপর তিনটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা আছে—জন ডে, গ্র্যান্ড কুলি ও চিফ জোসেফ। (vii) কলোরাডো নদীর উপর হুভার বাঁধ এবং কলোরোডোর দুইটি উপনদীর ওপর নির্মিত কুলিজ বাঁধ ও রুজবেল্ট বাঁধ থেকে সেচের জলের সঙ্গে সঙ্গে জলবিদ্যুৎও পাওয়া যায়। (viii) ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে সান জোয়াকিন ও স্যাক্রামেন্টো নদীর উপত্যকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

❑ **কানাডা :** বিশ্বে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে কানাডা দ্বিতীয়। এই দেশের শতকরা 80 ভাগ বিদ্যুৎ জলপ্রবাহ থেকে উৎপন্ন হয়। কানাডায় কাগজ ও মণ্ডশিল্পের উন্নতি জলবিদ্যুতের ফলেই সম্ভব হয়েছে। অন্টারিও ও কুইবেক প্রদেশে নায়েগ্রা জলপ্রপাত এবং সেন্ট লরেন্স, আটোয়া ও নিপিগন নদী থেকে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। সুপিরিয়র হ্রদের সন্ট স্টে মেরি জলপ্রপাত থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশেও অনেকগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এখানে নেচাকো নদী, ব্রিজ নদী, অ্যারো হ্রদ প্রভৃতি থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

❑ **রাশিয়া :** সুপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তি এই দেশে অনেক বেশি। প্রকৃত উৎপাদন সেই তুলনায় কম। এই দেশে সবচেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় ভোল্গা নদী থেকে। ওই নদীর উপর অনেকগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ওইসব কেন্দ্রের মধ্যে ভল্গোগ্রাড ও কুইবিশেভ বাঁধ সবচেয়ে বড়ো। ভোল্গার সবচেয়ে বড়ো উপনদী কামা। কামানদীর ওপর ভটকিনস্ক গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

রাশিয়ার এশীয় অংশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা ইউরোনীয় অংশের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু লোকবসতি ও শিল্পোন্নতির অভাবে সেই সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার এতদিন পর্যন্ত হয়নি। বর্তমানে এই অংশে

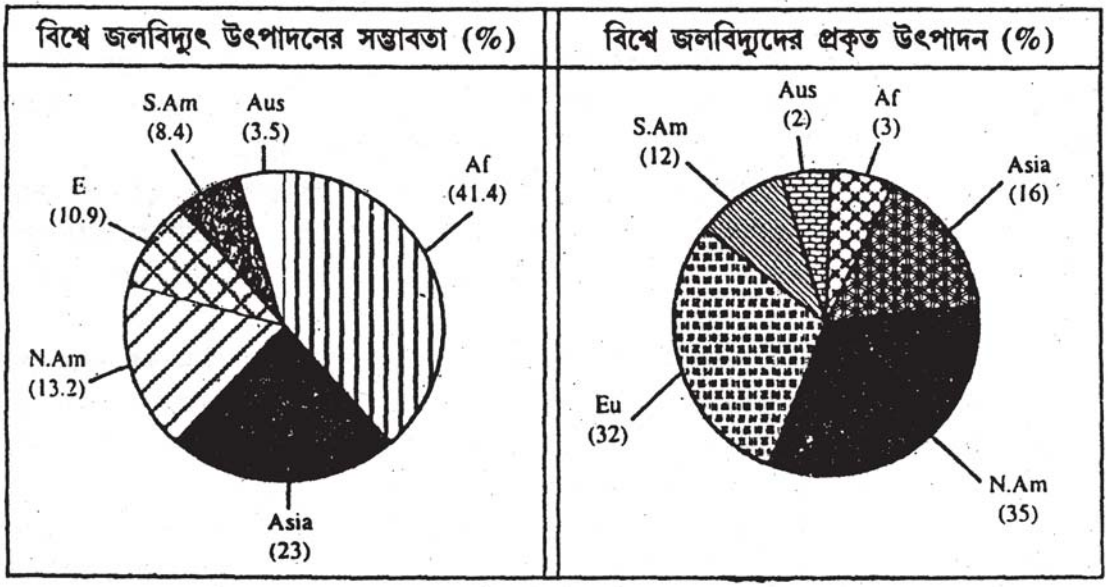

জলবিদ্যুতের উপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মধ্য ও দক্ষিণ সাইবেরিয়ায় কয়েকটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। আঙ্গারা নদীর উপর নির্মিত ব্র্যাটস্ক-এর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। আঙ্গারা নদী বৈকাল হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ইয়েনেসি নদীর উপর ক্রাসনোইয়াস্ক-এ জলবিদ্যুতের কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

❑ **ইউক্রেন :** এই দেশে সবচেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় নিপার নদীর প্রবাহ থেকে। এই নদীর উপর নেপ্রোপ্রেট্রোভস্ক-এ একটি সুবৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ **নরওয়ে :** মোট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী হলেও, মাথাপিছু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে নরওয়ে প্রথম। পশ্চিম উপকূল বরাবর মৃদু-শীতল জলবায়ু, অভ্যন্তরভাগের উচ্চভূমিতে প্রচুর বরফপাত, এই বরফগলা জলে পুষ্ট অসংখ্য ছোটো ছোটো খরস্রোতা নদী, বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, কয়লা ও খনিজ

তেলের অভাব (ইদানীং উত্তর সাগরের গর্ভ থেকে তেল উৎপাদিত হচ্ছে), বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা, পুঁজি ও প্রযুক্তির সহজলভ্যতা এই দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নতির কারণ। সার্পসবর্গ, নোটোড্ডেন, কংসভিনজার, লিলেহ্যামার, কংসবার্জ প্রভৃতি এই দেশের উল্লেখযোগ্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। সস্তা জলবিদ্যুৎ নরওয়ের সর্বপ্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ।

❑ **সুইডেন :** সুইডেন উত্তর ইউরোপে অবস্থিত ও নরওয়ের প্রতিবেশী দেশ। এই দেশটিও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রভূত উন্নতিলাভ করেছে। এদেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের 92 শতাংশই জলবিদ্যুৎ। পার্বত্য ভূপ্রকৃতি, প্রচুর তুষারপাত, বরফগলা জলে পুষ্ট অসংখ্য ছোটো ছোটো নদী, কয়লা ও খনিজ তেলের অভাব, উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য প্রচুর বিদ্যুতের চাহিদা উন্নত প্রযুক্তি ও মূলধনের সরবরাহ এদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নতির কারণ।

সুইদেনের অধিকাংশ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ক্যান্ডিনেভীয় পর্বতমালার দক্ষিণপূর্ব ঢালে অবস্থিত। গোটা নদীর উপর **ট্রলহাট্টান জলপ্রপাত** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। টাপ্পস্লেট, হারসেল, কিলফোরসেন প্রভৃতি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। সুইডেন শিল্পোন্নত দেশ। এদেশের শিল্পোন্নতি জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল।

❑ **ফ্রান্স :** জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ইউরোপের এই দেশটি বিশেষ উন্নতিলাভ করেছে। এই দেশে আল্পস ও পিরেনিজ পর্বতে এবং মধ্যভাগের মালভূমি থেকে উৎপন্ন নদীগুলি থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ব্রিটানি প্রদেশে র‍্যান্স-এর সমুদ্র খাঁড়িতে জোয়ারভাটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে।

❑ **ইটালি :** এই দেশে কয়লা বিশেষ পাওয়া যায় না বলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। এই দেশে মোট বিদ্যুতের অর্ধেক জলস্রোত থেকে উৎপাদিত হয়। পো উপত্যকার চারদিকের পাহাড়গুলির নদী ও জলপ্রপাত থেকে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। অ্যাপেনাইন পর্বতে উৎপন্ন নদীগুলি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

❑ **সুইজারল্যান্ড :** আয়তনে ইউরোপের এই দেশটি খুব ছোটো হলেও (আয়তনে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকেরও কম), শিল্পে অতি উন্নত। অথচ, সুইডেনের মতোই এখানে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় না। ফলে এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পূর্ণভাবে জলবিদ্যুতের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। মোট বিদ্যুতের 95 শতাংশ জলবিদ্যুৎ। আল্পস পর্বতের তুষারগলা জলে পুষ্ট নদী ও প্রস্রবণ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

❑ **জাপান :** জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে এশিয়া মহাদেশে জাপানই শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও রাশিয়ার পরেই। এই শের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। (i) পার্বত্য ভূপ্রকৃতি, (ii) কয়লা ও খনিজ তেলের অভাব, (iii) প্রচুর বৃষ্টিপাত, (iv) বহুসংখ্যক খরস্রোতা নদী, (v) শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জন্য বিদ্যুতের প্রচুর চাহিদা, (vi) প্রয়োজনীয় পুঁজির সরবরাহ এবং (vii) প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি এই দেশে জলবিদ্যুৎ উৎাদনে উন্নতির কারণ।

জাপানের দ্বীপগুলির মধ্যে হোক্কাইডো, হনসু, সিকোকু ও কিউসু, এই চারটি বড়ো, হনসু সবচেয়ে বড়ো দ্বীপ। চারটি দ্বীপেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, সবচেয়ে বেশি হয় হনসু দ্বীপে। এই দ্বীপে টেনরিয়ু নদীর সকুমা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র জাপানের সর্ববৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্র। সকুমা ছাড়া আজুমি, মিবোরা, ওকুতাদামি, তাগোকুরা, ইকিহারা প্রভৃতি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

জাপানের বহু শিল্পকারখানা, বিশেষ করে ছোটো ও কুটির শিল্পগুলি এবং রেলপথে পরিবহনব্যবস্থা জলবিদ্যুতের সাহায্যে চলে।

❑ **চীন :** এ দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নতি ঘটছে। চীনের প্রধান তিনটি নদী, হোয়াং-হো, ইয়াং-সি-কিয়াং ও সিকিয়াং এবং এইসব নদীর অনেকগুলি উপনদীর উপর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এদেশের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে হোয়াং হো নদীর সানমেন গিরিখাতের কাছে।

❑ **ভারত :** স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত উন্নতি ঘটছে। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতেই বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। কর্ণাটক রাজ্যের সরাবতী প্রকল্প ও কালীনদী প্রকল্প, কোরালা রাজ্যের ইদুক্কি প্রকল্প ও সবারিগিরি প্রকল্প, তামিলনাড়ু রাজ্যের কুন্দা প্রকল্প, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও নিম্ন সিলেরু প্রকল্প, মহারাষ্ট্র রাজ্যের কয়না প্রকল্প, গুজরাট রাজ্যের উকাই বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্প, মধ্যপ্রদেশের চম্বল উপত্যকা প্রকল্প, উত্তরপ্রদেশের যমুনা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও রিহান্দ প্রকল্প, উত্তরাঞ্চল রাজ্যে তেহরি জলসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, পাঞ্জাবে ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প ও বিয়াস প্রকল্প, ওড়িশায় হিরাকুঁদ প্রকল্প, ঝাড়খন্ড ও পশ্চিমবঙ্গে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প থেকে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনার পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র এ পর্যন্ত কাজে লাগানো হয়েছে।

❑ **দক্ষিণ আমেরিকা :** দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে ব্রেজিলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল সম্বাবনা আছে এবং ওই দেশেই সবচেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। খনিজ তেল ও কয়লার অভাব থাকায় এদেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় 90 শতাংশই জলবিদ্যুৎ। ব্রেজিল-প্যারাগুয়ে সীমান্তে পারানা নদীর উপর নির্মিত ইতিয়াপু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বিশ্বের বৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির অন্যতম। দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে সাওফ্রানসিসকো নদীর ওপর পলোলালফোনসো অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

চিলি, পেরু, ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়াতেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আছে। ভেনেজুয়েলায় ওরিনিকো নদীর ওপর নির্মিত গুরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র উল্লেখযেগ্য।

❑ **আফ্রিকা :** পৃথিবীর মহাদেশগুলির মধ্যে আফ্রিকাতেই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাকৃতিক সুযোগসুবিধা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও কারিগরি দক্ষতার অভাবের জন্য ওই সুযোগসুবিধার সদ্ব্যবহার হয়নি। এই মহাদেশে এ পর্যন্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনার অতি সামান্য অংশমাত্র কাজে লাগানো হয়েছে।

আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় মিশরে। মিশরে নীলনদের ওপর নির্মিত আসোয়ান বাঁধ থেকে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। আফ্রিকার মধ্য অংশে অবস্থিত জাইরে-এ কয়েকটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। কাটাঙ্গা প্রদেশে তামা ও অন্যান্য খনির কাজ জলবিদ্যুতের সাহায্যে চলে। জাইরে নদীর ইঙ্গা জলপ্রপাত থেকে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে।

কেনিয়া ও উগান্ডায় জলবিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ছে। এই দুইটি দেশ নীলনদের উৎসমুখে আওয়েন জলপ্রপাত থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

জামরিয়া ও জিম্বাবুই-এর সীমান্তে জাম্বেজি নদীর উপর ক্যারিবা বাঁধ থেকে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ক্যারিবা বাঁধ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত হুভার বাঁধের থেকে অনেক বড়ো। জাম্বেজি নদীর ওপর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

সুদানে সোনার বাঁধ এবং ঘানায় ভল্টা নদীর ওপর আকোসোমবো বাঁধ গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট জলবিদ্যুতের তুলনায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে জলবিদ্যুতের উৎপাদন অতি সামান্য। অস্ট্রেলিয়ায় প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ও টাসমেনিয়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় স্নোয়ি নদী প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। কুইন্সল্যান্ডের উত্তর অংশে টুলি জলপ্রপাত এবং টাসবেনিয়ার শ্যানোন অপর দুইটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

পার্বত্য ভূপ্রকৃতি, বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ও অন্যান্য শক্তিসম্পদের অভাবের দরুন নিউজিল্যান্ডে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় বেশি।

3.8.2. সৌরশক্তি (Solar Energy)

যূর্য থেকে যে আলো ও উত্তাপ আমরা পাই তাকেই বলে সৌরশক্তি। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবী সমেত সমগ্র সৌরজগতে সূর্যই সকল শক্তির উৎস। শক্তির বৃহত্তম ও অফুরন্ত ভান্ডার হল সূর্য। প্রতি বছরে পৃথিবীতে যে সূর্যরশ্মি পতিত হয় তাকে শক্তিতে পরিণত করলে 21 কোটি লক্ষ টন কয়লার শক্তির সমান হবে। কিন্তু সৌরশক্তি কে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারের প্রযুক্তি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। যেদিন সেই প্রযুক্তি মানুষের আয়ত্তে আসবে সেদিন পৃথিবীতে শক্তিসম্পদের কোনো সমস্যা আর থাকবে না।

3.8.2.1. সৌরশক্তির ব্যবহার (Uses of Solar energy)

বর্তমানে সৌরশক্তিকে দুভাবে ব্যবহার করা যায়—(ক) সৌরশক্তিকে তাপশক্তিতে পরিণত করে, সেই উত্তাপ বিভিন্ন কাজে লাগানো। (খ) সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করে সেই বিদ্যুৎ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা।

সৌরশক্তি থেকে উৎপাদিত তাপ— (i) জল গরম করা, (ii) ঘর গরম রাখা, (iii) ফসল শুকানো ও সংরক্ষণ করা, (iv) কাঠ শুকনো, (v) সমুদ্রজল লবণমুক্ত করা, (vi) জল পরিস্রুত করা, (vii) বাষ্প উৎপাদন করা, (viii) শীতাতপনিয়ন্ত্রণ করা (Refrigeration), (ix) রান্না করা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা যায়। ভারতে বর্তমানে (31.03,2001) রান্নার কাজে 5 লক্ষ 8 হাজার সোলার কুকার ব্যবহার করা হচ্ছে।

সৌরকোশের সাহায্যে সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিকে পরিণত করা হয়। সৌরকোশ তৈরির জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার হয় সিলিকন। সৌরকোশের সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ঘরে ও রাস্তায় আলো জ্বালানোর কাজে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় (রেডিয়ো, টেলিফোন), পাম্প চালানোর কাজে এবং গৃহস্থলির নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজে সৌরকোশ অত্যন্ত উপযোগী। পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপের এইভাবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছে। সৌরকোশের সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুতের মতো বৃহদাকারে যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমনি অতি ক্ষুদ্রাকারেও ব্যবহার করা যায়। যেমন— সৌরলণ্ঠন। ভারতে এরকম 3,50,000 সৌরলণ্ঠন ব্যবহার করা হচ্ছে। সৌরশক্তি ব্যবহারে ভারত পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। ইজরায়েল, জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সৌরশক্তি ব্যবহারে উন্নতি করেছে। এই ব্যাপারে ইজরায়েলের উন্নতি উল্লেখযোগ্য।

3.8.2.2. সৌরশক্তির বণ্টন (Distribution of Solar energy)

পৃথিবীতে সূর্যরশ্মি সর্বত্র সমানভাবে পতিত হয় না, কোথাও সূর্যরশ্মির তীব্রতা বেশি, কোথাও কম। কোথাও বছরে বেশিদিন সূর্যরশ্মি পাওয়া যায়, কোথাও অপেক্ষাকৃত কম দিন। একই অঞ্চলে ভূমিরূপ, জলভাগ ও স্থলভাগের অবস্থান, অরণ্যের বিস্তৃতি, মরুভূমির বিস্তার প্রভৃতি কতটা সূর্যরশ্মি পাওয়া যাবে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় ও নিরক্ষীয় অঞ্চলে বেশি সূর্যরশ্মি পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় উষ্ণমণ্ডলের মরুভূমিগুলিতে। যেমন— আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি, এশিয়ার আরবদেশের মরুভূমি ও ভারত-পাকিস্তানের থর মরুভূমি, অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম অংশের মরুভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি।

সবচেয়ে কম সূর্যরশ্মি পাওয়া যায় হিমমণ্ডলে। যেমন—রাশিয়ার উত্তর অংশে, কানাডার উত্তর অংশে ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার উত্তর অংশে। হিমমণ্ডলের বাইরে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেও সূর্যরশ্মি কম পাওয়া যায়। ভারত সৌরশক্তি তে সমৃদ্ধ।

আশা করা যায়, একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে বিশ্বের মোট শক্তির চাহিদার 30 শতাংশ পর্যন্ত সৌরশক্তির সাহায্যে পূরণ করা যাবে।

3.8.3. বায়ু শক্তি (Wind Energy)

বায়ুপ্রবাহ থেকে যে শক্তি উদ্ভূত হয় তাকে বায়ুশক্তি বলে। বায়ুপ্রবাহের গতিশক্তিকে হাওয়া কালের (Wind mill) মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। দুইভাবে এই শক্তিকে ব্যবহার করা হয়— (i) প্রত্যক্ষভাবে— হাওয়া কলের মাধ্যমে বায়ুশক্তির সাহায্যে কুয়ো থেকে জল তোলা, গম ভাঙা, আখ মাড়াই করা প্রভৃতি কাজ বহুদিন ধরে চলে আসছে। নেদারল্যান্ডস-এ এইভাবে পোল্ডারভূমি অঞ্চলে নীচু জমি থেকে জল বের করে দেওয়া হত। (ii) বায়ুপ্রবাহের গতিশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে সেই বিদ্যুৎ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

বায়ুশক্তি প্রবহমান এবং শক্তির অক্ষয় উৎস। কখনও ফুরিয়ে যাবে না। এই শক্তি ব্যবহারে পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, দূষণ হয় না। কয়লা ও খনিজ তেলের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে যে খরচ পড়ে বায়ুশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উপাদনে তার থেকে কম খরচে পড়ে।

বায়ু পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। যেসব জায়গায় বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ বেশি, সেখানেই এই প্রবাহকে শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো যায়। এই কারণে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় বায়ুশক্তিনির্ভর বড়ো বড়ো বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সুবিধা বেশি।

3.6.3.1. উৎপাদন অঞ্চল (Producing areas)

বর্তমানে পৃথিবীর নানা জায়গায় 25 হাজারের বেশি বায়ুশক্তিচালিত টারবাইনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এই বিদ্যুৎ কলকারখানায়, শহর ও নগরে আলো জ্বালানোর কাজে এবং ঘর-গৃহস্থলির কাজে ব্যবহার করা হয়। বায়ুশক্তি ব্যবহারে বিশ্ব জার্মানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক ও স্পেন সবচেয়ে উন্নতি করেছে। ভারতের স্থান পঞ্চম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বায়ুশক্তির সাহায্যে 3 হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ভারতে 45 হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বায়ুশক্তি থেকে উৎপাদনর সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন (2004 খ্রিস্টাব্দের 31 মার্চ) 2483 মেগাওয়াট। এদেশে অন্তত 208টি এলাকায় বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা আছে। গুজরাট ও তামিলনাড়ু বায়ুশক্তি ব্যবহারে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলেও হাওয়া কল আছে। এদেশে 2005 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বায়ুশক্তি থেকে 4 হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও চীনও বায়ুশক্তি ব্যবহারে উন্নতি করেছে।

3.8.4. জোয়ারভাটার শক্তি (Tidal Energy)

ভূপৃষ্ঠের 71 শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে সাগর-মহাসাগরের জলরাশি। স্বভাবতই এই বিস্তীর্ণ জলরাশি পৃথিবীর বুকে যে সৌরশক্তি নেমে আসে তার বৃহদংশই শোষণ করে নেয়। ফলে সাগর-মহাসাগরের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি শক্তি সুপ্ত হয়ে রয়েছে। সমুদ্রজলে তাপমাত্রার তারতম্য এবং সমুদ্রের স্রোত, ঢেউ ও জোয়ারভাটার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠে সাগর-মহাসাগরের জল নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক জায়গায় ফুলে ওঠে ও অন্য জায়গায় নেমে যায়। জলের এই ফুলে ওঠাকে বলে জোয়ার ও নেমে যাওয়াকে বলে ভাটা।

3.8.4.1. জোয়ারভাটা থেকে শক্তি আহরণের পদ্ধতি (Process of generation of tidal Energy)

জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ফুলে উঠে প্রবলবেগে মোহানা দিয়ে নদীর মধ্যে ও খাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করে এবং ভাটার সময় ওই জল নেমে যায়। মোহনার কাছে নদীতে এবং সমুদ্র খাঁড়িতে বাঁধ নির্মাণ করে জোয়ারের জল ধরে রেখে, ভাটার সময় নির্দিষ্ট পথে ওই জল ছেড়ে তার সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। স্বভাবতই, যেসব জায়গায় জোয়ার ভাটায় জল বেশি ওঠানামা করে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা বেশি।

জোয়ার ভাটা সংঘটিত হয় চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাবে। তাই, জোয়ার ভাটা থেকে উৎপাদিত শক্তি প্রবহমান ও অক্ষয়, কখনও ফুরিয়ে যাবে না। তাছাড়া, জলবিদ্যুৎ, সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির মতোই জোয়ারভাটা থেকে শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহারে পরিবেশ মলিন হয় না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৌনপুনিক কাঁচামালের দরকার হয় না। সেই কারণে উৎপাদন খরচ সামান্য। তাই এই শক্তি খুবই সস্তা।

3.8.4.2. উৎপাদক অঞ্চল (Producing areas)

(i) ফ্রান্সে লা-রান্স ও আবের বেনোত। (লা-রান্স খাঁড়িতে 240 মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।) (ii) ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে সেভার্ন নদীর মোহানা। (iii) আর্জেন্টিনায় সানজোস, (iv) কানাডার পূর্ব উপকূলে ফান্ডি উপসাগরের তীরে আমহার্স্ট পয়েন্ট, কোবসকুক ও প্যাসামাকুয়োডি।

ভারতে জোয়ারভাটার শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা সবে শুরু হয়েছে। এদেশে পশ্চিম উপকূলে, বিশেষ করে গুজরাট উপকূলে এবং সুন্দরবনের সমুদ্র খাঁড়িগুলিতে জোয়ারভাটার শক্তি থেকে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। সুন্দরবনে দুর্গাদুয়ানি খাঁড়িতে জোয়ারভাটার শক্তি থেকে 3 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

অধিকাংশক্ষেত্রে পৌনপুনিক কাঁচামালের দরকার হয় না। সেই কারণে উৎপাদন খরচ সামান্য। তাই এই শক্তি খুবই সস্তা।

এদের ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হয় না বা হলেও তার পরিমাণ নগন্য। তাই এদেরকে পরিবেশ বন্ধু বলে।

3.8.5. ভূ-তাপ শক্তি (Geothermal Energy)

ভূ-অভ্যন্তরে গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। ভূ-অভ্যন্তরের এই তাপ আগ্নেয়গিরি, উষ্ণপ্রস্রবণ কিংবা গিসারের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। এই তাপকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে ভূতাপ শক্তি বলে। শক্তির এই উৎস প্রবাহমান শক্তি এবং এর ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের ভয় থাকে না। পৃথিবীতে এই শক্তির সম্ভাবনা কম নয়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে ভূ-অভ্যন্তরের 10 Km গভীরতা পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট ভূ-তাপশক্তির পরিমাণ প্রায় 12 হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টা।

● **উৎপাদক অঞ্চল :** পৃথিবীর প্রথম ভূ-তাপ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় 1904 খ্রিস্টাব্দে ইতালির তাসকানি জেলায় লারডেয়ারলো অঞ্চলে। এর পর ধীরে ধীরে 1958তে নিউজিল্যান্ডের ওয়াইরাকাইতে, 1960 এতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার গির্জান অঞ্চলে। 1973-এ তে মেক্সিকোর সেরোপ্রিয়াটো অঞ্চলে ভূ-তাপকেন্দ্র গড়ে উঠে।

বর্তমানে ইতালি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড, মেক্সিকো, জাপান, রাশিয়া, চিলি, আইসল্যান্ড, ইত্যাদি প্রধান ভূ-তাপশক্তি উপাদানকারী দেশ। এর মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম (900 কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা), ইতালি দ্বিতীয় (300 কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা) ও জাপান তৃতীয় (133 কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা) স্থান অধিকার করে।

ভারতের কয়েকটি স্থানে এই শক্তির সম্ভাবনা প্রবল। এই অঞ্চলগুলি হল উত্তর-পশ্চিম হিমালয়, মহারাষ্ট্র ও গুজরাত উপকূল, নর্মদা-শোন উপত্যকা অঞ্চল, দামোদার উপত্যকা অঞ্চল ইত্যাদি। বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের মনিকরণ থেকে কিছু ভূতাপশক্তি পাওয়া যায়। তাছাড়া ছত্রিশগড়োর তাতাপানি, কাশ্মীরের পুগা ও পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর এই শক্তিউৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

3.8.6. জৈব গ্যাস (Bio gas)

মানুষ ও বিভিন্ন গবাদি পশুর বিষ্ঠা এবং মানুষের ব্যবহৃত বিভিন্ন জৈব আবর্জনা থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় যে গ্যাস উৎপাদন করা হয় তাকে জৈব গ্যাস (Bio gas) বলে। জৈব গ্যাস রান্নার জ্বালানিরূপে, আলো জ্বালানোর কাজে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অন্যান্য জৈব বর্জ্য ছাড়া কেবল গোবর থেকে সারা পৃথিবীব্যাপী প্রচুর জৈব গ্যাস উৎপাদন করা হয়। যে সমস্ত দেশে গবাদি পশুর সংখ্যা প্রচুর সেখানে এই শক্তি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। এই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে ভারতীয় কৃষি গবেষণামন্ত্রক (Indian Agriculture Research Institute) ভারতে গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট আবিস্কার করেছে। 2004 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত ভারতে এজাতীয় প্ল্যান্ট রয়েছে প্রায় 36.5 লক্ষ এবং সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় 120 লক্ষ প্ল্যান্ট।

3.8.7. ভারতে বিভিন্ন পূনর্নবীকরণ শক্তির ব্যবহার

শক্তি আহরণের প্রচলিত উৎসগুলি যেমন কয়লা, খনিজতেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে এগুলি দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছে। ফলে ভারত সরকার পুনর্নবিকরণযোগ্য বিভিন্ন শক্তির উৎসগুলির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন। সেই কারণে ভারতে অপ্রচলিত শক্তি উন্নয়নের জন্য 1982 সালে গঠন করা হয় Department of Non conventinal Energy Sources (DNES)। তারপর 1987-তে গঠন করা হয় Indian Renewable Energy Development Association (IREDA)। 1992 সালে এই দুই সংস্থাকে অচিরাচরিত শক্তি মন্ত্রালয়ে উন্নীত করা হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের অচিরাচরিত শক্তির উৎসগুলি থেকে মোট সম্ভাব্য বিদ্যুতের পরিমাণ প্রায় 1 লক্ষ 95 হাজার মেগাওয়াট যার 31 ভাগ সৌরশক্তি, 30 ভাগ সমুদ্রশক্তি, 15 ভাগ ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ শক্তি, 13 ভাগ বায়ুশক্তি ও জৈবশক্তি সহ অন্যান্য উৎস প্রায় 11 ভাগ।

সারণী 3.3 : ভারতের পুনর্নবিকরণ শক্তির সম্ভাবনা ও উৎপাদন (31 মার্চ, 2004)

উৎস	সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা	উৎপাদন
1. সৌর বিদ্যুৎ	—	2.54 MW
2. বায়ু শক্তি	45000 MW	2483 MW
3. ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (25 MW এর কম)	15000 MW	1601.62 MW
4. জীবস্তর বিদ্যুৎ (Biomass gasifier)	—	60.20 MW
5. আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ	2700 MW	41.43 MW
6. জৈব গ্যাস বিদ্যুৎ	120 লক্ষ প্ল্যান্ট	36.5 লক্ষ প্ল্যান্ট
7. সৌর বিদ্যুৎ (SPV)	20 MW/ বর্গ মিমি	—
(i) রাস্তার আলো	—	52102 টি
(ii) বাড়ীতে সৌর বিদ্যুৎ	—	307763 টি
(iii) SPV প্ল্যান্ট	—	850.1 KW

উৎস : India 2005, Pages : 243–244

3.9. ○ অরণ্যায়ন (Afforestation)

অরণ্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। অরণ্য ভূমিক্ষয় নিবারণ করে। পরিবেশে O_2-এর নির্গমণ এবং পরিবেশ থেকে CO_2 টেনে নিয়ে বস্তুতন্ত্রের সাম্যতা রক্ষা করে। কাঠ ও অন্যান্য উপজাত সামগ্রী সরবরাহ করে মানুষের চাহিদা পূরণ করে। অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয় না। কোথাও কোথাও অবশ্য নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। উপযুক্ত ভাবে অরণ্য ব্যবহার না করলে এই সম্পদ থেকে মানুষ কেবল বঞ্চিত হবে তাই নয়, সেই সঙ্গে বন্যা, খরা, ভূমিক্ষয়, পরিবেশদূষণ প্রভৃতি ভয়াবহ বিপদ সম্মুখে এসে পড়বে।

সুতরাং অরণ্যের সংকোচন ও ধ্বংস রোধ করে অরণ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীদের মতে কোনো দেশের মোট আয়তনের অন্তত $^1/_3$ অংশ অরণ্য দ্বারা আচ্ছাদিত থাকা দরকার।

3.9.1. অরণ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমূহ (Measures for Conservation of Forest)

- [1] **গাছ কাটার সঙ্গে তাল রেখে গাছ লাগানো :** বন থেকে গাছ কাটার সঙ্গে তাল রেখে নতুন গাছ লাগাতে হবে। যেমন—জার্মানিতে আইন আছে, একটি গাছ কাটলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটি গাছ

লাগাতে হবে। যে প্রজাতির গাছ কাটা হচ্ছে, সেই প্রজাতির গাছই যে লাগাতে হবে এমন কথা নেই। অপেক্ষাকৃত বেশি কাজে লাগে এমন গাছ লাগানো যেতে পারে।

- [2] **নতুন বনভূমি রচনা :** নিঃশেষিত বনে ও পতিত জমিতে গাছ লাগিয়ে নতুন অরণ্য সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া, রাস্তা, নদী, খাল, রেললাইন প্রভৃতির দু'ধারে এবং চাষের জমির চারপাশে গাছ লাগাতে হবে।

- [3] **অপরিণত বৃক্ষচ্ছেদন নিয়ন্ত্রণ :** কেবলমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত গাছই কাটতে হবে। দুর্বল ও রোগাক্রান্ত গাছও কেটে ফেলেতে হবে। অবশ্য, বন থেকে এইরকম বাছাই করে গাছ কাটা অনেক সময় লাভজনক হয় না। এর পরিবর্তে বন থেকে সব গাছ একসঙ্গে কেটে ফেলে, সেই জায়গায় একসঙ্গে নতুন গাছ লাগানো অনেক বেশি সুবিধাজনক। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশ, সুইডেন, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি জায়গায় উপরোক্ত দুই পদ্ধতির মাঝামাঝি তৃতীয় এক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি বনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রতি বছর এক এক ভাগে গাছ কাটা হয় ও নতুন গাছ লাগানো হয়।

- [4] **আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার :** আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এমনভাবে বন থেকে গাছ কাটতে হবে যাতে আশপাশের গাছের ক্ষতি না হয়।

- [5] **দাবানল নিয়ন্ত্রণ :** দাবানলের আক্রমণ বন্ধ করার জন্য বন থেকে শুকনো ডালপালা ও গাছ নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। বনে আগুন লাগলে যাতে শীঘ্র জানা যায় তার জন্য বনভূমির মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ মঞ্চ নির্মাণ করা প্রয়োজন। বিমান থেকে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও খুব ফলপ্রসূ। এ ব্যাপারে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। আগুন লাগলে যাতে তাড়াতাড়ি সেটা নিভিয়ে ফেলা যায় তার জন্যে আগে থেকেই কার্যকরী ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- [6] **রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ :** গাছে রোগের সংক্রমণ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন এবং কীটনাশক ও রোগ প্রতিরোধক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করে রোগ বহনকারী ও বৃক্ষ ধ্বংসকারী পোকামাকড় খেয়ে ফেলে বা নষ্ট করে এমন প্রাণীও ব্যবহার করা যেতে পারে।

- [7] **পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ :** পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত চারণভূমির ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভারতের মতো জনবহুল দেশগুলিতে উপযুক্ত চারণভূমির অভাব আছে। চারণভূমির বিকল্প হিসাবে নানাবিধ শস্য, ডাল-কলাই ও শাকসবজির বর্জ্য পদার্থ [কুড়া, ভূষি, খোসা, খড়-বিচালি প্রভৃতি] একটুও অপচয় না করে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে হবে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে কারখানায় প্রস্তুত পশুখাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে জোয়ার ও বাজরার মতো নিকৃষ্ট শ্রেণির শস্যের উৎপাদন বাড়িয়ে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- [8] **অপচয় নিবারণ :** অরণ্যজাত দ্রব্য ব্যবহারে অপচয় নিবারণ করতে হবে। কাঠের ছাঁট, করাতের গুঁড়া [Saw-dust] প্রভৃতি উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে।

- [9] **উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা :** অরণ্য অঞ্চলে যাতায়াতের ভালো ব্যবস্থা করে কারখানা, শহর ও বন্দরের সঙ্গে যোগসাধন করতে হবে।

- [10] **সুলভ বিকল্পের উদ্ভাবন :** কাঠ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় জ্বালানি হিসাবে। সস্তা বিকল্প জ্বালানির উদ্ভাবন করতে হবে। কাঠের গুঁড়া, কয়লার গুঁড়া ও মাটি মিশিয়ে ব্রিকেট তৈরি করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পল্লি অঞ্চলে এর ব্যবহারের প্রসার দরকার এবং আরও নতুন নতুন বিকল্পের উদ্ভাবন করতে হবে। জানলা-দরাজার ফ্রেম, আসবাবপত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রেও কাঠের পরিবর্তে স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেম, পলিথিনের চেয়ার টেবিল প্রভৃতির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- [11] **বনরক্ষক নিয়োগ :** চুরি করে কাঠ কাটা বন্ধ করা এবং দাবানল, রোগব্যাধি, পোকামাকড়ের আক্রমণ ও বেআইনি পশুচারণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বনরক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
- [12] **সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি :** ভারতের মতো জনবহুল দেশগুলিতে জমির ওপর চাপ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় আইনের দ্বারা সুরক্ষিত সংরক্ষিত বন ও জাতীয় উদ্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি না করলে বনভূমির সংকোচন প্রতিরোধ করা কঠিন।
- [13] **গণচেতনা বৃদ্ধি :** অরণ্য যে মানুষের অন্যতম মৌলিক সম্পদ, বিচার বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করলে একখন্ড বনভূমি থেকে যে চিরকাল প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যেতে পারে অথচ পৃথিবী থেকে বনভূমি লুপ্ত হলে যে মানুষের অস্তিত্বও লুপ্ত হয়ে যেতে পারে এ সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করার জন্য অবিরাম প্রচার চালানো দরকার। এ ব্যাপারে বনমহোৎসব পালনের মতো কিছু কিছু কাজ আমাদের দেশে হচ্ছে।
- [14] **যুগ্ম অরণ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা :** অরণ্য সংরক্ষণ এবং অরণ্যের সঠিক ব্যবহারের জন অরণ্য সংলগ্ন মানুষজনদের সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে যুগ্ম অরণ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রচলন বিভিন্ন দেশে শুরু হয়েছে। অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেবল সরকারি প্রশাশনিক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। যারা অরণ্যকে ব্যবহার করেন তাদের হাতেই সংরক্ষণের ক্ষমতা দিলে কাজ ভালো হয়। ইতিমধ্যে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে এই ব্যবস্থা যথেষ্ট সুফলও পাওয়া গেছে।

3.9.2. অরণ্য সংরক্ষণের সমস্যা (Problems of Forest Conservation)

● অরণ্য সংরক্ষণের সমস্যা (Problems of Forest Conservation)

অরণ্য সংরক্ষণ অবশ্য প্রয়োজনীয় হলেও, এক্ষেত্রে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

- [1] পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য চাষের জমির আয়তনও বেড়ে চলেছে। চাষের জমির আয়তন যত বাড়ছে বনভূমির আয়তন তত সংকুচিত হচ্ছে। হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করে কৃষিভূমির আয়তন বৃদ্ধি না করেও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।
- [2] শিল্পের বিকাশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলছে। নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন, শহর, নগর, বন্দর রাস্তা, রেললাইন প্রভৃতি নির্মাণের ফলে বনভূমির আয়তন কমে যাচ্ছে। এই নগরায়ণের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য। আজকাল, অবশ্য প্রতিটি কারখানা ও কারখানা-শহর স্থাপন করে তার চারপাশে অরণ্যবলয় রচনা করার কথা বলা হচ্ছে।

- [3] অরণ্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন নতুন অরণ্যভূমি সৃষ্টি করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বর্তমানে অরণ্য সবচেয়ে বেশি ধ্বংস হচ্ছে অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে। এইসব দেশের পক্ষে অরণ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা কঠিন। ফলে সংরক্ষণের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন।
- [4] আগেই বলা হয়েছে অরণ্য সংরক্ষণ করতে হলে এবং নিয়মিতভাবে অরণ্যজাত দ্রব্য পেতে হলে, অরণ্যে যে হারে গাছ কাটা হবে অন্তত সেই হারে নতুন গাছ লাগাতে হবে। কিন্তু একটি গাছের চারা লাগানোর পর সেটি ব্যবহারের উপযোগী হতে অনেক দিন লাগে। অধিকাংশ সরলবর্গীয় অরণ্যে একটি গাছের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য 50 থেকে 70 বছর পর্যন্ত সময় লাগে এবং ততদিন পর্যন্ত উপযুক্ত ভাবে ওই গাছের তদ্বির-তদারক করতে হয়। স্বভাবতই ব্যক্তিগত মালিকানায় মুনাফা অর্জনের জন্য যেখানে বনভূমি পরিচালিত হয় সেখানে 50 বা 70 বছরের মেয়াদে টাকা খাটাতে কেউ এগিয়ে আসবে না।
- [5] বন থেকে একসঙ্গে বহু জিনিস উৎপাদন করা হয়। ফলে বহু জিনিসের বাজার দরের সঙ্গে বনজ দ্রব্যের উৎপাদনের সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। এই রকম আরও অনেক অসুবিধা আছে। এইসব কারণে অরণ্যের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বার্থসাধক জাতীয় সম্পদ ব্যক্তিগত মালিকানায় ও পরিচালনায় থাকা উচিত কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।
- [6] সবশেষে, দেশে দেশে অরণ্য সংরক্ষণের সমস্যা ও তার সমাধানে পার্থক্য থাকলেও, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এই সমস্যাকে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে দেখতে হবে এবং এর সমাধানেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

3.9.3. সামাজিক বনসৃজন (Social Forestry)

অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণে নির্দিষ্ট বনভূমির বাইরে অব্যবহৃত জমিতে গাছ লাগানো ও ছোটো ছোটো বনভূমি রচনা করা হলে তাকে সামাজিক বনসৃজন বলে।

❑ **উদ্দেশ্য :** সামাজিক বনসৃজনের মূল উদ্দেশ্য সমাজের সার্বিক কল্যাণ। এর ফলে অব্যবহৃত, পতিত ও পরিত্যক্ত জমিকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি কাঠ, নির্মাণ কাজে ব্যবহার্য কাঠ, ফলমূল, অন্যান্য বনজদ্রব্য ও পশুখাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নতি ঘটে ও আর্থ-সামাজিক প্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

❑ **সামাজিক বনসৃজনের উপযোগী ভূমি :** [1] নদী, খাল, পুকুর, দিঘি ও জলাভূমির পাড়; [2] রেললাইন ও রাজপথের দুইধারের জমি; [3] বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, অফিস-কাছারি, ধর্মস্থান, সমাধিস্থল প্রভৃতির সংলগ্ন ফাঁকা জায়গা; [4] বসতবাড়ির আশপাশের ফাঁকা জায়গা; [5] পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের ফাঁকা জায়গা; [6] শহর, নগর, বন্দর ও শিল্প কারখানার ফাঁকা জায়গা; [7] কৃষিজমির চারিধারের সীমানা নির্ধারক আল; [8] খনি এলাকা; [9] যে কোনো পতিত জমি; [10] যেখানে আগে বন ছিল, কিন্তু এখন নেই, এমন জায়গা।

❑ **সামাজিক বনসৃজনের উপযোগী গাছ :** নানারকম মাটি ও নানা আয়তনের জমিতে গাছ লাগানো হয়। সেই কারণে যে গাছ যেখানকার উপযোগী, সেখানে সেই গাছ লাগাতে হয়। শুধু দেখতে হবে, গাছের কোনো না

কোনো রকমের অর্থনৈতিক উপযোগিতা যেন থাকে। সাধারণত ইউক্যালিপটাস, অর্জুন, শিরীষ, নিম, কৃষ্ণচূড়া, আম, কাঁঠাল, জাম, বাবলা, বকুল, কুসুম, আমলকি, দেবদারু, বাঁশ প্রভৃতি গাছ লাগানো যেতে পারে।

❐ **সুবিধা :** সামাজিক বনসৃজনের মাধ্যমে [1] পতিত, পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত জমিকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যায়; [2] জ্বালানি কাঠ, নির্মাণ কার্যে ব্যবহার্য কাঠ, ফলমূল ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের উপাদান বৃদ্ধি পায়; [3] মৃত্তিকা সংরক্ষণে সাহায্য হয়; [4] ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়; [5] বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃষ্টিপাতে সাহায্য হয়; [6] দূষণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য হয়; [7] পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে; [8] বেকার ও আধা বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে; [9] স্থানীয় এলাকার মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়; এবং [10] সরাসরি মানুষের সঙ্গে গাছপালার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। গাছপালা ছাড়া যে আমরা সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারি না, এই বোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়।

❐ **অসুবিধা :** [1] সামাজিক বনসৃজনে গাছপালা লাগানো হয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ফলে তদারকির কাজ অবহেলিত হয়। [2] ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হয় না বলে গোরু ছাগলের মতো তৃণভোজী জীবজন্তু ছোটো ও চারাগাছ মুড়িয়ে. খেয়ে ফেলে। [3] গাছের পূর্ণতাপ্রাপ্তির জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়। তার পর সেই গাছ অর্থনৈতিক কাজে লাগানো যায়। সেই কারণে, অনেক সময় মানুষের উৎসাহ হ্রাস পায়। [4] মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করে সঠিক প্রজাতির গাছ রোপণ করতে হয়। তা না হলে গাছ ঠিকমতো বাড়ে না। আবার অম্ল অথবা ক্ষারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে মাটির উৎপাদিকা শক্তিও নষ্ট হয়। [5] ইউক্যালিপটাসের মতো কোনো কোনো প্রজাতির গাছ এত জলশোষণ করে যে ধীরে ধীরে মাটি শুকিয়ে যেতে থাকে। [6] সামাজিক বনসৃজনের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতার ওপর।

❐ ভারতের সামাজিক বনসৃজন (Social Forestry) ❐

ভারতের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সামাজিক বনসৃজনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ওই কাজে পঞ্চায়েত, পুরসভা, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংগঠনগুলিকে যুক্ত করা হচ্ছে। সরকারের বনবিভাগ থেকে নিয়মিতভাবে বিনামূল্যে বীজ ও চারাগাছ দেওয়া হচ্ছে। গণচেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র, রেডিয়ো ও টেলিভিশনের মাধ্যমে মনোগ্রাহী প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। এর ফলে, সামাজিক বনসৃজনে ব্যাপারে আমাদের দেশে কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে। রেলপথ, রাজপথ, নদী ও খালের দুধারে গাছ লাগানো হচ্ছে। খনি এলাকায় ও সমুদ্রতীরেও উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগানো হচ্ছে।

ভারতের সামাজিক বনসৃজনের সূচনা হয় 1976 খ্রিস্টাব্দে **NCA (National Commisson of Agriculture)**-এর মাধ্যমে। ভারতে প্রায় 4 কোটি হেক্টর জমিতে সামাজিক বনসৃজনের অবকাশ রয়েছে। গুজরাতের আনন্দ নিকেতন আশ্রম, উত্তর প্রদেশের চিপকো খ্যাত সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে কশোলি গ্রাম স্বরাজ সেবা সংঘ, মেধা পাটেকরর নেতৃত্বে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন প্রভৃতি বেসরকারি (NGO) প্রতিষ্ঠান ভারতে সামাজিক বনসৃজনের জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

3.9.4. কৃষি-বনসৃজন (Agro Forestry)

❐ **কৃষি বনসৃজন কাকে বলে :** ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক যখন তার কৃষিজমিতে, বসতবাড়ির চারধারে ও পতিত জমিতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গাছপালা লাগায়, তাকে কৃষি-বনসৃজন বলে। এক কথায়, ফসল

চাষের সঙ্গে সঙ্গে গাছপালারও চাষ করা। একসঙ্গে ফসল উৎপাদন ও পশুপালন করলে তাকে মিশ্রকৃষি বলে। মিশ্রকৃষি অর্থনীতিতে ফসল উৎপাদন ও পশুপালন পরস্পরের পরিপূরক। কৃষি-বনসৃজনও অনেকটা মিশ্র কৃষির মতো। এখানে ফসল উৎপাদন ও বনজ সামগ্রী উৎপাদন পরস্পরের পরিপূরক।

❐ **উদ্দেশ্য ঃ** কৃষি-বনসৃজন একসঙ্গে বহু উদ্দেশ্যসাধক। যেমন— [1] কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা; [2] অরণ্যের আয়তন বৃদ্ধি করা; [3] বনজ দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে বাজারে ওইসব দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা; [4] পরিবেশদূষণ রোধ করা এবং [5] পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা।

❐ **কৃষি-বনসৃজনের উপযোগী জায়গা ঃ** কৃষি-বনসৃজনের জন্য বিস্তীর্ণ ভূমির দরকার হয় না। সাধারণত [1] কৃষিজমির চারধারে আল বা সীমানায়, [2] পুকুর, দিঘি ও ঝিলের চারধারে, [3] বসতবাড়ির চারধারে ও [4] পতিত জমিতে গাছ লাগিয়ে কৃষি-বনসৃজন করা হয়।

❐ **কৃষি-বনসৃজনের উপযোগী গাছ ঃ** কৃষি-বনসৃজনের তিন রকমের গাছ ব্যবহার করা হয়— [1] যেসব গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়। যেমন— আম,. জাম, নারকেল সুপারি, তাল, পেয়ারা, কাঁঠাল, লিচু, বাতাবি লেবু, কলা প্রভৃতি, [2] যেসব গাছ থেকে কাঠ পাওয়া যায়। যেমন— শাল, সেগুন, শিরীষ, বাবলা, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি, ও [3] যেসব গাছের ভেষজ গুণ আছে। যেমন— নিম, আমলকি, হরিতকি, বয়ড়া, অর্জুন প্রভৃতি। কোথায় কোন্ গাছ লাগানো হবে তা নির্ভর করে জমির অবস্থান ও আয়তনের ওপর। বসতবাড়ির চারপাশে সাধারণত আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, কাঁঠালের মতো ডালপালা বিস্তার করে এমন ফলের গাছ লাগানো হয়। কিছু জমর আলে নারকেল, সুপারি, তাল জাতীয় গাছ লাগানো হয় যেগুলি জমির ওপর বেশি ছায়া ফেলবে না।

❐ **সুবিধা ঃ** কৃষি-বনসৃজনে একসঙ্গে বহু সুবিধা লাভ করা যায়। যেমন— [1] ফসল উৎপাদন ছাড়া কৃষকের একটা অতিরিক্ত ও বিকল্প উপার্জনের ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে প্রান্তিক চাষিরা, যাদের কৃষি-উৎপাদন ভালোভাবে বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তারা যেমন উপকৃত হবে, তেমনি বড়ো ও মাঝারি চাষিরাও, কোনো কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে, কিংবা বাজারে ফসলের দাম কমে গেলে, বনজ দ্রব্য বিক্রি করে ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিতে পারবে। [2] এই ব্যবস্থায় জমির সর্বাধিক ব্যবহার হয়। কোনো জমিই অব্যবহৃত থাকে না। পতিত জমিকেও লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যায়। [3] বাজারে জ্বালানি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য কাঠের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। [4] বিভিন্ন প্রকার ফলের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। [5] ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিজ্জদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে। [6] ভূমিক্ষয় নিবারণে সাহায্য হয়। [7] মাটিতে জৈবসারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। [8] বায়ুদূষণ হ্রাস পায় এবং [9] পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

❐ **অসুবিধা ঃ** কৃষি-বনসৃজনের কিছু অসুবিধাও আছে। যেমন [1] গাছের নির্বাচন সঠিক না হলে ক্ষতি হতে পারে। চাষের জমির চারধারে আম কিংবা লিচুর মতো ডালপালা বিস্তারকারী গাছ লাগালে জমির কিছু অংশ ছায়াতে ঢাকা পড়বে এবং এর ফলে ফসলের উৎপাদন কমে যাবে। [2] এই ব্যবস্থায় সুফল পেতে কৃষকদের অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। [3] উন্নত প্রজাতির গাছ না লাগালে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। [4] কোনো কোনো গাছের পাতা মাটিতে পড়ে মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস করে। [5] ইউক্যালিপটাসের মতো গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় ঠিকই, কিন্তু মাটি থেকে অতিমাত্রায় জল শোষণ করে শুষ্কতা বৃদ্ধি করে।

❑ ভারতে কৃষি-বনসৃজন (Agro-Forestry in India) ❑

ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় অরণ্য নীতির অঙ্গ হিসাবে কৃষি-বনসৃজন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। কাঠ ও অন্যান্য বনজ সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের আওতায় কোথাও কোথাও একই সঙ্গে বনসৃজন ও পশুপালন হচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও কৃষিকাজ, পশুপালন ও বনসৃজন একসঙ্গে করার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারত আয়তনে বিশাল। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভৌগোলিক পরিবেশে বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষকদের নানা ধরনের গাছপালা লাগানোয় উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। বর্ষাকালে বিনামূল্যে নানা ধরনের চারাগাছ বিতরণ করা হয়। সাধারণত সেগুন, মুহুয়া, খয়ের, পপলার, বাবলা, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অংশে ব্যাংক ও নানা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় কৃষি-বনসৃজনের কাজ চলছে। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে। আশা করা যায়, কৃষি-বনসৃজনে বর্তমান উদ্যম বজায় রাখতে পারলে ভারতের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে এবং পরিবেশের ভারসাম্যেরও ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটবে।

3.10. ○ জীব বৈচিত্র্য (Biodiversity)

উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ এই দুই নিয়ে গঠিত জীবজগৎ। আজ থেকে আনুমানিক 300 কোটি বছর আগে সমুদ্রে প্রথম এই জীবের সৃষ্টি। তারপর স্থলভাগে এবং কালক্রমে সমগ্র বিশ্বে জন্ম নেয় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে পৃথিবীর এই বিশাল জীবজগতের মোট প্রজাতি সংখ্যা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। বিপুল সংখ্যক এই প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে আনুমানিক প্রায় 17 লক্ষ প্রজাতির পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীদের মতে এর চেয়ে অনেক বেশি প্রজাতির অস্তিত্ব পৃথিবীতে রয়েছে।

পৃথিবীর জীবমণ্ডলে প্রাণী ও উদ্ভিদের এই যে বৈচিত্র্য তাকে জীববৈচিত্র্য বলে। 1992 খ্রিস্টাব্দে বসুন্ধরা সম্মেলনের পরেই জীববৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটি শব্দটি বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনটি বিভিন্ন স্তরে জীব বৈচিত্র্যের মূল্যায়ন করা হয়— জিন (gene), প্রজাতি (species) এবং বাস্তুতন্ত্র (ecosystem)। তবে এই তিনটে স্তরের মধ্যে প্রজাতিই মূল স্তর।

জীববৈচিত্র্য সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন জীবের প্রজাতিভেদে বা প্রজাতি সংখ্যার তারতম্যের কারণে হয়। কিন্তু নানা কারণে এই বৈচিত্র্য আজ নষ্ট হতে চলেছে এবং অনেক প্রজাতি বিপন্ন প্রজাতি স্তরে পৌঁচেছে। যে সমস্ত প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মানুষের কোনো ক্ষতিকর কাজের জন্য বিপন্ন হয়েছে অর্থাৎ অবলুপ্ত হতে চলেছে তাকে বিপন্ন প্রজাতি (endangered species) বলে। যেমন সুন্দরবনের সুন্দরী উদ্ভিদ কিংবা রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ দীর্ঘদিন বিপন্ন হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই বিলুপ্তি সাধারণত জলবায়ুর পরিবর্তনে জলভাগ ও স্থলভাগের আয়তন পরিবর্তনে ইত্যাদি কারণে ঘটে। যখন কোনো প্রজাতির সর্বশেষ স্বতন্ত্র জীবটি কোনো বংশধর না রেখে বারা যায় তখন সেই ঘটনাকে প্রজাতির বিলুপ্তি বলে।

প্রায় 70 কোটি বছর পূর্বে প্রিক্যামব্রিয়াম যুগে জীববৈচিত্র্যের সর্বপ্রথম ব্যাপক বিলুপ্তি ঘটে। তারপর প্রায় 24·5 কোটি বছর পূর্বে পারমিয়ান যুগে মহাদেশগুলোর ওলট-পালট হবার সময় আবার ব্যাপক বিলুপ্তি ঘটে। এই সময় প্রায় 90 শতাংশের ও বেশি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। তারপর ট্রিয়াসিক (19·5 কোটি বছর পূর্বে), ক্রিটেসিয়াস (6·6 কোটি বছর পূর্বে) যুগেও বহু স্থলবাসী উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটে।

3.10.1. ভারতের জীব বৈচিত্র্য (Biodiversity in India)

পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যের বিশাল ভাণ্ডারে খুব অল্পই আমরা জানি। একথা সমানভাবে বারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদিও ভারত জৈববৈচিত্র্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এর কারণ সম্ভবত একই ভারতে একাধিক অনুকূল পরিবেশের সহাবস্থান। উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বত, পশ্চিমে মরুভূমি, দক্ষিণে বিশ্বের প্রাচীনতম মালভূমির অংশ আবার দক্ষিণপূর্বে নবীনতম সমভূমি সমৃদ্ধ বৃহত্তম বদ্বীপ। ফলে ভারতে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা কম নয়। ধান, পাট, নীল, কার্পাস, শশা, গোলমরিজ, মিলেট ইত্যাদির উৎপত্তিস্থল এই ভারতবর্ষ। এদের অসংখ্য বন্য প্রজাতিও ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতিতে। আবার অগ্নুৎপাত, ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, তুষারপাত ইত্যাদি কারণে অনেক প্রজাতির বিলুপ্তিও ঘটেছে।

1978 সালে বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (BSI) রেড ডাটা বুক (Red Data Book) প্রকাশ করে। এই বইতে ভারতের লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। আনুমানিক এদের সংখ্যা 1500। এদেরকে বাদ দিলেও ভারতে মোট উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় 45000 এর মধ্যে সপুষ্পক উদ্ভিদের সংখ্যা মাত্র 15000। নিচে পৃথিবীর মোট প্রজাতির সঙ্গে ভারতের প্রজাতিসংখ্যার একটি তুলনা করা হল।

সারণী 3.4 : ভারতের জীব বৈচিত্র্য

জীবগোষ্ঠী	ভারতের প্রজাতি	পৃথিবীর মোট প্রজাতির শতাংশে হার
1. মোট উদ্ভিদ	45000	11.10
2. পতঙ্গ শ্রেণীর	50,000	6.13
3. শামুখ জাতীয়	4000	7.59
4. অন্যান্য অমেরুদণ্ডী	6500	9.56
5. মাছ	2400	11.72
6. উভচর	140	3.96
7. সরীসৃপ	420	7.85
8. পাখী	1200	7.85
9. স্তন্য পায়ী	1340	8.03

উৎস : National Action Plan on Biodiversity (1997), Govt. of India

এই তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর মোট উদ্ভিদ প্রজাতির 11.10 শতাংশ এবং প্রাণী প্রজাতির 6.67 শতাংশ ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ জৈব বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল উদ্ভিদকূল। দেশোদ্ভূত (endemic) প্রজাতির মধ্যে সংখ্যার অবস্থানে অস্ট্রেলিয়ার পর ভারতের স্থান। ভারতবর্ষের কয়েকটি উদ্ভিদ

প্রজাতির সংখ্যায় ভার.... অঞ্চল হল উত্তর-পূর্ব ভারত, পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা, উত্তর পশ্চিম হিমালয় ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। মনে রাখা দরকার এদের মধ্যে অন্তত দুটি অঞ্চল— পূর্ব হিমালয় ও পশ্চিমঘাট ইতিমধ্যে বিশ্বের 18টি Hot spot এর তালিকায় অন্তর্গত।

প্রাণী বৈচিত্রের দিক দিয়ে ও আমরা পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র কীটপতঙ্গের প্রজাতীর সংখ্যা প্রায় 50,000, প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা কম করে 1200। ভারতবর্ষে কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে এই ধরনের প্রজাতির প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। — যেমন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমঘাট মধ্যভারত ইত্যাদি উল্লেখযেগ্য।

সরীসৃপদের সবচেয়ে বেশি অবস্থান ভারতে দেখতে পাওয়া যায়। দেশোদ্ভুত উভচর প্রজাতির প্রায় 85% পাওয়া যায় আমাদের দেশে। ভারতে পৃথিবীর সর্বাধিক গৃহপালিত পশু বর্তমান। এখানে কম করে 26টি জাতের গরু, 40টি জাতের মেষ, 20 টি জাতের ছাগল, 8 টি জাতের উট, 6 টি জাতের ঘোড়া, 18 টি জাতের পোলট্রি পক্ষী পাওয়া যায়। তাই এই সমীক্ষা 50 বছর আগেকার, তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন বর্তমানে এই সংখ্যা আরো বাড়বে।

3.10.2. জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Biodiversity)

- বিশ্বের এক বৃহৎ উদ্ভিদ প্রজাতি সরাসরি মানুষ, গবাদি পশু ও খামারজাত প্রাণীর খাদ্যউৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মানুষের বাড়িঘর নির্মাণ, কাগজ, আসবাবপত্র তৈরীর কাঠ ও মণ্ড সরবরাহ করে।
- পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশ মানুষের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের উৎস মাছ। এই মাছের প্রায় 80 শতাংশেরও বেশি আসে সমুদ্র থেকে।
- আদিম উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিন মানব প্রজাতির অস্তিত্ব এবং প্রগতির পথ এক অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ।

3.10.3. জীববৈচিত্র্যের সঙ্কট (Crisis in Biodinersity)

1986 সালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে প্রতিদিন 50 টির মত প্রজাতি পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অরণ্য ধ্বংসের ফলে ও যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের ফলে সপুষ্পক উদ্ভিদের মোট 10% প্রজাতি আজ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি রূপে চিহ্নিত। হিসেব করে জানা গেছে 8000 বছর পূর্বে পৃথিবী পৃষ্ঠে 60 কোটি হেক্টর বনভূমি ছিল। এই পরিমাণ কমতে কমতে বর্তমানে (2001) 36 কোটি হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীতে যত ধরনের প্রজাতি পাওয়া যায় তার অধিকাংশই পাওয়া যায় বনভূমিতে। ভারতে গত 20–30 বছর ধরে অস্বাভাবিক হারে বনভূমি নষ্ট হয়েছে— গড়ে বছরে প্রায় 1 শতাংশ হারে। ফলে বহুসংখ্যক পাখী, সরিসৃপও উভচর প্রজাতি আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে চলেছে। ভারতবর্ষে 340টি স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে 21টি প্রাণী বিলুপ্তির পথে। 1987 সালে মোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (BSI) রেড ডাটা বুক এর তথ্য অনুসারে অবলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের সংখ্যা যথাক্রমে 33 ও 157। তাছাড়া সংবেদনশীল (Vulnerable) উদ্ভিদের সংখ্যা 114।

জীববৈচিত্র্যের এই বিনাশ বা বিলুপ্তি নানাধরনের হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, জলভাগ ও স্থলভাগের য়তনের পরিবর্তন, একটি প্রজাতির বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে আয়তনের পরিবর্তন ইত্যাদি প্রধান বিলুপ্তির কারণ। তবে ভূত্বাত্বিক সময়ের সাপেক্ষে প্রজাতি বিলুপ্তির হার তুলনামূলক ভাবে কম। বিজ্ঞানীদের মতে একটি প্রজাতির

গড় আয় 50 লক্ষ থেকে 1 কোটি বছর। সেই হিসাবে পৃথিবীর মোট প্রজাতির সংখ্যা 1.2 – 1.3 কোটি এবং প্রতি বছর বিলুপ্তির হার 1 – 3টি প্রজাতি।

বিগত 400 বছরে পৃথিবীব্যাপী মানুষের আধিপত্যের কারনে প্রজাতি বিলুপ্তি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এই সময়ে প্রায় 65টি স্তন্যপায়ী, 80টির বেশি পাখি সহ 200 টিরও বেশি মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং 360 টিরও বেশি অমেরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে। তালিকা দ্রষ্টব্য।

সারণী 3.5 : বিপন্ন প্রজাতি ও বিলুপ্ত প্রজাতি

প্রজাতি	বিপন্ন প্রজাতির সংখ্যা	মোট প্রজাতির শতকরা হার	বিলুপ্ত প্রজাতির সংখ্যা
1. স্তন্যপায়ী	741	16	65
2. পাখি	1111	11	89
3. সরীসৃপ	316	4.5	20
4. উভচর	169	4	4
5. মাছ	679	4	33
6. অমেরুদণ্ডী	2754	0.2	364

উৎস : IUCN Red List of threahened Animals, 1997

3.10.4. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Bio-diversity Conservation) :

জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে পারলে বিবর্তনের ধারাকে অক্ষুন্ন রাখা যায়। জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করে এদের বিলুপ্তি প্রতিরোধ করা যায়। দুভাবে এই কাজ করা যায়— ইনসিটু কনজারভেশান (in-situ conservation) ও এক্স-সিটু কনজারভেশন (ex-situ-conservation)।

● **ইন-সিটু কনজারবেশন :** প্রাণী বা উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রেখে স্বাভাবিক আবাসে যে রক্ষণ তাকে ইন-সিটু কনজারভেশন বলে। এই ধরনের সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনভূমি ইত্যাদি তৈরী করা হয়।

● **এক্স সিটু কনজারভেশন :** স্বাভাবিক আবাস থেকে দূরবর্তী ভিন্ন আবাসে প্রজাতির রক্ষণকে এক্স সিটু কনজারভেশন বলে। এক্ষেত্রে জীবের প্রোটোপ্লাজম যুক্ত কোষ, ভ্রূণ, পরাগরেণু, শুক্রাণু কিংবা ডিম্বাণুকে চরম শৈত্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। এই ধরনের সংরক্ষণের জন্য চিড়িয়াখানা, জীন ব্যাঙ্ক, উদ্ভিদ উদ্যান ইত্যাদি তৈরী করা হয়।

3.11. ○ প্রশ্নাবলী ও উত্তর (Question and Answer)

I. দীর্ঘ উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী :

1. বাস্তুতন্ত্রের সাম্য বলতে কি বোঝ? বাস্তুতন্ত্রের সাম্য কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?
   [উত্তর : 3.5, 3.5.1, 3.5.2]
2. পুনচক্রীকরণ পদ্ধতি কাকে বলে? কয়েকটি বিশেষ বর্জ্যপদার্থের পুনচক্রীকরণ পদ্ধতি বল।
   [উত্তর : 3.6.1, 3.6.2]

3. পুনর্নবীকরণ শক্তিসম্পদ বলতে কি বোঝ? এই শক্তির উৎস হিসাবে জলবিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বল।
[উত্তর : 3.8 এবং 3.8.1.1.]
4. জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের বিবরণ দাও।
[উত্তর : 3.8.1.3]
5. বিশ্বের প্রধান জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদক দেশগুলির বিবরণ দাও (কেন্দ্রসহ)।
[উত্তর : 3.8.1.5]
6. সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার এবং বিশ্বে বন্টন আলোচনা কর (ভারতের উদাহরণসহ)।
[উত্তর : 3.8.2.1 এবং 3.8.2.2.]
7. অরণ্য সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলোর পরিচয় দাও।
[উত্তর : 3.9.1]
8. সামাজিক বনসৃজন ও কৃষি বনসৃজনের তুলনা কর।
[উত্তর : 3.9.3 এবং 3.9.4]

II. সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী :

1. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝ?
[উত্তর : 3.4]
2. 'Spaceship Earth' ধারনাটির ব্যাখ্যা দাও।
[উত্তর : 3.4]
3. বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে কেন?
[উত্তর : 3.5.3]
4. জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি কি কি?
[উত্তর : 3.7.1]
5. জলবিদ্যুৎ শক্তির অসুবিধা কি কি?
[উত্তর : 3.8.1.2]
6. বিশ্বে সুপ্ত জলবিদ্যুৎ শক্তি এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক্য কি? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দাও।
[উত্তর : 3.8.1.4]
7. ভারতের জলবিদ্যুৎ শক্তির বর্তমান অবস্থা কেমন?
[উত্তর : 3.8.1.5 এর ভারত অংশ]
8. ভারতের সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির ব্যবহারে তুলনা কর।
[উত্তর : 3.8.2.2. এবং 3.8.3.1]
9. বিশ্বে ভূতাপশক্তিতে কোন কোন দেশ উন্নত? ভারতে এই শক্তির সম্ভাবনা কেমন?
[উত্তর : 3.8.5]
10. ভারতে বিভিন্ন পুনর্নবীকরণ শক্তিসমূহের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।
[উত্তর : 3.8.7]

11. ভারতে 'সামাজিক বনসৃজন' ও 'কৃষি বনসৃজ'নের অগ্রগতি আলোচনা কর।
[উত্তর ঃ 3.93 এর Box এর লেখা ও 3.9.4 এর Box এর লেখা]
12. জীব বৈচিত্র্য বলতে কি বোঝ? প্রকৃতিতে জীব বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা বল।
[উত্তর ঃ 3.10 এবং 3.10.1]

III. অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী ঃ

1. সামাজিক বনসৃজন কাকে বলে?
[উত্তর ঃ 3.9.3]
2. কৃষি বনসৃজন কাকে বলে?
[উত্তর ঃ 3.9.4]
3. ইনসিটু করজারভেশন এবং এক্স সিটু করজারভেশন কাকে বলে?
[উত্তর ঃ 3.10.2]
4. পরিবেশ পরিচালনের প্রধান পদ্ধতিগুলি কি কি?
[উত্তর ঃ 3.3.1]
5. পজিটিভ ফিড-ব্যাক পদ্ধতি কাকে বলে?
[উত্তর ঃ 3.5.2]
6. বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বলতে কি বোঝ?
[উত্তর ঃ 3.8.1.3 এর 4 নম্বর অপ্রাকৃতিক কারণ]
7. বিশ্বে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রথম 4টি দেশের নাম বল।
[উত্তর ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, রাশিয়া, জাপান]
8. আফ্রিকা মহাদেশের প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎ/কেন্দ্রগুলির নাম লেখ।
[উত্তর ঃ 3.8.1.5 এর আফ্রিকা অংশ]
9. ইউরোপের প্রধান প্রধান জলবিদ্যুৎ উৎপাদক দেশগুলি কি কি?
[উত্তর ঃ 3.8.1.5 এর ইউরোপ অংশ]
10. জোয়ার ভাটা শক্তিতে উন্নত কয়েকটি দেশের নাম বল।
[উত্তর ঃ 3.8.4.2]
11. বিশ্বে সৌর শক্তিতে উন্নত কয়েকটি দেশের নাম বল।
[উত্তর ঃ 3.8.2.1.]

NOTE